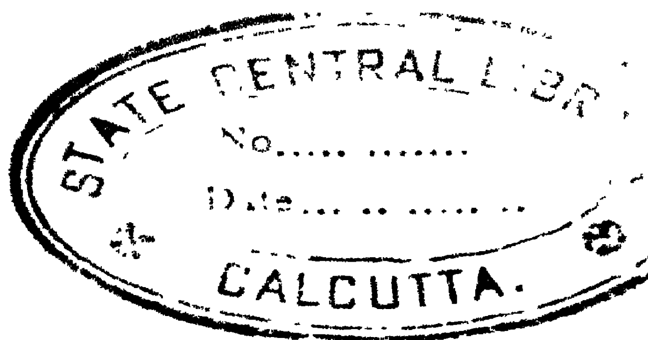
ডানা





ডানা

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

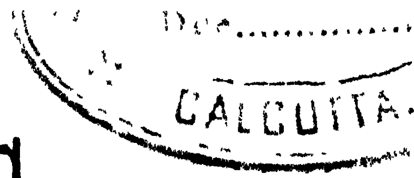


ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬২

মূল্য চার টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



ডানা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। কবির মনে হচ্ছিল যেন মধ্য-রাত্রি, রহস্যময় মধ্য-রাত্রি। নিশীথ-গগনের অসংখ্য নক্ষত্রমালাই সহসা যেন কোনও মন্ত্রবলে একত্রিত হয়ে সূর্যের রূপ ধারণ করেছে। তাঁর জানলা দিয়ে যে রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সেটা যেন বাস্তবের নয়, রূপকথালোকের। যদিও বাল্যকাল থেকে বহুবার তিনি এ দৃশ্য দেখেছেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর পূর্ব-জীবনের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ আছে। ওই কর্ণিকার, পলাশের, কৃষ্ণচূড়ার উদ্দাম অথচ নীরব বর্ণসমারোহকে ঘিরে ফটিকজলের যে তীক্ষ্ণ করুণ সুর মাঝে মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে তা যে পার্থিব—এ কথাও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কবি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সহসা আজ পরম মুহূর্তে আবিষ্কার করেছেন পরম সত্য—সে সত্য শুধু অপরূপ নয়, অবর্ণনীয়। ভাষায় তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর অন্তরলোকে একটা অস্ফুটভাব রূপায়িত হচ্ছিল কেবল অসম্বদ্ধ লীলায়, মনে হচ্ছিল ছন্দবন্ধনে বাঁধলেই ওর অপরূপ অসীমতা খণ্ডিত হবে। মনের মধ্যে, তবু ছন্দ জাগছিল, গুঞ্জন করছিল কবিতার মিল। ফটিকজল পাখীর 'ফটি—ক জল' সূক্ষ্ম সুন্দর তীক্ষ্ণ সুরে যেন তাঁকে বলছিল, তুমি চুপ ক'রে আছ কেন, তুমিও তোমার গান গাও না! তোমার মনে যদি সুর থাকে, কণ্ঠে তার ফুটবেই কিছুটা। সবটা নাইবা ফুটল। তা ছাড়া, সবটা তুমি ফোটাতে পারবে, এত অহঙ্কারই বা কেন তোমার? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই কি সবটা ফোটাতে পেরেছেন একসঙ্গে?

পাখীর সুরে তিরস্কৃত হয়ে লজ্জিত হলেন কবি। কবিতার খাতাটা বার ক'রে নীরবে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে
তারি টানে তারি পানে ছুটেছে সুরের বেগ
পুলকিত বিহগের স্বরে,
সে সোনার মেঘ হতে নামিছে ফটিক-জল-ধারা
বৃক্ষলতা করে স্নান, পুষ্পে বর্ণ হ'ল মাতোয়ারা
চঞ্চল পতঙ্গদল, মুখরিত পাখী আত্মহারা
মানুষ ঘুমায় শুধু ঘরে।
ওরে কবি, দ্বার খোল্—বাহিরে বারেক দাঁড়া এসে
সোনার স্বচ্ছ মেঘ নামিয়াছে তোরই দ্বারদেশে
রুদ্রের অন্তর হতে বাহিরিল যে মোহন বেশে
দেখ্ তারে দু'নয়ন ভরে
রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে।

কবিতাটা লিখে কবির সত্যিই মনে হতে লাগল যে, বাইরে যে কড়া রোদ দিগ্‌দিগন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে তা রোদ নয়, তা সোনার স্বচ্ছ মেঘ, যে মেঘ থেকে ফটিকজল নামে। কপাট খুলে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই অনবদ্য অপরূপ প্রকাশকে অভ্যর্থনা করবার দায়িত্ব তো তাঁরই, তিনি যে কবি। সাধারণ মানুষ কপাটে খিল লাগিয়ে বৈশাখের এই পরম প্রকাশকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু তিনি কি পারেন? বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে প্রথমেই মনে হ'ল, কোথাও কেউ নেই, চতুর্দিক খাঁ-খাঁ করছে যেন। তিনি

যেন অকস্মাৎ কোনও রূপকথালোকের নিদমহলে ঢুকে পড়েছেন। প্রখর রৌদ্রালোকিত নিদমহল। আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ঢাকা—ওটা কি কর্ণিকার বৃক্ষ? অপ্সরীই বা নয় কেন? ওই যে দূরে রক্তশিখার মত দেখাচ্ছে, ওটা পলাশ, না, শিমুল, না, ধরণীর মর্মভেদী কামনা? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। একটা তপ্ত হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে, এসে তাঁকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল।

'ফটি—ক জল'—'ফটি—ক জল'—

কবির চমক ভাঙল। কোথা থেকে ডাকছে পাখীটা? দূরের ওই বড় গাছটা থেকে নিশ্চয়। ঘন পত্রপল্লবের মাঝখানে উঁচুতে ছোট্ট একটি ডালে ব'সে আছে বোধ হয়। কয়েক দিন আগে দেখেছিলেন তিনি পাখীটিকে। অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতের পর দেখেছিলেন। ছোট্ট পাখী, সুন্দর দেখতে। কালো সাদা আর সবুজাভ হলুদের অপরূপ সমন্বয় পুরুষটির গায়ে, সঙ্গিনীটির গায়ে কিন্তু কালোর ছোঁয়াচ নেই। পুরুষ-পাখীটিকে দেখে মনে হয়েছিল, অমানিশীথিনীর কালোর সঙ্গে যেন স্বর্ণকান্তি সূর্যালোকের দ্বন্দ্ব চলেছে ওর সারা অঙ্গ জুড়ে; মনে হয়েছিল, পুরুষ-পাখীটি তামসিকতার কালোকে জয় করতে পারে নি, সঙ্গিনীটি কিন্তু পেরেছে, তার সারা গায়ে কেবল সবুজ আর হলুদের দ্যুতি, কালোর আভাসমাত্র নেই।

'ফটি—ক জল'—'ফটি—ক জল'—

কবি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। দিন কয়েক আগে ফটিকজলকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন একটা। তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল, কবিতাটা এখন একবার পড়া দরকার। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে কথা ভুলে গেলেন আবার। অসংলগ্নভাবে মনে পড়ল অমরেশ-বাবুর জমিদারিতে কোথায় যেন খুন হয়ে গেছে একটা। জমিদারের ম্যানেজার হিসাবে তাঁকে হয়তো থানায় যেতে হবে। একজন গোমস্তাকে তিনি যেতে বলেছেন; কিন্তু সে যদি এসে বলে যে, তাঁকেও যেতে হবে, তা হ'লে—। বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন

তিনি। অমরেশবাবুর স্ত্রী এ কি বিপদে ফেলে গেলেন তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে ডানার কথাও মনে হ'ল তাঁর। শুধু তাঁকে নয়—ডানাকেও বিপদে ফেলে গেছেন ওঁরা। দুজনকে দু রকম 'টাস্‌ক্‌' দিয়ে গেছেন যেন। এই বিপন্ন ভাব সত্ত্বেও কিন্তু মনে মনে ঈষৎ আনন্দিত হলেন তিনি। ডানার সঙ্গে একই কারাগারে বন্দী হয়ে আছি কেবল অর্থাভাবে—এই ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়া মাত্র ডানার সম্বন্ধে একটা নূতন ধরনের আত্মীয়তা-বোধ মনে জাগল। কিন্তু এতে আনন্দিত হওয়াটা অনুচিত—এ কথাও মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। একটু লজ্জিত হলেন।

'ফটি—ক জল'—

কবিতার খাতাটা খুলে পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে, কর্তব্যে অবহেলা ক'রে ধরা প'ড়ে গেছেন যেন। কবিতাটায় অনেক কাটাকুটি ছিল, তবু পড়তে কষ্ট হ'ল না তাঁর।—

বৈশাখী দুপুরের নিদারুণ আলোতে
সবুজাভ হলুদে সাদাতে ও কালোতে
সাজিয়া আসিল কে অজানারে চাহিয়া
ফটিকজলের গান বারে বারে গাহিয়া
সাথে ল'য়ে সঙ্গিনী তন্বী শ্যামলীকে
আলোকের রূপ ওর সারা মন ভরিয়া
পালকের কালো তবু যায় না যে সরিয়া
হয়তো বা আশা আছে ওরই গাঢ় কালিমা
প্রেয়সীর অন্তরে জাগাইবে লালিমা
শস্যের সুষমায় সাজাইবে পলিকে।

বেরিয়ে পড়লেন আবার। দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ব'সে আছে একদল গরু, অর্ধনিমীলিত নয়নে রোমন্থন করছে, একটা

ছোট বাছুর কেবল লেজ তুলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তাঁর সুন্দরীও কি আছে ওদের মধ্যে? কর্তব্যবোধেই যন্ত্রচালিতবৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু গরুগুলির কাছাকাছি গিয়ে যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা গরু নয়—গাছের ওপর এক ঝাঁক হাঁড়িচাঁচা পাখী। ছুটো পাখী ছুলে ছুলে কি মিষ্টি ক'রেই না ডাকছে। 'খুকু নেই' বলছে কি? না, 'কু অক্ রিং', না, 'ববো লিং'? সহসা কবির মনে হ'ল, ওরা যেন পরস্পরকে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন, ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি খেলার সময় যেমন বলে। ছুষ্ট কিশোরী মেয়ের মতই দেখতে তো। সারাটা ছুপুর এ-গাছ ও-গাছ ক'রে বেড়াচ্ছে, কখনও মগডালে মগডালে, কখনও ঘন পাতার আড়ালে আড়ালে। ফল চুরি করছে, অন্য পাখীর ডিম চুরি করছে, পোকামাকড় যা পাচ্ছে খেয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে উঁচু ডালে ব'সে ছুলে ছুলে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন। স্নেহরসে কবির মন সিক্ত হয়ে উঠল। বিভূতি বাঁড়ুজ্জের 'পথের পাঁচালী'র ছুর্গা যেন। পর-মুহূর্তেই কোকিল ডেকে উঠল একটা। তারপর, শোনা গেল—'ফটি—ক জল'। দূরে স্বর্ণাভরণভূষিতা কর্ণিকার বীথিতে নীরব সমারোহে যে বর্ণ-বাণী প্রস্ফুটিত হয়েছে, তারই প্রভাব যেন উন্মত্ত ক'রে তুলেছে কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পগুচ্ছকে। ওরা যেন রঙের ভাষায় ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কবির আবার মনে হ'ল, তিনি রূপকথা-লোকে প্রবেশ করছেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্বস্ত আনন্দিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল, তিনি দূর প্রবাস থেকে সহসা নিজের দেশে ফিরে এসেছেন যেন। এই পাখীর ডাক, ফুলের ভাষা, রৌদ্রমণ্ডিত নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বৃক্ষে লতায় তৃণে গুল্মে সহস্র ইঙ্গিতভরা অসংখ্য আবেদন—এই তো তাঁর নিজস্ব পরিবেশ। এরই ক্রোড়ে, এই বৈচিত্র্যের দোলায়, এই সহজ সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতেই তো মানুষ হয়েছেন তিনি। কত জন্ম, কত জন্মান্তর,

কত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার কত সংঘাত আন্দোলিত করেছে তাঁকে এই প্রকৃতির কোলেই। মায়াবিনী সভ্যতার পিছু পিছু কোথায় গিয়েছিলেন তিনি এতদিন ঘর ছেড়ে? জটিল অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন এতকাল কিসের মোহে? নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ ক'রে কোথায় চলেছে মানুষ! কোথায় এর পরিণতি! হঠাৎ এক ঝলক তপ্ত হাওয়া তাঁকে ঘিরে ছোট্ট একটু নাচ নেচে দূরে ছুটে চ'লে গেল কতকগুলো শুষ্ক পাতাকে নাচিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, বৃদ্ধ বটের পত্রপল্লবে সাড়া জাগিয়ে। মুগ্ধ কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলেবেলার সাথী একজন যেন পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ছুটে পালাল। ও তো এখনও তেমনি দুষ্ট, তেমনি চঞ্চল, তেমনি উত্তপ্ত, তেমনি উদ্দাম আছে। তিনিই কি বুড়ো হয়ে গেলেন না কি? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তর প্রতিবাদ ক'রে উঠল। দেহটা হয়তো অপটু হয়েছে, মন তো একটুও বুড়ো হয় নি! তাঁর ইচ্ছে করতে লাগল ওই দমকা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে। একটু ছুটলে ক্ষতি আর কি হবে! বড় জোর হাঁপিয়ে পড়বেন একটু। কেউ দেখতে পেলে হয়তো হাসবে, পাগল ভাববে। তাতেই বা ক্ষতি কি! ঊর্ধ্বপুচ্ছ কচি বাছুরটা তাঁর দিকে একছুটে চ'লে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁর সামনে। যেন বলতে লাগল—ছুটবে? বেশ তো, এস না। কবি সত্যিই ছুটতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। রাস্তার বাঁকে পিওনকে দেখতে পেয়ে তাঁর গতিবেগ আড়ষ্ট হয়ে গেল, টান পড়ল ভব্যতার নিগড়ে। সহজ মন্দ গতিতেই এগিয়ে গেলেন তিনি পিওনের দিকে। পিওনও তাঁর দিকেই আসছিল, তাঁর চিঠি ছিল একখানা। বেশ মোটা একখানা খাম তাঁর হাতে দিয়ে পিওন নিজ গন্তব্যপথে চ'লে গেল। কবি চিঠিখানার ঠিকানা দেখেই বুঝলেন, অমরেশবাবুর চিঠি। হাতের লেখাতেই ভদ্রলোকের চরিত্র পরিস্ফুট। গোটা গোটা বড় বড় বলিষ্ঠ অক্ষর। বেশ মোটা চিঠি।

খামটা ছিঁড়েই কবির মনে হ'ল, এ চিঠি এখানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। বেশ লম্বা চিঠি। প্রথমেই চোখে পড়ল—"একটা দোয়েল পাখী আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আমি আরও খান কয়েক বই পাঠালাম। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয়ে আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়। এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে—" এইটুকু প'ড়েই কবির মনে হ'ল, চিঠিখানা নিয়ে ডানার কাছে যাওয়াই উচিত। যা এতক্ষণ মনের প্রত্যন্তদেশে গোপন ইচ্ছা ছিল, তা এইবার কর্তব্যরূপ পরিগ্রহ ক'রে দ্বিধামুক্ত হ'ল। চিঠিখানা হাতে ক'রে, দুপুর রোদে মাঠ ভেঙে তিনি ডানার বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। কবি বাইরে যদিও একটা সপ্রতিভতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে মনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রূপকথালোকের যে অবাস্তব চিত্রটা সহসা তাঁর মনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল তার প্রভাব তখনও কাটে নি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন চিরন্তন রাজপুত্র, চিরন্তনী রাজকন্যার উদ্দেশ্যে তেপান্তর মাঠ ভেঙে চলেছেন। যে মেঘ স্ফটিকজল বর্ষণ করে, সে তার স্বচ্ছ স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করেছে চতুর্দিক, তাঁর বয়স যেন অনেক ক'মে গেছে, তাঁর কবিতা যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁকে।...

কল্পনার পক্ষীরাজে চ'ড়ে তিনি যখন সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটাতে এসে হাজির হলেন, তখনও তাঁর ঘোর কাটে নি। শিকল-তোলা দরজাটার দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চমকে উঠলেন চাকরটার সাড়া পেয়ে।

"মাইজী বেরিয়ে গেছেন।"

ঘোর কেটে গেল। মুখ দিয়ে কিন্তু কথা বেরুল না তবু।

"আপনি কি বসবেন?"—চাকরটাই প্রশ্ন করল আবার।

"হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল। কোথায় গেছেন মাইজী ?"

জোর ক'রে কথা কটা বলতে পেরে যেন আত্মস্থ হলেন তিনি। মনের একটা অজানা গুরুভার যেন নেবে গেল।

"তা ঠিক জানি না বাবু। মাইজী আমাকে ডাকঘরে পাঠিয়ে ছিলেন খাম-পোস্টকার্ড আনতে। এসে দেখছি, বেরিয়ে গেছেন তিনি। কাছাকাছিই গেছেন কোথাও। আপনি বসেন তো একটু বসুন। আসবেন এখুনি।"

কপাটটা খুলে দিলে সে। কবি ভিতরে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল, টেবিলের উপর তিনখানা মোটা মোটা পক্ষীবিষয়ক বই রয়েছে। অমরেশবাবু পাঠিয়েছেন নিশ্চয়। কবির একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল। অমরেশবাবু শুধু পাখীদেরই খাঁচায় পোরেন নি। তাঁকে এবং ডানাকেও পুরেছেন। অদৃশ্য যন্ত্র দিয়ে তাঁদেরও ঠোঁট নখ পালক মাপছেন কি না কে জানে ?

অমরেশবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনে হ'ল, লোকটির প্রতি সুবিচার করেন নি তিনি। তাঁকে কখনও অবজ্ঞাভরে, কখনও অনুকম্পা সহকারে তিনি যেন দয়া ক'রে সহ্য ক'রে এসেছেন, তাঁর প্রকৃত মহত্ত্বের আলোকে কখনও তাঁকে বিচার করবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর মনে হ'ল, চেষ্টা করলে তিনি অভিভূত হয়ে যেতেন। অসুরের মত বলিষ্ঠ, শিশুর মত কৌতূহলী, ঋষির মত জ্ঞানবৃদ্ধ, রাজার মত ধনী, অগ্নির মত পবিত্র এই লোকটির অনন্যতায় তাঁর অন্তত মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল। তিনি কবি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হওয়াতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন একটু। মুগ্ধই হয়েছেন তিনি মনে মনে, কিন্তু বাইরে ভান করছেন ঠিক উল্‌টোটা। কি দরকার এ চাতুরির ? আত্মসম্মানের মুখোশটা বজায় রাখার জন্য ? চিঠিখানার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। পকেট থেকে বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

প্রিয় আনন্দমোহনবাবু,

একটা দোয়েলপাখী আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আরও খানকয়েক বই পাঠাচ্ছি। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয় এখন আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়? এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে। আমাদের রেডিওর এরিয়েলটা এখানকার একটি দোয়েল-গায়কের প্রধান রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। ওর ওপর ব'সে কত গানই শোনায় ও! সম্ভবত প্রেয়সীকেই শোনায়, কিন্তু মাঝ থেকে আমরাও লাভবান হই। কি বলেন? একজন ইংরেজ লেখক—ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছেন যে, পাখীরা নাকি তাদের প্রেয়সীদের ভোলাবার জন্যে গান গায় না। ময়ুর নাকি ময়ুরীকে মুগ্ধ করবার জন্যে পেখম মেলে নৃত্য করে না! ওরা যা করে, সবই নাকি অকারণ পুলকে করে। কার্যকারণের যোগাযোগ মানতে চান না ভদ্রলোক। অকারণ পুলকে যে পাখীরা গান করে না তা নয়, লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, অনেক সময় এই দোয়েলই অহেতুক আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। কিন্তু ওর অধিকাংশ গানের লক্ষ্য যে ওর প্রিয়া—এ কথা অস্বীকার করা শক্ত। লরেন্স বলেছেন, সৌন্দর্য ব্যাপারটা রহস্য-জনক। ওর কোনও হেতু নেই। বিজ্ঞান জোর ক'রে একটা হেতু বার করবার চেষ্টা করেছে, কারণ বিজ্ঞানীদের একটা হেতু-বাতিক আছে। আছে তা মানছি। কিন্তু ওই লরেন্সই ওই প্রবন্ধেই বলছেন যে, জীবন্ত যৌবনই সৌন্দর্য। অর্থাৎ তিনিও রূপের প্রকাশকে যৌন অভিব্যক্তির সঙ্গে না জড়িয়ে পারেন নি। বৈজ্ঞানিকে গাল দিতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাদের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। যাক ও-কথা, এখন দোয়েলের কথা শুনুন।

পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজপুতানা, সিন্ধু, কচ্ছ প্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র দোয়েল স্থায়ী বাসিন্দা। পার্বত্য প্রদেশেও আছে; চার হাজার ফুট, কখনও কখনও পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিমালয়েও এক হাজার ফুট পর্যন্ত এদের বাসা এবং ডিম পাওয়া গেছে। এদের চালচলন লক্ষ্য করেছেন কি কিছু? নিশ্চয়ই করেছেন। দোয়েল পাখীর সম্বন্ধে অমন সুন্দর কবিতা যখন লিখেছেন, তখন দেখেছেন নিশ্চয় ওদের ভাল ক'রে। কিংবা কি জানি, না দেখেও হয়তো ভাল কাব্য রচনা করতে পারেন আপনারা, এর অজস্র প্রমাণ তো বিশ্ব-সাহিত্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উর্বশী অথবা শেক্স্‌পীয়ার মিডসামার নাইটস্‌ ড্রীম দেখেন নি নিশ্চয়। যাক, আবার বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করছি আপনার। দোয়েলের কথা হচ্ছিল, তাই হোক। দোয়েল হচ্ছেন—ইংরেজী গ্রন্থকারের ভাষায়—A bird of groves and delight to move about on the ground in the mixed chequer of sunshine and shade"—এর সংক্ষেপে বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, আমাদের দোয়েল হচ্ছেন কুঞ্জবিহারী, (নিকুঞ্জবিহারী বললেও ক্ষতি নেই) কাননের আলো-ছায়ার ঝিলিমিলিতে বিহার করতে ভালবাসেন। একজন বিদেশী গ্রন্থকার লিখেছেন যে, দোয়েল ঘন ঝোপের ভিতর ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে না (thick undergrowth it dislikes); কিন্তু আমি দু-তিনবার একে ঘন ঝোপে দেখেছি। অবশ্য শীতের সময়। সে সময় বেচারারা একটু মন-মরা হয়েই থাকে। গলা দিয়ে সুর পর্যন্ত বেরোয় না ভাল ক'রে। তবে ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন জায়গাই বেশী পছন্দ করে এরা। আমাদের বাড়ির সেই ছোট্ট জায়গাটুকু ভারি ভাল লাগে ওদের—সেই যেখানে আয়না বসিয়েছিলাম, মনে আছে নিশ্চয় আপনার। এখানকার বাগানেও দোয়েল আছে একটা—সে তো আমার গিন্নীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ক'রে ফেলেছে। গাছের তলায়

তলায় তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোরাফেরা করে আহারের খোঁজে, তারপর উড়ে হয়তো একটা ডালে বা বাগানের দেয়ালের ওপর বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কোনও গাছের তলায় কোনও পোকামাকড় নড়ছে কি না দেখতে পাওয়া মাত্রই বোঁ ক'রে নেবে সেটি সংগ্রহ ক'রে গলাধঃকরণ করা হ'ল, তারপর আবার উড়ে গিয়ে বসা হ'ল সেই ডালে বা দেওয়ালের ওপর। ফুল তুলতে তুলতে আমার গিন্নী হয়তো খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন, দোয়েলের ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং তার চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যা ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—ও, আপনি! খাবার সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছি আমি। আপনার ওই ফুলগাছগুলোকে যে সব পোকামাকড় নষ্ট করছে তাদেরই সাবাড় করছি! এই ধরনের বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব। তারপর হঠাৎ উড়ে গিয়ে এরিয়েলের ডগায় ব'সে গান ধ'রে দিলে একখানা, মনে হ'ল আমাদের বাগানে আমরা যে ওকে থাকতে দিয়েছি তারই কৃতজ্ঞতায় ও যেন উচ্ছ্বসিত এবং সেইটেই যেন ওর গানের মুখ্য প্রেরণা। দোয়েলের গানের যে কত মূর্ছনা, কত উত্থান-পতন, কত লালিত্য, কত বৈচিত্র্য তা তো আপনি রোজই শুনছেন। দিন কয়েক চেষ্টা ক'রে আমাদের এখানকার দোয়েলের গানের ধরনটা আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই হয় নি অবশ্য, কারণ গানের সুরটাই আসল, তা লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এর থেকে ধরনটা হয়তো একটু বোঝা যাবে। কিছুটা টুকে পাঠাচ্ছি।—

ও পি পি পি পি পি—চিঃ—··· (দু মিনিট)
ও জা—গো শিগ্‌গির শিগ্‌গির শিগ্‌গির—(সঙ্গে সঙ্গে উড়ল)
পিঁ—কেরেঃ পিঁ—কেরেঃ পিঁ কেরেঃ··· (৫ মিনিট)
পি পি পি—কই তুমি—কই তুমি—কই তুমি—কি কি কি
(তিন মিনিট)

প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—য়া—প্রি—য়া··· (দু মিনিট)
পি ই ই ইঃ পি ই ই ইঃ (মিনিট খানেক)
পি—ঞ্জি—ঞ্জি—ঞ্জি—ঞ্জি—ঞ্জি—চি—চি—চি
(ডাকতে ডাকতে উড়ল)
কি যে—কি যে—কি যে কি যে—কি এ কি এ কি এ—ঞ্জিকিক্ ঞ্জিকিক্··· (মিনিট খানেক)
পি পি পি—কি করছ যে—কি করছ যে—দুত্তোর—দুত্তোর—
(দু মিনিট প্রায়)
এ—কি রেঃ এ কি রেঃ—এ কি রেঃ—চোখ গেল—চোখ গেল···
(তিন মিনিট)

এ ছাড়া আরও কত রকম যে ডাক আছে তা আমাদের অক্ষর দিয়ে লেখাও শক্ত। আমার ইচ্ছে আছে, দোয়েল পাখীর জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে একটি ছোট বই লিখব। ডেভিড ল্যাকের (David Lack) 'দি লাইফ অব দি রবিন' বইখানা দেখেছেন কি? ওখানে আমার শেল্‌ফে আছে, ইচ্ছে করেন তো দেখতে পারেন। ওই ধরনের বই একটা লেখবার ইচ্ছে আছে। হয়ে উঠবে কি না জানি না। এ দেশে নানা বাধা। একটা বাধা হচ্ছে জনসমাগম। বহু বেকার লোকের বাস এ দেশে, তাদের কোনও কাজ নেই। লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানোই একমাত্র কাজ। যখন-তখন হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ছে, দূর ক'রে দেওয়া যায় না, প্রাণ খুলে আপ্যায়িত করাও যায় না। অসময়ের বৃষ্টি বা ঝড়ের মত। মহা বিরক্তিকর। তবু একটু একটু ক'রে লিখছি। ওই ডেভিড ল্যাকের বইয়ে আর একটা কথাও দেখবেন এবং সম্ভব হ'লে মিলিয়ে দেখবেন—যা তিনি রবিন রেডব্রেস্টের সম্বন্ধে লিখেছেন, তা দোয়েলের সম্বন্ধে খাটে কি না। আমার মনে হচ্ছে খাটে। কথাটা হচ্ছে এই যে, পাখীরা সব সময়ে প্রিয়ার মনোরঞ্জন করবার জন্যেই যে গান গায় তা নয়। ডেভিড ল্যাক লক্ষ্য করেছেন যে,

কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্টের নিজস্ব এলাকায় যদি অন্য কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্ট এসে পড়ে, তা হ'লে আগন্তুক পাখীকে লক্ষ্য ক'রে এলাকার মালিক গানের তুফান তোলে। অর্থাৎ ঝঙ্কারের মাধ্যমেই তাকে হুঙ্কার দেয়। মানুষের সঙ্গে ওইখানেই ওদের তফাত। এলাকার স্বত্বে কেউ যদি অবাঞ্ছিত দাবি করে—আমরা গালাগালিই দিই, মোকদ্দমা করি; কিন্তু পাখীরা গান গেয়ে ওঠে। এবং সেই গানের মর্যাদাও রক্ষা করে ট্রেস্‌পাসার পাখীটি। ও, এটা যে আপনার এলাকা বুঝতে পারে নি ঠিক, সো সরি—মুখের এই রকম একটা কাঁচুমাচু ভাব ক'রে স'রে পড়ে সে। সব পাখী অবশ্য এতটা বিনীত নয়, দু-একজনকে মারধোর ক'রেও তাড়াতে হয়। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, এদের নিজস্ব এলাকার মালিকানা কে ঠিক ক'রে দেয়? এরা নিজেরাই ঠিক করে। কোনও অনধিকৃত এলাকা যে আগে দখল করতে পারে সে এলাকা তারই হয়—পক্ষী-জগতে এই নিয়ম মেনে নিয়েছে সবাই। একাধিক দোয়েলের পায়ে বিভিন্ন রঙের 'রিং' পরিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আপনারাও লক্ষ্য করতে পারেন, ডেভিড ল্যাক যেমন করেছেন। দোয়েলের বিষয় আরও কয়েকটা কথা জানিয়ে দিয়ে পত্র শেষ করি। দোয়েলের প্রধান খাদ্য হচ্ছে পোকা-মাকড়। ওদের যদি খাঁচায় পুষতে চান তা হ'লে ছোলা ছাতু বা ফল খাওয়ালে চলবে না,—ওরা টিয়া-চন্দনার মত বৈষ্ণব-প্রকৃতির নয়, রীতিমত শাক্ত। সেই জন্যেই বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ বুলি ওদের শেখানো যায় না। এদের প্রকৃতিতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার আছে। এরা ছাতারের মত দল বেঁধে থাকতে পারে না। এমন কি নিজের প্রিয়ার সঙ্গেও এদের খুব যে একটা মাখামাখি আছে তা নয়। যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে এরা গানের ঝরনা বইয়ে দিতে পারে, কিন্তু দিনরাত প্রিয়ার সঙ্গে লেপটে থাকতে রাজী নয় এরা। মেজাজটাও

এদের একটু ঝাঁঝালো রকমের, ইংরেজীতে যাকে বলে pugnacious। অর্থাৎ এদের ধরন-ধারণ চাল-চলন সবই প্রকৃত আর্টিস্টের মত। এরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, কারও সঙ্গেই গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকতে চায় না। ফিন্ সাহেব লিখেছেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রস আইলাণ্ডে নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে দোয়েল পাখী দেখা যায় এবং তারা মানুষ দেখলে নাকি পালায় না। বড় দোয়েলকে ধ'রে খাঁচায় পোষা বেশ শক্ত, সহজে পোষ মানে না, ম'রে যায়। এর একটা কারণ বোধ হয়, যে-পোকামাকড় ওদের খাদ্য তা প্রত্যহ জোটানো শক্ত। একজন সাহেব কিন্তু খাঁচায় দোয়েল-দম্পতিকে পুষেছিলেন, খাঁচায় তারা নাকি ডিম পেড়ে বাচ্চাও লালন করেছিল—ফিন্ সাহেব লিখেছেন। ওদের লেখা বই যখনই পড়ি, একটা কথা বার বার মনে হয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওদের কি অদম্য কৌতূহল। অগাধ বিদ্যা আর শিশুসুলভ কৌতূহলের মণিকাঞ্চন-যোগ হয়েছে ওদের প্রতিভায়। আমাদের দেশে কত ফুল, কত পাখী, কত রকমের গাছ; কিন্তু সে সম্বন্ধে কারও কোনও কৌতূহলই নেই। দু-চারটে পাখী বা গাছের নাম অনেকে অবশ্য জানেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে যা কিছু তা সব 'জংলি' বা 'কি জানি'র পর্যায়ে। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা আরও অজ্ঞ। একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, কিন্তু সে চেষ্টাই কারও নেই। সবাই চাকরি কিংবা ব্যবসা ছাড়া আর যা কিছু করেন তা অতিশয় নিম্নস্তরের পরচর্চা। ভাবলে দুঃখ হয়। কি আশ্চর্য দেখুন, কথায় কথায় আমিও বেশ পরচর্চায় মেতে উঠেছি। এটা বোধ হয় আমাদের মজ্জাগত দোষ। চিঠি অনেক লম্বা হয়ে গেল। আর আপনার সময় নষ্ট করব না। পাখীর বিষয়ে নূতন কি কবিতা লিখলেন? পাঠাবেন? পাখী আকর্ষণ করবার জন্যে আপনারা যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে

কোনও পাখী আকৃষ্ট হয়েছে কি না জানাতে বলবেন শ্রীমতী ডানাকে। আমার ছোট চিড়িয়াখানার চিড়িয়ারা আশা করি সুস্থ আছে। যদি কাউকে অসুস্থ দেখেন ছেড়ে দেবেন। প্যাঁচাটা কেমন আছে? ও খুব মাংসাশী লোক। মালিটাকে ব'লে এসেছি ইঁদুর ধ'রে দিতে। ইঁদুর যদি রোজ না পাওয়া যায় বাজার থেকে মাংসের কিমা কিনে দেবেন। এখানকার ব্যাপার মিটিয়ে ফিরে যেতে আমার বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজকর্ম চালাবার জন্যে আপনাকে একটা 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' পাঠালাম এই সঙ্গে। রত্নপ্রভা এই সঙ্গে আপনাকে হাজার টাকার ক্রস্‌ড্‌ চেকও পাঠাচ্ছে। সে বলছে, এটা পারিশ্রমিক নয়—প্রণামী। শ্রীমতী ডানার চেকটা কাল বা পরশু পাঠাবে সে।

আপনারা আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। সব খবর দিয়ে উত্তর দেবেন। ইতি—

আপনাদের
অমরেশ

কবি চেকটার দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল তাঁর। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। ডানার টেবিলে চিঠি-লেখার যে প্যাডখানা ছিল, সেইটে টেনে নিয়ে তিনি লিখলেন—

কবির তপস্যা-লোকে এসেছে অপ্সরী
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি'।
কখনও সে মদিরাক্ষী টলমল-পান-পাত্র হাতে
যৌবন-হিল্লোলে দুলি' আসিয়াছে জ্যোৎস্না-নীল রাতে;
কভু চুপে চুপে
এসেছে ভক্তের রূপে;

প্রশংসার বাণী-রূপে কভু এসেছে সে
উচ্ছ্বসিত রসিকের বেশে ;
জনতার রূপ ধরি করিয়াছে কভু অভিষেক,
আদেশ করেছে কভু, কখনও সে 'চেক'।
বারম্বার তার কাছে পরাভব করেছি স্বীকার
তবু আমি কবি নির্বিকার
গুটি-কারাগার-মাঝে কিছুদিন থাকি শূন্য-গতি
তারপর একদিন উড়ে যাই মুক্ত প্রজাপতি।

কবিতাটির দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে কবি চেকটি মনি-ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ঠিক পর-মুহূর্তেই ডানা এসে ঘরে ঢুকল।

"ও, আপনি এসেছেন। ভালই হয়েছে। আমি আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। তালগাছে যে বাক্সটা আমরা টাঙিয়েছি, তাতে এক জোড়া শালিক বাসা বাঁধছে। ও কি, কবিতা লিখলেন বুঝি ?"

কবি কবিতাটা প'ড়ে শোনালেন।

"হঠাৎ এ ভাব মনে এল যে আপনার ?"

"এল।"

"চলুন, শালিকের বাসাটা দেখবেন।"

"চল। ফিরে এসে চা খাব কিন্তু।"

"বেশ।"

দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

কবি অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে-ফিরে বাসাটা দেখলেন। সত্যিই এক শালিকদম্পতি খড়কুটো মুখে নিয়ে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

"দেখেছেন ? ভারি মজা লাগছে আমার।"

"আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।"

"কেন ?"

"মানাচ্ছে না একটুও। মনে হচ্ছে যেন এক সাঁওতাল-দম্পতিকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে কলকাতা শহরের দোতলা ফ্ল্যাটে। মনে হচ্ছে—ওটা যেন ফাঁদ, বাসা নয়।"

"কি যে আপনার আজগুবি কল্পনা! চলুন, চা ক'রে দিই আপনাকে।"

ডানা হেসে কথাটা বললে বটে, কিন্তু কথাগুলো হঠাৎ কেমন যেন তার মনে গেঁথে গেল।

"তাই চল।"

দুজনে আবার বাসার দিকে ফিরলেন।

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

পরের দিন সকালে উঠেই ডানার সর্বপ্রথম মনে পড়ল শালিকের বাসার কথাটা। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তালগাছটার উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই যা চোখে পড়ল, তাতে চমকে উঠল সে। বাসা থেকে একটা সাপের খোলস ঝুলছে। পাখী দুটো কোথায় ? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, দেখতেই পেল না। মহা মুশকিল হ'ল তো! ওদের বাসায় সাপ ঢুকেছে না কি! তাড়াতাড়ি গিয়ে চাকরটাকে ডেকে নিয়ে এল। চাকরটা খানিকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বললে, "ঢিল ছুঁড়ে দেখব ?"

"ঢিল ছুঁড়বি ? যদি ওরা ভেতরে ডিম পেড়ে থাকে! তুই গাছে উঠতে পারবি না ?"

"না"

"তা হ'লে উপায় ?"

চাকরটা তালগাছটার তলায় গিয়ে গাছটাকে নাড়া দিতে চেষ্টা করল। গাছ নড়ল না একটুও।

"মই জোগাড় করতে পারিস কোথাও থেকে ?"

"মই নিয়ে কি হবে ?"

"মই লাগিয়ে তুই উঠতে পারিস ?"

"সে আমার দ্বারা হবে না। ওখানে উঠে জান দেব না কি ? সত্যিই যদি সাপ থাকে আর সে যদি তাড়া ক'রে আসে—ওরে বাবা, সে আমি পারব না মাইজি—"

ডানার মনে হ'ল, সাপের খোলসটা দুলছে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল তার। দিনের আলোয় তার চোখের সামনে এত বড় একটা সর্বনাশ হতে থাকবে আর সে কিছুই করতে পারবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে খালি। না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

"তুই একটা মই যোগাড় ক'রে আন্ তো। তুই উঠতে না চাস আমি উঠব।"

"মই আমি কোথায় পাব ?"

"আমি আনন্দবাবুকে একটা চিঠি দিচ্ছি। চিঠিটা নিয়ে তুই ছুটে চ'লে যা। তিনি নিশ্চয়ই একটা মই যোগাড় ক'রে দিতে পারবেন। চট ক'রে যাবি আর আসবি।"

ডানা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কবিকে একটা চিঠি লিখল—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহা মুশকিলে পড়েছি। তালগাছে শালিক পাখীর বাসায় সাপ ঢুকেছে। একটা মই চাই। একটা লোকও যদি পাঠাতে পারেন ভাল হয়। আপনাকে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না, একটা মই পেলে আমিই সব ঠিক ক'রে নেব। আপনি আসবেন না কিন্তু। এলে খুব রাগ করব। বিপদে পড়লে পুরুষদের সাহায্য

ছাড়াও যে আমরা সামলে নিতে পারি, দোহাই আপনার, সেটা যাচাই করবার সুযোগ দিন। ইতি

ডানা

আগের দিন ছিমছাম কৃত্রিম মানুষের তৈরী বাসায় শালিক-দম্পতিকে দেখে কবির মনে যে বেসুর বেজেছিল, সেইটেই তাঁকে পরদিন প্রভাতে একটি কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করল। উপলক্ষ্য হ'ল একটি দাঁড়কাক। দাঁড়কাকটি তাঁর বাড়ির সামনের একটি ডালে ব'সে তারস্বরে চীৎকার করছিল। মন্দাকিনী থাকলে তার ওই শ্রুতিকঠোর খা-খা-খা শব্দ কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না, কাকটাকে তাড়িয়ে ছাড়তেন। কবি কিন্তু উদ্বুদ্ধ হলেন এবং ছন্দে গেঁথে দাঁড়কাককে খামখা উপদেশ দিতে ব'সে গেলেন। প্রথম দু লাইন লিখেই তাঁর মনে হ'ল, ভাবটি যেই জ'মে আসবে অমনি ঠিক খুনের মামলার নথিপত্র নিয়ে কুঁজো গণেশ গোমস্তা হাজির হবে এসে। সম্ভাবনাটা মনে জাগতেই ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। রাগও হ'ল, মনে হ'ল এলেই দূর ক'রে দেব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করলেন যে, মনের সুরটাও কেটে যাবে তা হ'লে। গণেশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও বিদায় নেবে। কিন্তু উপায়ই বা কি। গণেশকে কি ক'রে ঠেকাবেন তিনি, সত্যিই যদি এসে পড়ে সে। হঠাৎ মনে পড়ল, একটা উপায় আছে। ঠাকুরকে ডাকলেন। চন্দনচর্চিত মৈথিলী ঠাকুরটি দ্বারপ্রান্তে এসে নিজস্ব বাংলায় সসম্ভ্রমে বললে, "আমাকে ডাকিয়েসেন বাবু?"

"দেখ, কেউ যদি এখন আসে ব'লো যে, বাবুর শরীরটা ভাল নেই, এখন দেখা করবেন না কারও সঙ্গে।"

"বেশ। ভাত তো রেন্না করিয়েসি, দু-চারঠো রোটি কি বানাব? শরীর যেখন খারাব—"

"না, ভাতই খাব।"

ঠাকুর চ'লে গেল। জানলা দিয়ে কবি চাইলেন বাইরের

দিকে। দাঁড়কাকটা তখনও ডাকছিল। কবি তাকে উদ্দেশ ক'রে লিখলেন—

বলিষ্ঠ দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক্
    বুলবুলি হবি কোন্ দুঃখে
শুনে লেগে যায় তাক
তোর ওই হাঁকডাক
    রূপ দেয় রুষ্টে ও রুক্ষে।

মনে আছে কবি এক দিয়েছিল তোরে গাল
ময়ূরের পেখমেতে হয়েছিলি নাজেহাল।

দেখিস খবরদার
করিস না যেন ধার
    অভাব কিসের তোর বচ্ছ
কুচকুচে কালো গায়
আলো যে পিছলে যায়
    কুচকুচে চোখ তোর স্বচ্ছ।

শৌখিন পাখীদের মিহি সুর ছাপিয়ে
গলা ছেড়ে হাঁক দে রে চারিদিক কাঁপিয়ে

ন্যাকামিকে তাড়িয়ে
সা রে গা মা ছাড়িয়ে
    ছোটা তোর বেসুরের অশ্ব

রে হাবসি-সম্রাট,
তোর ঠাট তোর বাট
একেবারে তোর যে নিজস্ব।

ওরে ওরে দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক্
কালো-কোলো বোম্বেটে পক্ষী
বুলবুলি দোয়েলের
টুনটুনি কোয়েলের
হ'স না নকল যেন লক্ষ্মী।

ডানার চাকর আনন্দবাবুর বৈঠকখানায় এসে কড়া নাড়তেই ঠাকুর গিয়ে হাজির হ'ল। সে যেন ওৎ পেতে ব'সে ছিল।

"বাবুর তবিয়ত খারাপ। মুলাকাত হোবে না।"

"মাইজি আমাকে একটা মই নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"মই? মানে সিঁড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"সিঁড়ি তো হামাদের নাই।"

"কাদের আছে?

"রূপচন্দবাবুর বাসায় খুব লম্বা সিঁড়ি দিখিয়েছি একটা। সিথায় গেলে মিলতে পারে।"

"ও, আচ্ছা—"

রূপচাঁদবাবু আপিসে চ'লে গিয়েছিলেন।

যথারীতি চণ্ডী এসেছিল বকুলবালার কাছে। সে একটি দুঃসংবাদ বহন ক'রে এনেছিল। অনেক চেষ্টা ক'রেও গণশা এবার নাকি হলদে পাখীর বাসা আবিষ্কার করতে পারে নি। অথচ এই

হলদে পাখীর বাসা আবিষ্কারের উপর চণ্ডীর ভবিষ্যৎই নির্ভর করছিল। বকুলবালা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি সে হলদে পাখীর বাচ্চা এনে দিতে পারে তা হ'লে তাকে 'এয়ার-গান' কিনে দেবেন একটা। চণ্ডীকে অবশ্য তিন-সত্যি করতে হয়েছিল যে, সে এয়ার-গান দিয়ে কাক ছাড়া আর কোনও পাখী মারতে পারবে না। বেরাল, নেউল, শেয়াল, ক্ষ্যাপা কুকুর এসব মারতে পারে, কিন্তু কাঠবেড়ালী, ছাগলছানা বা গরু-বাছুরকে কিছু বলতে পাবে না। চণ্ডী এসব শর্তে রাজী ছিল, কিন্তু গণশা যা বললে তাতে তো এ বছর এয়ার-গান পাবার আশা দুরাশা।

বকুলবালা একটা ধনুকে ছিলে পরাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য দুর্বৃত্ত কাককুলকে শাসন করা। বকুলবালা একটু আরাম ক'রে বারান্দায় তোলা-উনুনটি নিয়ে রাঁধতে চান, (গরমে ওই ঘুপসি রান্নাঘরে টেকা যায় নাকি।) কিন্তু কাকের দৌরাত্ম্যে তা হয়ে উঠছে না। একটু নড়বার জো নেই—কখনও মাছভাজাটা নিয়ে পালাচ্ছে, কখনও দুধে মুখ দিচ্ছে। জ্বালাতন হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই আজ ঠিক করেছেন, তীর-ধনুক দিয়ে কাক তাড়িয়ে তবে রাঁধতে বসবেন। তীর-ধনুকটা পাশেই থাকবে, তা হ'লে মুখপোড়ারা ভয়ে আর আসবে না।

চণ্ডীর মুখ থেকে দুঃসংবাদটি শুনে তিনি শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু। ভাবটা—তুমি যে একটি অপদার্থ তা আমি বরাবরই জা[illegible]

মুখে বললেন, "ছিলেটা পরা তো, আমি বাঁকারিটা ভাল ক[illegible] বাঁকিয়ে ধরছি। খুব কস্‌-কসিয়ে বাঁধবি।"

চণ্ডী যথাসাধ্য শক্ত ক'রে দড়িটা বেঁধে ফেললে।

"এইবার একটা তীর ছোঁড়্ দিকি। ওই কাকটাকে মার্। মুখপোড়া সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে আমাকে।"

"তীর কোথায়?"

"ওই যে। সকাল থেকে তো তীরই বানাচ্ছিলাম। একা হাতে বাঁশ চিরে তৈরি করেছি। তুমি তো এই এতক্ষণে এলে—"

চণ্ডী ধনুকে তীর যোজনা ক'রে লক্ষ্য করতেই কাকটা স'রে পড়ল। আশেপাশে আরও যা দু-একটা ছিল, তারাও উড়ে গেল।

"এই হচ্ছে ওদের ওষুধ।"

বকুলবালার চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল।

"দেখি, দেখি, আমাকে দে তো—"

একটা কাক অনেক দূরে মিত্তিরদের চিলেকোটার ছাদে এসে ব'সে ছিল আবার। বকুলবালা তীর-ধনুক আঁচল দিয়ে ঢেকে গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন সে দিকে।

"এইবার মারুন।"—ফিসফিস ক'রে চণ্ডী বললে।

বেশ বাগিয়ে তীর ছুঁড়লেন বকুলবালা। আর একটু হ'লেই লাগত, একবারে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কাকটা কা-কা ক'রে পাড়া মাতিয়ে তুলল।

"তীরটা খুঁজে নিয়ে আয়।"

একছুটে বেরিয়ে গেল চণ্ডী এবং একটু পরেই তীরটা নিয়ে এল। এ সব ব্যাপারে সে ওস্তাদ একজন।

"রেখে দে ঠিক জায়গায়। গুছিয়ে রাখ্।

চণ্ডী বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল।

বকুলবালা এবার হলদে পাখীর প্রসঙ্গে এলেন।

"গণশা এবার হলদে পাখীর বাসা দেখতেই পায় নি?"

"অমরবাবুর আম-বাগানে গণশা গেল-বছর হলদে পাখীর বাসা দেখেছিল। এ বছর সে বাগানে হলদে পাখীই নাকি দেখা যাচ্ছে না। গণশা বলছিল, অমরবাবুর লোকেরা নানা রকম ফাঁদ পেতে, জাল ফেলে, বন্দুক আওয়াজ ক'রে সব পাখীদের ভড়কে দিয়েছে, এ বছর ওরা হয়তো এ অঞ্চলে বাসা বাঁধবে না।"

"দূৎ, তা কি কখনও হতে পারে? এখানকার পাখী কি বাসা বাঁধবার জন্যে দিল্লী মক্কা চ'লে যাবে? গণশাটা বোকা, কিছু জানে না। তুই নিজে খুঁজিস একটু—"

"আমি যে হলদে পাখীর বাসা চিনিই না।"

"পাখীর বাসা চেনা আর শক্ত কি। পাখীর বাসা দেখিস নি কখনও ?"

"আমাদের ঘরের আলসেতে একবার শালিক বাসা বেঁধেছিল। কাকের বাসাও দেখেছি। বাবুই পাখীর বাসাও দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রকম যে। হলদে পাখীর বাসা দেখি নি কক্‌খনও কিনা।"

"গণশা তো দেখেছে, তাকে জিজ্ঞেস করিস না।"

"আচ্ছা।"

এমন সময় বাইরের দুয়ারে ডাক শোনা গেল, "বাবু বাড়ি আছেন ?"

"দেখ্‌ তো কে এল এমন অসময়ে ?"

চণ্ডী বেরিয়ে গেল। ডানার চাকরকে সে চিনত। আনন্দবাবুকে লেখা ডানার চিঠিখানা নিয়ে ফিরে এল সে।

"অমরবাবুর বাগান-বাড়িতে যে মেয়েটি আছেন তিনি একটা সিঁড়ি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন আনন্দবাবুকে। আনন্দবাবু এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"চিঠিটা পড়্‌ তো।"

ডানার সম্বন্ধে দু-একটা কথা রূপচাঁদের মুখে বকুলবালা শুনে-ছিলেন। মেয়েটি নাকি বেশ লেখাপড়া জানা, অমরবাবু দু শো টাকা মাইনেয় চাকরি দিয়েছেন নাকি ওকে। ডানার সম্বন্ধে বকুলবালার বেশ একটা কৌতূহল ছিল, চিঠিটা শুনে তা আরও বেড়ে উঠল। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বেশ লিখেছে তো চিঠিখানা। নিশ্চয়, পুরুষদের সাহায্য নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কল্পনানেত্রে তিনি যেন শালিক পাখীর বাসায় প্রবিষ্ট সাপটাকে দেখতে পেলেন। অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় একবার এ ধরনের

ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁদের পায়রার খোপে সাপ ঢুকেছিল। সহসা তাঁর সমস্ত শক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

বললেন, "চণ্ডী, তুই তীর-ধনুকটা সঙ্গে নে। চাকরটাকে ডাক্, মইটা সঙ্গে নিয়ে চলুক, আমরাও যাই চল্।"

ডানাকে দেখে বকুলবালা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, মেম-সাহেব-গোছ হোমরা-চোমরা কিছু দেখবেন। খড়কে-ডুবে-পরা, ছিপছিপে-গড়ন ইনিই ডানা না কি! মুখখানি তো চমৎকার! নিতান্ত ছেলেমানুষও। খুব ভাল লেগে গেল।

"নমস্কার—"

সপ্রতিভভাবে নমস্কার ক'রে ডানা এগিয়ে গেল।

"আপনাকে তো চিনতে পারছি না।"

"আমি বকুলবালা। আমার স্বামীর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

"কে আপনার স্বামী?"

বকুলবালা চণ্ডীর দিকে ফিরে বললেন, "বল্ না রে।"

"রূপচাঁদবাবু।"

"ও, রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী আপনি। আসুন, আসুন। আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। ওই দেখুন—"

বকুলবালা দোদুল্যমান সাপের খোলসটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"সব শুনেছি আমি। আনন্দবাবুর কাছে মই ছিল না। লোকটা ঘুরে আমার বাড়ি গিয়েছিল। তার হাতে আপনি যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, সেটা চণ্ডী আমাকে প'ড়ে শোনালে। আমি নিজে লিখতে পড়তে কিছু জানি না, 'ক' অক্ষর গোমাংস যাকে বলে তাই। কিন্তু আপনি চিঠিতে যা লিখেছেন তা শুনে এত ভাল লাগল যে, থাকতে পারলাম না, নিজেই চ'লে এলাম। সত্যিই

তো, তুচ্ছ সব ব্যাপারের জন্যে পুরুষমানুষের সাহায্য কেন নিতে যাব আমরা ? চলুন, দেখা যাক। ওরে, মইটা দে তো এইবার আমাকে—"

ডানাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বকুলবালা মইটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে নিজেই সেটা অবলীলাক্রমে ব'য়ে নিয়ে গেলেন তালগাছটার কাছে। মইটা যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর পেশীর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল ডানা। অনেক দিন আগে সার্কাসে এই রকম মেয়ে দেখেছিল সে। মইটা তালগাছে লাগিয়ে ডানার দিকে ফিরে বকুলবালা বললেন, "আসুন আপনি।"

বকুলবালার গাছকোমর বাঁধাই ছিল, মাথার খোঁপাটা এলিয়ে বেণীটা লুটিয়ে প'ড়ে ছিল পিঠের উপর। কৌতূহল ঝলমল করছিল চোখের দৃষ্টিতে। অদ্ভুত দৃশ্য। ডানা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল তাঁর দিকে।

বকুলবালা হঠাৎ ডানার দিকে ফিরে অনেকটা যেন জবাবদিহির সুরে আবার বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, চাকরকে দিয়ে মই বইয়ে আনা কেন তবে, ও কি পুরুষমানুষ নয় ? এর উত্তরে আমি বলব, ওদের মাইনে দিয়ে যখন রেখেছি তখন খাটিয়ে নেব বইকি। ওরা যখন থাকবে না, তখন নিজেরাই সব করব। কি বলেন ? আসুন, সিঁড়ির নীচের দিকটা চেপে ধরুন, আমি উঠি—"

ডানা এগিয়ে গেল। বকুলবালার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যদিও প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু তাঁর সরল সপ্রতিভ আলাপে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল। রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী এমন চমৎকার মানুষ, অথচ আলাপ হয় নি এতদিন।

"বেশ জোরে চেপে ধ'রে থাকুন।"

"আপনি উঠছেন তো, কিন্তু সত্যিই যদি সাপ থাকে।"

"থাকলেই বা, কি করবে আমার। চণ্ডে, ওই বাঁকারিটা প'ড়ে

আছে, আমায় দে তো। কিছু দূরে উঠে খোঁচা দিয়ে দেখব প্রথমে। সাপ থাকলে হয় ফোঁস করবে, না হয় বেরিয়ে পড়বে।"

চণ্ডী বাঁকারিটা এনে দিতে বকুলবালা তলোয়ার গোঁজার মত ক'রে কোমরে সেটা গুঁজে নিলেন। তারপর উঠতে লাগলেন। ডানা মইটা ধ'রে রইল শক্ত ক'রে। আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগল শালিক পাখীরা। দু-একটা পাখী উড়ে এসে ঠোকরাবারও চেষ্টা করতে লাগল বকুলবালাকে। বকুলবালা কোমর থেকে বাঁকারিটা খুলে তলোয়ার-চালানোর ভঙ্গীতে আস্ফালন করতে করতে উপরে উঠতে লাগলেন।

"আর বেশি উঠবেন না। এবার খোঁচা দিয়ে দেখুন, ভিতরে কিছু আছে কি না।"

বকুলবালা তর্ তর্ ক'রে বেশ অনেকখানি উঠে পড়েছিলেন। পাখীর বাসা তাঁর বাঁকারির নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তিনি সাপের খোলসটায় প্রথমে খোঁচা দিলেন, খোঁচা দিতেই প'ড়ে গেল সেটা। বাসার ভিতর খোঁচা দিলেন, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সোজা তিনি উঠে গেলেন এবং বাসার ভিতর উঁকি মেরে দেখলেন। ডানা সোৎসুকে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিল, বকুলবালা কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি তার দিকে প্রেরণ ক'রে বললেন, "সাপ-টাপ কিছু নেই। চারটি নীল রঙের ডিম রয়েছে। পেড়ে আনব?"

"না না, পাড়বেন কেন! বাচ্চা হবে, তখন দেখা যাবে। আপনি নেবে আসুন।"

বকুলবালা অকম্পিত চরণে দ্রুতগতিতে নেবে এলেন।

"আচ্ছা, সাপের খোলসটা ওখানে গেল কি ক'রে তা হ'লে?"

ডানা সমস্যাটার সমাধান করতে পারছিল না কিছুতে। বকুলবালা সমাধান ক'রে দিলেন। বললেন, "ওই মুখপোড়ারাই নিয়ে গেছে হয়তো মুখে ক'রে। কে শত্রু, কে বন্ধু সে বোঝবার বুদ্ধি কি ওদের আছে! দেখুন না, আমাকেই তেড়ে তেড়ে ঠোকরাতে

আসছে, অথচ আমি ওদের বাসা থেকে সাপ তাড়াতে যাচ্ছি। ওদের ঘটে বুদ্ধি থাকলে ভাবনা ছিল কি।"

"চলুন, একটু চা খাওয়াই আপনাকে।"

"এ সময়ে কেউ আবার চা খায় না কি? চা খাব সেই পাঁচটায়, উনি আপিস থেকে ফিরে এলে।"

"তবু চলুন, বসবেন একটু।"

"তা বসছি একটু, চলুন—"

বকুলবালা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল ডানার টেবিলের উপর মোটা মোটা বই দেখে।

"এই সব আপনি পড়েন?"

"পড়ি মাঝে মাঝে। অমরেশবাবু দিয়ে গেছেন, পাখীর বিষয়ে কিছু জানবার দরকার হ'লে উলটে-পালটে দেখি—"

"এতে সব পাখীর কথা আছে না কি? সব পাখীর বই?"

"হ্যাঁ। অনেক রকম পাখীর ছবিও আছে, দেখুন না।"

"হলদে পাখীর ছবি আছে?"

হলদে রঙের পাখী তো অনেক আছে, কোন্‌টার কথা আপনি বলছেন?"

"বেনেবউ।"

"ও, বুঝেছি। খুব ভাল ছবি আছে, দেখাচ্ছি আপনাকে।"

ডানা ছবি বার ক'রে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বকুলবালা। চণ্ডীও সমান উৎসাহে বইটা আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু বকুলবালার ধমক খেয়ে ছেড়ে দিতে হ'ল বেচারাকে।

"তুই ছাড়্ না, আমি আগে দেখে নিই, তারপর তোকে দেখাচ্ছি। অমন আত্মাখলাপনা করিস কেন? বাঃ, চমৎকার তো! ঠিক যেন জ্যান্ত পাখীটি ডালে ব'সে রয়েছে! এর একটা বাচ্চা পোষবার খুব শখ আমার, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না।"

ডানা বললে, "আমারা লোক বাহাল করেছি সব রকম পাখীর

বাচ্চা সন্ধান করবার জন্যে। হলদে পাখীর বাচ্চা যদি পাই, দেব আপনাকে পাঠিয়ে।"

"দেবেন ? সত্যি বলছেন ? তিন সত্যি করুন।"

বকুলবালা উদ্ভাসিত চক্ষে ডানার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

এতটা ছেলেমানুষি ডানা প্রত্যাশা করে নি। সেও ছেলেমানুষের মত হেসে ফেললে, হেসেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভও হ'ল একটু।

"তিন সত্যি করবার দরকার কি ? পেলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।"

বকুলবালার জেদ চ'ড়ে গেল হঠাৎ।

"না, আপনি তিনবার বলুন—দেব দেব দেব। বলতেই হবে আপনাকে।"

বকুলবালার চোখের দিকে চেয়ে ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে। শুধু তিন সত্যি ক'রেই নিস্তার পেলে না সে, গায়ে হাত দিয়ে দিব্যিও করতে হ'ল তাকে। আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল হাসিতে চোখ-মুখ ঝলমল করতে লাগল বকুলবালার।

"এবার যাই ভাই। ওঁর আসবার সময় হ'ল আপিস থেকে, খাবার-টাবার কিছু করা হয় নি এখনও। এই চণ্ডী, ওঠ্।"

চণ্ডী সবিস্ময়ে নানা রকম পাখীর ছবি দেখছিল। কি অদ্ভুত সব পাখী!

"এটা কি পাখী ?"

"ধনেশ।"

বকুলবালা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন।

"ধনেশ আবার পাখীর নাম হয় নাকি! ধনেশ বলতেই মনে পড়ে আমাদের গাঁয়ের ধনেশ ময়রাকে—মোটা কালো গোলগাল, দেখলেই মনে হ'ত একটা তরমুজ বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই বলত, খুকী, পানতোয়া খাবে ? চল তা হ'লে দোকানে। আমি তাকে দেখলেই ছুটে পালাতাম। এ তো অদ্ভুত পাখী

দেখছি, ঠোটের ওপর একটা আবের মত রয়েছে।...চণ্ডী, তুই উঠবি কি না বল্, না উঠিস তো আমি একাই চললাম।"

বকুলবালা চণ্ডীর সঙ্গে চ'লে গেলেন। ডানা একা ব'সে ব'সে বকুলবালার কথাই ভাবছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার মেয়েটিকে। অনিবার্যভাবে রূপচাঁদের কথাটাও তার মনে হচ্ছিল। ওই রকম প্যাঁচোয়া লোকের এত সরল স্ত্রী! এমন চমৎকার সহজ সরল স্বাস্থ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পেয়েও ওঁর এমন কাঙালপনা কেন? মনে হ'ল, সহজ সরল ব'লেই হয়তো মনের মিল হয় নি। হাবভাবময়ী লীলাকুশলা হ'লে হয়তো পছন্দ হ'ত। হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল। ছুটতে ছুটতে বকুলবালাই এসে হাজির হলেন আবার।

"একটা কথা আপনাকে মানা করা হয় নি। ওঁর কাছে যেন ভুলেও কক্‌খনও বলবেন না যে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"কেন?"

"ওরে বাবা! খেয়েই ফেলবেন তা হ'লে আমাকে। কোথাও যাওয়া উনি পছন্দ করেন না।"

"হলদে পাখীর বাচ্চা যদি পাই, তা হ'লে পাঠাব কি ক'রে আপনাকে?"

"চণ্ডে আসবে নিতে। মাঝে মাঝে ও এসে খবর নিয়ে যাবে। এই চণ্ডে, ভুলিস না যেন—"

"না।"

চণ্ডী সাগ্রহে মাথা নেড়ে জানাল যে, কিছুতেই তার ভুল হবে না।

"চললুম। ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছি।"

বকুলবালার সমস্ত মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

"চললুম ভাই, তা হ'লে।"

"আসুন। মাঝে মাঝে আসবেন লুকিয়ে। আমি রূপচাঁদ-বাবুকে কিছু বলব না।"

"আচ্ছা, আসব। চণ্ডে, চল্, আমরা ওই বাগানটার ভেতর

দিয়ে যাই। রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ যদি দেখতে পেয়ে যায়! রোদ প'ড়ে গেছে তো, লোক চলাচল শুরু হয়েছে—"

"বেশ, তাই চলুন।"

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা চ'লে গেলেন। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন আর একবার। তারপর বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডানা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিস্মিত হয়ে দাড়িয়ে রইল। আশ্চর্য মেয়েটি! বয়স বেড়েছে, কিন্তু মন বাড়ে নি। দেহটা যেন মনের ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না, হাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে খেয়ালও নেই। একটু যেন ঈর্ষা হ'ল। মনে হ'ল, আধুনিকতার অতি-সভ্য জটিল মানসিকতা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের কারু-কলায় যার নিত্য নূতন রূপ বিকশিত, এই সরলতার কাছে হার মেনেছে। গাছের ফুলের কাছে কাগজের ফুল দাঁড়াতে পারে কখনও? অকারণ ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর মনে হ'ল, পাখীর পালক বিষয়ে যে প্রবন্ধটা সে ফেঁদেছিল সেটা খানিকটা লেখা হয়ে প'ড়ে আছে। শালিক পাখীর বাসাটা নিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটল, বকুলবালাকে নিয়ে কাটল আরও খানিকক্ষণ। এইবার পাখীর পালক নিয়ে পড়া যাক। সময় কাটানোটাই যেন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঘরে ফিরে পাখীর পালক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। অমরবাবু একগাদা বই দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অকূল পাথার। কিন্তু এ অকূল পাথারে কষ্ট হয় না, নব নব বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে মন। সাপ যে-সরীসৃপশ্রেণীভুক্ত, সেই সরীসৃপই যে বিবর্তিত হয়ে পাখীতে পরিণত হয়েছে—এ কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না, অথচ বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলছেন। সরীসৃপের গায়ের আঁশই নাকি পালকের রূপ ধারণ করেছে। সরীসৃপ-পূর্বপুরুষদের আঁশ পাখীদের গায়ে এখনও বর্তমান, পাখীদের নখও নাকি আঁশ থেকে

হয়েছে, কোন কোনও পাখীর ঠোঁটও। এদের ঠোঁট নাকি খোলসও ছাড়ে বছরে বছরে সাপের মত। এ সব কথা কল্পনাতীত ছিল তার, অথচ সবই বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে সত্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে-সরীসৃপ বুক দিয়ে মাটিতে হাঁটত, সে-ই ক্রমশ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে শিখল, তারপর লাফিয়ে গাছে চড়ল, তারপর উড়ল আকাশে। আকাশ পেরিয়ে আর কোথাও যাবে নাকি? কিংবা হয়তো গেছে, এখনও জানা যায় নি। আকাশচারী হয়ে এদের চঞ্চলতা তো বেড়েছে, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিও বেড়ে গেছে বহুগুণ। ঘ্রাণশক্তি নাকি কমেছে। তাই এরা দুর্গন্ধ স্থানে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে, দুর্গন্ধ পোকামাকড়ও গিলে খায় স্বচ্ছন্দে। ঘ্রাণশক্তি ক'মে গিয়ে একটা বাধাই যেন অপসারিত হয়েছে, জীবনকে আরও তীব্রভাবে উপভোগ করতে পারছে ওরা। বস্তুত পাখীর মত অমন স্বতস্ফূর্ত চঞ্চল প্রাণের প্রকাশ প্রকৃতির আর কোনও প্রাণীতে আছে কি? পাখীর আসল পরিচয় ওর প্রাণলীলায়। যতক্ষণ জেগে থাকে স্থির থাকে না এক মুহূর্ত। নেচে গেয়ে লাফিয়ে উড়ে রঙের বাহার ছড়িয়ে ও যেন সর্বদাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমি শুধু বেঁচে নেই, আমি জীবনটাকে উপভোগ করছি। পালক ওদের এই অতিক্রান্ত ছন্দ-মুখরিত বর্ণ-বিচিত্র জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। এই পালক ওদের গায়ের লেপ (ওদের পালক চুরি ক'রে আমরাও লেপ তৈরি করি), এই পালক ওদের যানবাহনও, পালকের সাহায্যেই ওরা ওড়ে। এই পালকের সাহায্যে ওরা শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষাও করে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সঙ্গে পালকের রঙ বেমালুম ভাবে মিলিয়ে দিয়ে ওরা শত্রুর চোখে ধুলো দেয়। জীবন্ত পাখীটাকে দেখতেই পাওয়া যায় না। মনে হয়, বুঝি ঝোপের ভিতর ওটা আলোছায়ার কারিকুরি—বনমুরগী নয়, কিংবা গঙ্গার চরে ওগুলো

বালির ঢেউ—টিট্রিভ নয়। এ ছাড়া পালকের সাহায্যে ওরা প্রণয়লীলাও করে নানা রকম। পুরুষপাখী নানা বর্ণের পক্ষ বিস্তার ক'রে আহ্বান জানায় প্রণয়িনীকে। প্রণয়িনীও সাড়া দেয় পালকের ইশারায়। অনেক পাখী পালক দিয়ে বাসাও তৈরি করে ডিম পাড়বার সময়। মোট কথা, পাখীর জীবনে পালক অপরিহার্য, ওই ওদের ব্যক্তিত্ব। দু জাতের দু রকম পাখী পালকের জন্যই দু রকম, পালক ছাড়িয়ে ফেললে কোনও তফাত থাকে না আর বিশেষ। পালকের রঙের বিষয়েও একটা আশ্চর্য কথা চোখে পড়ল তার। সাধারণত প্রাণীদের শরীর থেকেই রঙ তৈরি হয়। পাখীরও হয়। কিন্তু অনেক পাখীর পালকের এমন গঠন-বৈচিত্র্য যে, সূর্যালোকই সেই পালকে প'ড়ে ভেঙে যায় এবং সূর্যালোক-ভাঙা রঙ তখন প্রতিফলিত হয় পালক থেকে। আকাশে যেমন আমরা রামধনুর রঙ দেখি, অনেকটা তেমনই। রঙটা আলোর, পালকের নয়। সব পাখীর পালকে অবশ্য এমন আলোর লীলা হয় না, কোন কোন পাখীর পালকের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই এ রকম হয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর একটা কথা চোখে পড়ল। অদ্ভুত কথাটা। কোটি কোটি বৎসর ধ'রে পৃথিবীর জীবেরা নাকি বোবা ছিল, তাদের মুখে ভাষা ফুটেছে অনেক পরে।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মধ্যে এখনও অনেকেই মূক। তাদের কণ্ঠে ভাষা নেই। তাদের অনেকে শব্দ করে বটে, কিন্তু তা কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় না, হয় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। পতঙ্গরা শরীরের এক অংশ অন্য অংশে ঘর্ষণ ক'রে শব্দ করে। মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট উভচরেরাই সর্বপ্রথমে কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েছিল। মস্ত দাদুরীরাই গান গেয়েছিল প্রথম এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রণয়িনীকে আহ্বান করা।

কবি এসে ঢুকলেন হুড়মুড় ক'রে।

"মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।"

"কি ?"

"সেই খুনের ব্যাপারটার তদ্বির করতে এখন ছুটতে হবে আমাকে সদর এস. ডি. ও.র কাছে। কি বিপদ বল দিকি। অমরেশবাবু এক ভীষণ ঘানিতে জুড়ে দিলেন আমাকে দেখছি। তোমাকেও। তোমার জন্যও একটা দুঃসংবাদ এনেছি। একটা হুতোম প্যাঁচা কিছু খাচ্ছে না। মালীর ভার্সন অবশ্য, তুমি গিয়ে একটু দেখে এস। মালীটা বেশ মুটিয়েছে দেখলুম। প্যাঁচার বরাদ্দ 'কিমা'টা ওই খাচ্ছে কি না কে জানে।"

ব'লেই কবি নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডানার মুখের দিকে চেয়ে—রোদের তাতে ডানার মুখটা রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

"কি দেখছেন ?"

"তোমাকে। চমৎকার দেখাচ্ছে। এই নিদারুণ রোদে একটা অদ্ভুত রূপ ফুটেছে তোমার। দাঁড়াও।"

ব'সে পড়লেন টেবিলের ধারে এবং খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন—

মরুভূমির তপ্ত বায়ে
গোলাপ ফোটে কাঁটার বনে
পথিক শুধু হারায় দিশা
অসম্ভবের আমন্ত্রণে
মরীচিকায় বয় নদী যে
স্বচ্ছধারা অলীক খাতে
কাঁটার বনে গোলাপ জাগে
পথিক-অলির প্রতীক্ষাতে।
লগ্ন জাগে কোন্ আকাশে
কোন্ বাঁশরীর কোন্ সুরে যে

বলতে পারে সেই কবি সে
কাছে থেকেও রয় দূরে যে।

কবিতাটা প'ড়ে ডানা বললে, "এটা কি হ'ল?"

"হ'ল একটা যা হোক কিছু। গোলাপের সঙ্গে প্রলাপ মেলাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, পারলাম না। হাতে সময় নেই এখন। চললুম। তুমি প্যাঁচাটার খবর নিও একটু।"

কবি চ'লে গেলেন। ডানা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কবিতাটা পড়লে আর একবার। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। অদ্ভুত প্রকৃতির ভদ্রলোক। বাপের বয়সী, অথচ ছেলেমানুষের মত মন। কোনও কুমতলব আছে ব'লে মনে হয় না, অথচ কেমন যেন...

হুতোম প্যাঁচাটার খবর নেওয়ার জন্যই ডানা বেরিয়ে পড়ল। এমন সময় বেরুতে হ'ল ব'লে খারাপ লাগতে লাগল খুব। একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, অর্থাভাবে প'ড়েই এই সব করতে হচ্ছে। তার পর মনে হ'ল, কবিও ওই কথাই বলেছিলেন। অর্থাভাব সকলকেই যেন ঘানি টানাচ্ছে, ঘানির চেহারাও নানা রকম। অমরবাবুর কথা মনে হ'ল। অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা পাখী সম্বন্ধে যে সব গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, অর্থাভাবে তা করতে পারছেন না ব'লে অমরবাবুর মত বড়লোকও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন একদিন মনে পড়ল। অদ্ভুত জিনিস এই টাকা। সকলেরই টাকার দরকার, সকলেরই টাকার প্রতি লোভ।

কক্‌রিং—কক্‌রিং—

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বাদামী রঙের ল্যাজ-ঝোলা পাখীটা আমগাছের ডালে দুলে দুলে ডাকছে। তার পর নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী আসছেন, তাঁর হাতে কি যেন একটা রয়েছে। কাছাকাছি হতে ডানা জিজ্ঞাসা করলে, "হাতে ওটা কি আপনার?"

"শাবল।"

"শাবল নিয়ে কি করবেন? ও, আপনার ওদিকের সেই খুঁটিটা প'ড়ে গেছে বুঝি? তা, আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমি কাল আমার চাকরটাকে পাঠিয়ে ঠিক ক'রে দেব। আমাকে একটু খবর পাঠালেই হ'ত, আমি আগেই করিয়ে দিতাম।"

সন্ন্যাসী কিছু না ব'লে মুচকি হাসলেন একটু। তার পর নিজের গন্তব্যপথে চ'লে গেলেন। ডানা তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হ'ল, এ লোকটি একেবারে স্বতন্ত্র। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না, নিজেকে নিয়েই আপন মনে আছেন ওই ভাঙা ঘরটাতে, অথচ এঁকে অগ্রাহ্য করবারও উপায় নেই। ডানার সমস্ত মনটা তো এঁকে ঘিরেই স্বপ্ন রচনা করছে। রূপচাঁদের লোলুপতা, কবির কবিত্ব, অমরেশবাবুর পক্ষীতত্ত্ব মাঝে মাঝে তার ভাল যে লাগে নি তা নয়, ওঁদের নিয়ে কিন্তু তার মন স্বপ্নরচনা করতে পারে না। ডানা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, কেন পারে না? সামাজিক বাধা আছে ব'লে? কিন্তু তা তো নয়। তা যদি হ'ত তা হ'লে সে বাধা তো এই সন্ন্যাসীর বেলাতে আরও প্রবল। তা ছাড়া সমাজের সঙ্গে মানুষের বাইরের আচরণেরই সম্পর্ক বেশী, মন তো স্বাধীন। তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে যে জগৎ সে সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে বাইরের সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। না, কারণটা সামাজিক নয়, অন্য কিছু। খানিকক্ষণ পরে ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর চরিত্র রহস্যময় ব'লেই কি তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে? কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, কিই বা এমন রহস্যময়! অস্পষ্ট তো কিছু নেই। সোজাসুজি সন্ন্যাসী, ভাঙা কুঁড়েতে আপন খেয়ালে থাকেন, ভিক্ষে করেন, ভজন করেন, কাছে গেলে আলাপ করেন, কোন রকম বাজে ভড়ং নেই, আত্মগোপন করবার প্রয়াস নেই, তাক লাগিয়ে দেবার কসরৎ নেই। নিতান্তই সহজ সরল প্রাণ-খোলা লোক। ওঁর চেয়ে রূপচাঁদ ঢের

বেশী রহস্যময়। কিন্তু রূপচাঁদকে ঘিরে মন স্বপ্ন রচনা করতে চায় না তো। কেন···? এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ডানা অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল, মল্লিক মশাই যে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তা সে লক্ষ্যই করে নি।

"নমস্কার। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"নমস্কার। আমার কাছে? কেন, কিছু দরকার ছিল?"

"আনন্দবাবু শুনলাম আপনার বাসার দিকে এসেছেন, দরকারটা আমার তাঁর সঙ্গে। কোথায় তিনি?"

"আমার কাছে একটু আগে এসেছিলেন, কিন্তু কোথায় যেন একটা খুন হয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি এস. ডি. ও.র কাছে গেলেন।"

"এস. ডি. ও.র কাছে। সেখানে যাবার কিছু দরকারই ছিল না। রূপচাঁদবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। উনিই তো পুলিস সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। এই কথাটাই ওঁকে বলবার জন্যে আসছিলাম। আমার অবশ্য মাথাব্যথা হবার কথা নয়, ম্যানেজার এখন আমি নই, ম্যানেজার আনন্দবাবুই, কিন্তু ঘাঁৎঘোঁৎ ঠিক রপ্তো হয় নি তো ওঁর, তাই ভাবলাম—কথাটা ওঁকে ব'লে আসি। অমরবাবুর নিমক তো অনেক দিন ধ'রে খেয়েছি, ভাবলাম—যাতে ওঁদের একটু সুবিধা হয় সেটা করা আমার কর্তব্য। কর্তব্য নয়?"

কর্তব্য কি না তার উত্তর না দিয়ে ডানা বললে, "আচ্ছা, উনি এলে আমি বলব আপনার কথা।"

"বলবেন, নিশ্চয়ই বলবেন। রূপচাঁদবাবুকে আমিও বলব। তবে আমি ডিটেল্‌স্ সব জানি না তো—"

"আচ্ছা।"

ডানা পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

মল্লিক মশাই বললেন, "এই খাঁ-খাঁ রোদে চলেছেন কোথা?"

"পাখীগুলোর তদারক করতে। শুনলাম, একটা প্যাঁচা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"একটি পাখীও বাঁচবে না। বনের পাখী কি অমন ভাবে রাখলে বাঁচে? আপনি বলবেন, চিড়িয়াখানায় বাঁচে কি ক'রে তা হ'লে? চিড়িয়াখানায় কত রকম ব্যবস্থা, কত রকম তদারক, গবর্মেণ্টের একটা আলাদা ডিপার্টমেণ্টই রয়েছে ওর জন্যে, তবু ম'রে যায়। আর আপনারা ভেবেছেন, মুন্সী আর গোটাকতক বদমাইস পাখীওলা আপনাদের চিড়িয়াখানা চালাবে! ছাগল দিয়ে বলদের কাজ হ'লে কি কেউ বলদ কিনত?"

"কিন্তু ওরা তো মোটামুটি ভালই চালাচ্ছে।"

"টিয়া ক'টা আছে গুনে দেখেছেন?"

"না, গুনি নি। গোটা দুই ম'রে গেছে।"

"মরে নি। মুন্সী বিক্রি করেছে। একটা কিনেছে আমার ছেলে আর একটা কিনেছে চণ্ডী—রূপচাঁদবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করে যে ছোঁড়াটা।"

ডানা অবাক হয়ে গেল।

"সত্যি?"

"আরও শুনবেন? পাখীদের যে ছোলা, ফল, মাংস, মাছ আপনারা কিনে দেন, তা কি ওদের দেয় ওরা? কিচ্ছু দেয় না, বিক্রি করে।"

"তাই নাকি?"

ডানার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। মনে হ'ল, অপরাধ তারই। অমরবাবু তার উপরেই বিশ্বাস ক'রে এতগুলি পাখী রেখে গেছেন, তারই উচিত সামনে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ানো। মুন্সীটা এত চোর! এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। যথেষ্ট মাইনে দেওয়া হয় তাকে।

"এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছেন, মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে যে। আমার ছাতাটা নিয়ে যান না হয়।"

"না, থাক্। রোদে ঘোরা আমার অভ্যাস আছে।"

আর কোনও কথা না ব'লে ডানা হন হন ক'রে এগিয়ে গেল। মল্লিক মশাই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তার পর মাথা নাড়লেন। মুখে একটা বিচিত্র হাসিও ফুটে উঠল তাঁর।



৩

এক লোলুপ ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচার সামনে রক্ত-চর্চিত মেদ-মণ্ডিত একটা মাংসের প্রকাণ্ড টুকরো ঝুলছে আর সেটা না পেয়ে বাঘটা নিষ্ফল আক্রোশে খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরছে—ঠিক এ উপমা রূপচাঁদের সম্বন্ধে খাটবে না। মনে মনে তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরছিলেন ঠিকই, ডানা এখনও তাঁর নাগালের বাইরে আছে—এ কথাও মিথ্যা নয়, তাঁর একাধিক চাল ব্যর্থ হয়েছে তাও তিনি মর্মে-মর্মে অনুভব করছেন। কিন্তু খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরবার লোক তিনি নন। খাঁচার অস্তিত্বই ছিল না তাঁর কল্পনায়। এ ধরনের আজগুবি রূপকে তিনি বিশ্বাসই করেন না। তিনি একটু নির্লিপ্ত হয়ে ক্রেতা রূপচাঁদের কৃপণতাটা উপভোগ করছিলেন। ঠিক কত দাম দিলে যে মালটা পাওয়া যাবে তা বেচারা নির্ণয় করতে পারছে না কিছুতে। বহুকাল আগে রূপচাঁদ একবার নিলামে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন। একটা কাশ্মীরী শাল খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। পঞ্চাশ থেকে শুরু ক'রে ডাক দেড় শো পর্যন্ত উঠল। রূপচাঁদ ডাক দিলেন দু শো, প্রতিপক্ষ দু শো দশ হাঁকলেন। রূপচাঁদের জেদ চ'ড়ে উঠল, হেঁকে দিলেন তিন শো। প্রতিপক্ষ আবার দশ বাড়ালেন—তিন শো দশ টাকায় লোকটি আর একটু হ'লে নিয়ে নিয়েছিলেন শালটা। রূপচাঁদ

হাঁকলেন—পাঁচ শো। প্রতিপক্ষ আর দাম বাড়াতে সাহস করলেন না। রূপচাঁদ শালটা কিনে নিলেন। দমকা অত টাকা খরচ ক'রে তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল কিছুদিন; কিন্তু তার জন্যে তাঁর মনোকষ্ট হয় নি, ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ ক'রে তিনি প্রীতই হয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ডানাও নিলামে চড়েছে। ঠিক কত দাম হাঁকলে যে তাকে পাওয়া যাবে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না। প্রতিপক্ষ অমরেশ ও আনন্দমোহন যে কত দাম হেঁকেছে তাও ঠাহর করতে পারছিলেন না তিনি। সেটা জানতে পারলে সুবিধা হ'ত। তবে আর একটা কথাও অবশ্য ঠিক যে, রূপচাঁদ নিছক ক্রেতাও নন। তিনি আর্টিস্টও। অতসী কাচের ভিতর দিয়ে যে-কোনও মুহূর্তে রামধনু দেখতে পাওয়া যায় ব'লেই অতসী কাচের প্রতি তাঁর লোভ। লোভের সঙ্গে রামধনুর স্বপ্নটা জড়িয়ে থাকাতে লোভটা বেড়েছে সত্যি, কিন্তু একটু বিশেষত্ব লাভও করেছে। কারণ লোভটা কাচের প্রতি নয়, আকাশচারী রামধনুর প্রতি। নারীমাংস বাজারে অপ্রতুল নয়। প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীর তৃতীয় শ্রেণীর ছাগমাংসও যেমন বাজারে বিক্রি হয়, নারী-মাংসও হয়। কিন্তু তার প্রতি লোভ নেই রূপচাঁদের। তারা সুলভ ব'লে নয়, তাদের সংস্পর্শে এসে স্বপ্ন জাগে না ব'লে। নিতান্তই খেলো কাচ তারা—কেউ রঙিন, কেউ সাদা, কেউ পাতলা, কেউ পুরু; কিন্তু অতসী কাচের বিশেষত্ব নেই তাদের। আলোকে তারা রামধনু করতে পারে না, ডানা পারে। ডানা কাচও নয় ঠিক, দামী হীরের টুকরো। যখনই ডানার সান্নিধ্যে এসেছেন তখনই এটা অনুভব করেছেন তিনি। ওর চোখে শুধু দৃষ্টি নেই—স্বপ্নরাও আছে, ওর রূপ, শুধু দেহেই নিবদ্ধ নয়—দেহাতীত রূপকথা লোকে নিয়ে যাবার শক্তি আছে তার। ওর কাছে গেলেই মনে হয়, বয়স ক'মে গেছে, দায়িত্বের বোঝা নেমে গেছে মন থেকে, কোনও কিছুর জন্যেই কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আর যেন।

মল্লিকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা ভূমিকা রচনা করবার জন্যেই মল্লিককে পাঠিয়েছিলেন তিনি ডানার কাছে। তার কাছে যাবার একটা অজুহাত চাই তো! মল্লিককে সেই অজুহাতের পটভূমিকাটা তৈরি করবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। মল্লিকও সানন্দে রাজী হয়েছিল। ডানাকে, আনন্দবাবুকে, অমরেশবাবুর চিড়িয়াখানাকে, জমিদারকে ছারখার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। ওই মাগীকে (অর্থাৎ অমরেশ-গৃহিণী রত্নপ্রভা দেবীকে) দেখিয়ে দিতে হবে যে, মল্লিক ছাড়া তাঁদের এখানকার জমিদারি অচল। রূপচাঁদ অধীরচিত্তে মল্লিকের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে বাদামী-কালো পাখীটা ডেকে উঠল—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্-গুপ্-গুপ্।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আর একটু দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিলে—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্।

অদ্ভুত লাগল রূপচাঁদের।

৪

সমস্ত দিন 'লু' চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তবু হাওয়ার তাপ কমে নি। ঘরের বাইরে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট চেয়ার বার ক'রে ডানা ব'সে ছিল চুপ ক'রে। জাহাজে আসবার সময় ইঞ্জিনের কাছাকাছি বসলে যেমন মনে হয়, তেমনই মনে হচ্ছিল তার। জাহাজের কথা মনে হওয়াতে বর্মার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মা-বাবা-ভাইটির কথা। মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর কথা। নিজের মনের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। যারা একদিন তার অত্যন্ত আপন ছিল, আজ তাদের কথা কচিৎ মনে পড়ে। যখন পড়ে তখনও ওদের খুব

আপন ব'লে মনে হয় না, মনে হয় ওরা যেন অন্য জগতের লোক, ওদের সঙ্গে আত্মীয়তাটা মানতে হয় যেন নীতিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। মৃত্যু ছিন্ন ক'রে দিয়েছে অন্তরের যোগ। এখন তার কাছে ঢের বেশী আপন অমরেশবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু (হ্যাঁ, রূপচাঁদের বর্বরোচিত লোলুপতাই যেন বেশী আপন করছে তাকে) আর ওই ভগ্নকুটিরবাসী সন্ন্যাসী। রত্নপ্রভাকেও খুব ভাল লেগেছে তার। শ্রদ্ধা হয়েছে তাঁর উপর, কিন্তু সত্যিকার ভাল লেগেছে বকুলবালাকে। মন্দাকিনীর কথা শুনেছে সে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপও হয় নি, তবু তিনি আনন্দমোহনবাবুর স্ত্রী—এই পরিচয়টুকুই যেন ওই অচেনা মানুষটিকে আপন করেছে। নিজের লোক পর হয়ে যায়, পর লোক আপন হয়ে ওঠে মনের কি রহস্যময় নিয়মে, কে জানে। যারা চোখের সামনে সদাসর্বদা ঘোরাঘুরি করে তারা যে সব সময় মনের মতন হয় তা নয়, কিন্তু আপন হয়। মনের মত লোকও দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে আর আপন থাকে না। ইংরেজীতে প্রবচনই আছে—আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড। ডানার মনে হ'ল, দৃষ্টিটা শুধু চোখের না ব'লে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বললে যেন আরও ভাল হয়। যা যতক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর তা ততক্ষণ আমার আপন, ভাল হোক মন্দ হোক তা ততক্ষণ আমার অধিকারভুক্ত, যেন আমার আপন সম্পত্তি, তাই তার সম্বন্ধে মমত্ববোধ প্রবল। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, খেই হারিয়ে গেল চিন্তার। মনে হ'ল ওই সন্ন্যাসী হয়তো ব্যাপারটা স্পষ্টতর করতে পারবেন। উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে। সন্ন্যাসীর কাছে যাবার একটা অজুহাত পেয়ে সে যেন ব'র্তে গেল মনে মনে। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু বিনা কারণে বার বার ওখানে যাওয়াটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হয় নিজের কাছেই। কিছুদূর গিয়ে আবার থেমে গেল সে। মনে হ'ল

সন্ন্যাসী হয়তো ভাববেন যে, মিছিমিছি একটা অজুহাত সৃষ্টি ক'রে তাঁর কাছে গিয়েছে সে। একদিন স্পষ্টই যখন বলেছিলেন যে নারীর সান্নিধ্য তাঁর পক্ষে বিষবৎ ত্যাজ্য, তখন এমন ভাবে সেখানে যাওয়া কি উচিত? ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তার কানে অদ্ভুত শব্দ এল একটা। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররর…। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররর…। ঠিক মনে হ'ল একটা মার্বেল যেন পাকা শানের মেঝেতে প'ড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর গড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল ডানার। মনে হ'ল কোথায় যেন পড়েছে এই রকম ধরনের কি একটা। ঘরে ফিরে এল, আলো জ্বেলে হুইস্লারের বইটা ওলটাতে লাগল। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল সে। নাইট্জার নামক নিশাচর পাখীর ডাক ঠিক ওই রকম। হুইস্লার লিখছেন—resembling the sound of a stone skimming over the surface of a frozen pond…নাইট্জারের কয়েকটা হিন্দী নামও অমরবাবু লিখে রেখেছেন ডানার চোখে পড়ল। চিপ্পাক, ডাবচুরী, ডাভাক্। একটা নামও পছন্দ হ'ল না তার। যে কখানা বই অমরবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন, সবগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল সে। পাখীটার বিশেষত্ব হচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় মুখ, বড় বড় পোকা টপটপ ক'রে গিলে ফেলতে পারে। দাক্ষিণাত্যে এর যা নাম, তার বাংলা হচ্ছে 'ব্যাঙপাখী'। মন্দ না নামটা। পাখীটার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ওতে। পঠিতব্য যা কিছু ছিল সব প'ড়ে ফেলে ডানা টর্চ আর অমরবাবুর দেওয়া বাইনকুলারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। পাখীটাকে দেখতে হবে। শুকনো নদীর খালের কাছে কাছে যেদিকে ঝোপঝাপ আছে, সেই দিকেই এগুতে লাগল। কিছুদূর এগিয়ে গেল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনিশ্চিত ভাবে কতক্ষণ অগ্রসর হবে? কাছেই একটা উঁচু ঢিপির মতন ছিল। তারই উপরে উঠে বসল। ব্যাঙপাখী কাছাকাছি যদি থাকে কোথাও

সাড়া পাওয়া যাবে ঠিক। অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে।

অনেকক্ষণ ব'সে থাকার পরও কিন্তু ব্যাঙপাখীর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ডানা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। দু-একটা নক্ষত্র মিটমিট ক'রে জ্বলছে বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আছে। মেঘ নয়, ধুলো। প্যাঁচার চোখটা মনে পড়ল, অমন স্বচ্ছ চোখ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল মরবার আগে। কিছুতেই বাঁচাতে পারা গেল না পাখীটাকে।

চ্যাইস্—

ঠিক মাথার উপর দিয়ে লম্বা-ডানা পাখী উড়ে গেল একটা। ব্যাঙপাখীই বোধ হয়। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। একটু পরেই আবার শুরু হ'ল একটু দূর থেকে—

টুক্-টুক্-টুক্, টুক্ টুক্ টুক্ টুক্, টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর…

মনে হ'ল যেন ব্যঙ্গ করছে। নাগালের বাইরে চ'লে গিয়ে খুক খুক ক'রে হাসছে যেন দুষ্ট ছেলের মত। ওদের স্বভাবটাই ওই ধরনের। সারাজীবন ধ'রে যেন লুকোচুরি খেলছে সকলের সঙ্গে। দিনের আলোয় পারতপক্ষে বেরোয় না। দিনের বেলা পারিপার্শ্বিকের রঙের সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়ে দেয় নিজেকে যে, দেখাই যায় না। বাদামী পাঁশুটে, সাদা আর কালোর বিস্ময়কর সমন্বয়। একটু পরে আর একটা পাখী ডাকল, তার পর আর একটা, তার পর আর একটা। অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা ঐকতান শুরু হয়ে গেল। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। অজানা কোন এক জগৎ থেকে

ভেসে আসছে যেন আনন্দ-কলরবের প্রতিধ্বনি, একদল ছেলে মারবেল খেলছে, না হাসছে···?

হঠাৎ নজরে পড়ল, একজন কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর শুনতে পেল, গানও করছে গুনগুন ক'রে। টর্চ জ্বালতেই বুঝতে পারল, সন্ন্যাসীই আসছেন। উঠে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী তার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে চ'লে যাচ্ছিলেন পাশ কাটিয়ে।

"কোথা যাচ্ছেন অন্ধকারে?"—ডানা প্রশ্নটা না ক'রে পারল না।

"ওই বালির চরে যাচ্ছি।"

"ওখানে এত রাত্রে?"

"ওখানেই রাতটা কাটাব।"

"ওই চরে? একা?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "প্রায়ই তো ওখানে রাত কাটাই।"

"একা ভয় করে না আপনার?"

"একা তো থাকি না। আরও অনেকে থাকে।"

"আর কারা থাকে?"

"এক ঝাঁক টিট্টিভ, কীটপতঙ্গ, একটা প্রকাণ্ড সাপকেও দেখি মাঝে মাঝে। তা ছাড়া আকাশভরা নক্ষত্র চাঁদ—একা থাকবার কি জো আছে।"

ডানার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল ক'রে উঠল।

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে।"

"তা বেশ, এসো একদিন। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে আমি যা পাই তা পাবে না।"

"কেন?"

"কেউ কাছে থাকলে অনিবার্যভাবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে

হয়। মনের খানিকটা তাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, আর তা থাকলেই অনেক জিনিস সে দেখতে পায় না, অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির মৃদু সাড়া শোনা যায় না। বেশ, এসো একদিন। আমি চলি এখন।”

সন্ন্যাসী পুনরায় চরের দিকে অগ্রসর হলেন।

“অন্ধকারে যাচ্ছেন, টর্চটা নেবেন ?”

“আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ। টর্চ দরকার হবে না।”

সন্ন্যাসী চ’লে গেলেন। ডানা দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক’রে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু হ’ল দূর থেকে—টুক্-টুক্-টুক্-টুক্,—টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্—টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর···

সমস্ত দিনের ‘লু’ যে ধুলোকে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল তা বোধ হয় নেমে আসছিল আবার মাটির দিকে। যে আকাশ একটু আগে ঘোলাটে হয়েছিল তা স্বচ্ছ হয়ে আসছে ক্রমশ। নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে দু-একটা। পূর্বদিগন্তেও আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। দিন দুই আগেই পূর্ণিমা গেছে, একটু পরেই চাঁদ উঠবে তারই আয়োজন হচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। আকাশের দিকে চেয়ে যে কথাটা তার প্রথমেই মনে হয়েছিল তারই একটা নূতন তাৎপর্য নূতন আলোকে যেন তার মনে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রবল ঝঞ্ঝা যে ধুলোকে সবেগে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল, যার প্রাবল্যে আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, একটু আগে পর্যন্ত যা নক্ষত্রদেরও ঢেকে ফেলেছিল, সে ধুলো আবার মাটিতে নেবে আসছে। আকাশে থাকতে পারল না তারা। আকাশের চিরন্তন অধিবাসীদের কোন ক্ষতিও করতে পারল না। নক্ষত্ররা যেমন ছিল তেমনই আছে, ধুলোরাই নেবে আসছে। জোর ক’রে কিছু করা যায় না। কুকুরকে সিংহাসনে বসালেই সে রাজা হয় না। সহসা আর একটা কথাও মনে হ’ল তার সঙ্গে সঙ্গে। ধুলোরা আকাশে বেমানান, কিন্তু মাটিতে তাদের গৌরব। মাটির আসনেই তাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠা

অবিসম্বাদিত। যথাস্থানে তাদের মহিমা আকাশের নক্ষত্রদের চেয়ে কিছু কম নয়। তারা আকাশে যেতেও চায় না, ঝড়ে তাদের ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত ক'রে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ডানার মনে হ'ল, মানব-সমাজেও এই ঝড় মাঝে মাঝে এসে সমস্ত বিশৃঙ্খল ক'রে দেয়। তার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল। তার পর মনে হ'ল তার নিজের স্থান কোথায়? সে নামছে, না, উঠছে? প্রশ্নটার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কারণ নামা-ওঠার মানদণ্ডটা ঠিক জানা নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে যা উন্নতি ব'লে মনে হয়, সত্যি তা কি উন্নতি? কে বেশী উন্নত—ওই সন্ন্যাসী, না, অমরবাবু? কল্পনাবিলাসী কবি কথায় কথায় ছন্দ মিলিয়ে কবিতা রচনা করতে পারেন ব'লেই কি উন্নত বলতে হবে তাঁকে? সংসারের সাধারণ বিচারে রূপচাঁদবাবুও তো মন্দ লোক নন। জীবনটাকে তিনি নিজের পছন্দ অনুসারে উপভোগ করতে চান। কে না চায়? কিন্তু রূপচাঁদবাবুকে উন্নত মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলবে কি! সে নিজেই বা কি! বাল্যকাল থেকে নিষ্ঠাভরে নিজের পানের চুনটি আগলানো ছাড়া আর কিই বা সে করেছে! তার লেখা-পড়া, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বিবিধ আচরণ একটি মাত্র যে জিনিসের উদ্দেশ্যে বিকশিত হয়েছে, সংক্ষেপে তার নাম আত্মবিনোদন। বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ সকলেই আত্মবিনোদনের জন্য ব্যস্ত, প্রত্যেকের পথ শুধু আলাদা। ওই সন্ন্যাসী? তিনিও কি আত্মবিনোদন নিয়েই আছেন!

"টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর···"

আবার শুরু হয়ে গেল 'নাইট্‌জার'দের ঐকতান। পূর্বদিগন্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত হয়ে উঠল ক্রমশ। চাঁদ উঠল। নদীর চরটা স্পষ্ট হয়ে এল। নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল ডানা। তার মনে হতে লাগল একটা সত্য যেন অস্পষ্টভাবে আভাসিত হচ্ছে তার মনের দিগন্তে। কিন্তু কি তার রূপ?

অনেকক্ষণ পরে ডানা যখন তার নিজের বাসায় ফিরে এল তখন সে এতই অন্যমনস্ক যে, বারান্দায় উপবিষ্ট রূপচাঁদকে দেখতেই পায় নি প্রথম। বারান্দায় চন্দ্রালোকে চেয়ারের উপর যে একজন লোক ব'সে আছে তাই নজরে পড়ে নি তার। খুব কাছাকাছি এসে তাই সে চমকে উঠল রূপচাঁদের কথা শুনে।

"অনেকক্ষণ থেকে তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

ডানার মনে হ'ল, রূপচাঁদ সহসা অবির্ভূত হলেন যেন। তিনি এতক্ষণ যেন অদৃশ্যভাবে ওৎ পেতে ছিলেন, যাদুমন্ত্রবলে কায়া পরিগ্রহ করলেন সহসা। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ব'লে মনে হ'ল যে, চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ল সে কিছুক্ষণের জন্য।

"আপনি!"

"হ্যাঁ গো, আমিই। অনেকক্ষণ থেকে ব'সে মশার কামড় ভোগ করছি। এক প্যাকেট সিগারেট শেষ ক'রে ফেললুম প্রায়। কোথা ছিলে বল তো?"

"গঙ্গার ধারে ব'সে ছিলাম।"

"একা?"

"হ্যাঁ, একা ব'সে নাইট্‌জারের গান শুনছিলাম।"

"নাইট্‌জারটা কি ব্যাপার! মানুষ, না, আর কিছু?"

"নিশাচর পাখী একরকম। আপনি এ সময়ে যে?"

ডানার মানসিক স্বচ্ছন্দতা ফিরে এল আবার।

"নিশাচর পাখী সম্বন্ধে মোহ আছে নাকি! শুনে সুখী হলাম। আমিও নিশাচর কি না! আমি এসেছি একটা জরুরী দরকারে। অমরেশবাবুর জমিদারিতে যে খুনটা হয়ে গেছে সেটা সহজে মিটবে ব'লে মনে হচ্ছে না। পুলিস অমরেশের ম্যানেজারকে আসামী ব'লে সন্দেহ করছে। যে কোনও মুহূর্তে অ্যারেস্ট করতে পারে। আনন্দমোহনকে একটু সাবধান ক'রে দিতে এলাম। ওর এখন

একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। ওর বাড়িতে ওকে পেলাম না, ঠাকুরটা অদ্ভুত বাংলায় বললে 'ডেনা মাইজির কাসে গিয়েসেন।' এখানে এসে দেখি, এখানেও কেউ নেই। আনন্দ কি এসেছিল বিকেলে ?"

"এসেছিলেন। এসেই চ'লে গেলেন সদরে। বললেন, ওই খুনের মামলা সম্পর্কেই এস. ডি ও.র সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"সদরে গেছে না কি! সেরেছে! তা হ'লে তো এতক্ষণ পুলিসের খপ্পরে প'ড়ে গেছে সে। কি মুশকিল! এই কবিগুলোর যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে! উঠি—"

চিন্তিতমুখে উঠে পড়লেন রূপচাঁদ। তাঁর ভয় হচ্ছিল, অভিনয়টা তিনি ঠিকভাবে করতে পারছেন কি না! ডানাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। খবরটা শুনে সত্যই শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে।

"পুলিস তাঁকে অ্যারেস্ট করেছে নাকি!"

"করাই সম্ভব। এস. পি. দারোগাকে যে রকম কড়া হুকুম দিয়েছে, তাতে তাই তো মনে হয়।"

"কে খুন হয়েছে ?"

"একটি স্ত্রীলোক।"

"স্ত্রীলোক ? তার সঙ্গে আনন্দবাবুর সম্পর্ক কি ?"

"তা কি ক'রে বলব বল ? কার সঙ্গে কোথা দিয়ে কার যে কি সম্পর্ক থাকে বলা শক্ত। পুলিস আর আদালতে সেটা নির্ণয় করবে। আনন্দমোহনের সই-করা একটা চিঠি নাকি পাওয়া গেছে মেয়েটির ঘরে।"

"কি চিঠি ?"

"নোটিশ একটা। মেয়েটি বিধবা এবং যুবতী। তার কিছু জমি আছে এঁদের জমিদারিতে। খাজনা বাকী অনেক দিনের। তাই সম্ভবত ম্যানেজার হিসাবে আনন্দমোহন বাকী খাজনার জন্য নোটিশ দিয়েছিল। কিন্তু কবি কিনা, তাই নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে

লিখেছে—'নোটিশের ভাষাটা স্বভাবতই রুক্ষ, কিছু মনে ক'রো না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল, যদি চাও তো খাজনা কিছু মাপও ক'রে দিতে পারি।' এই চিঠি পাওয়ার দু দিন পরেই তার রক্তাক্ত লাস [illegible] আবিষ্কার [illegible] পুলিস। তারপর তাঁর ঘর থেকে [illegible]। আমি [illegible] খবরটা পেলে তো।

রূপচাঁদ বাহক এনেছিলেন। মুচকি হেসে [illegible] চ'লে গেলেন।

অনেক রাত্রে বাইকের ঘণ্টার ঝঞ্ঝনায় ঘুম ভেঙে গেল ডানার। বিছানায় উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সেই রইল। [illegible] আর জাগরণের মাঝামাঝি যে অবস্থাটা মানুষকে অসহায় ক'রে ফেলে, কয়েক মুহূর্ত সেই অবস্থায় অসহায় হয়ে ব'সে রইল ডানা। বাইকের ঘণ্টার শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। ঝিল্লীধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'ল যেন। তারপর পদশব্দ পাওয়া গেল বারান্দায়।

"ডানা, ডানা—"

রূপচাঁদবাবুর গলা।

কাপড়-চোপড় সামলে উঠে দাঁড়াল ডানা। পিছনের ঘরে চাকরটা থাকে, তাকে উঠিয়ে দিলে।

"দেখ্ তো, বাইরে কে ডাকছে।"

চাকরকে দেখে রূপচাঁদ হতাশ হলেন একটু, কিন্তু সপ্রতিভভাবে বললেন, "মাইজি কোথা? তাঁকে ডাক্, জরুরী দরকার আছে।"

ডানা বেরিয়ে এল।

"আনন্দবাবুর খবর পেলেন কিছু?"

"পেয়েছি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে, 'বেল' দেয় নি।"

"কোথায় তিনি এখন?"

"জেলে।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তার দিকে, সেই দৃষ্টিটা যেন ধাক্কা মেরে সম্বিত ফিরিয়ে দিলে তার।

"কি উপায় করা যায় তা হ'লে এখন ?"

"সেইটে ঠিক করবার জন্যেই তো এলাম এত রাত্রে। কাল আমার আপিসের নানান ঝামেলা, সময় পাব না। চল, বসা যাক কোথাও। চা খাওয়াতে পারবে কি একটু ? ওরে, জগন্নাথের দোকান চিনিস ? তাকে উঠিয়ে আমার জন্যে এক প্যাকেট কাঁইচি নিয়ে আয় তো। আমার নাম করলেই দেবে।"

পকেট থেকে পয়সা বার ক'রে চাকরটাকে দিলেন তিনি। চাকরটা চ'লে যাচ্ছিল। ডানা তাকে থামিয়ে বললে, "শোন্। আমাদের নায়েব মশাইকেও ডেকে নিয়ে আয়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি—"

ঘরের কোণে যে কমানো লণ্ঠনটা ছিল সেটা উস্‌কে দিয়ে টেবিলের উপর রাখলে সে, তার পর চিঠির প্যাডটা টেনে লিখলে—

হরসুন্দরবাবু,

এইমাত্র রূপচাঁদবাবু খবর এনেছেন যে, আনন্দমোহনবাবুকে নাকি পুলিসে ধরেছে। রূপচাঁদবাবু এখানে ব'সে আছেন। আপনি অবিলম্বে চ'লে আসুন। ইতি

ডানা

চাকর চিঠি নিয়ে চ'লে গেল।

রূপচাঁদ বললেন, "অত ব্যস্ত হ'য়ো না। হরসুন্দরকে বৃথা ডেকে পাঠালে। হাত কচলানো ছাড়া আর কি করবে ও ?"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে চায়ের টেবিলে দাঁড়িয়ে সে স্টোভটা জ্বালতে লাগল। স্পিরিটের স্বচ্ছ নীল শিখাটার দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে,

হঠাৎ চমকে দেখলে রূপচাঁদ তার কাঁধের উপর হাত রেখেছেন। কখন যে নিঃশব্দচরণে এসেছেন তিনি, তা ডানা বুঝতে পারে নি। তার সমস্ত মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। খুব ধীরভাবেই কিন্তু হাতটা সে সরিয়ে দিলে, খুব সংযতকণ্ঠেই বললে, "এ সব কি?" ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

রূপচাঁদ বেরিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ তিনি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে ফেললেন একটা। হাত জোড় ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আত্মসম্বরণ করতে পারি নি। মাপ কর আমাকে।"

"ছি ছি, কি করছেন আপনি উঠুন।"

"বল, আমাকে মাপ করেছ?"

"যার শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে সেই মাপ করতে পারে। আমার কাছে মাপ চেয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছেন কেন? আপনিই বরং মাপ করুন, আমি অসহায়—"

রূপচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তার পর বললেন, "আমার কথাটা তোমাকে বোঝাতে পারছি না ঠিক। একটু যদি ভেবে দেখ—একটু যদি অনুকম্পাসহকারে ভেবে দেখ—তা হ'লেই বুঝতে পারবে, সবচেয়ে অসহায় আমি। বাঘ বা সিংহের কবলে প'ড়ে লোকে যেমন ছটফট করে, আমিও তেমনই একটা হিংস্র আবেগের কবলে প'ড়ে ছটফট করছি। তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারে না—"

ডানার নারীত্ব হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হ'ল এ কথা শুনে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হ'ল সে। সত্যিই তো, লোকটাকে সে মারতে কিংবা বাঁচাতে পারে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নির্দেশে বাঁদরের মত নাচাতেও পারে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। ঠিক এই ঘটনাটা যদি কোন আধুনিক বিদেশী ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মূর্ত হ'ত,

কি করতেন তিনি। যা করতেন তা ডানার অবিদিত নেই, রূপচাঁদবাবুরও নেই সম্ভবত, তাই তিনি নাটকীয় ঢঙ ক'রে ব্যাপারটাকে সেই সম্ভাব্য পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ উনি ধ'রে নিয়েছেন (এবং আধুনিক বাস্তববাদী কবিরা এবং বিজ্ঞানীরা ওঁর এই ধারণাটাকে সমর্থনও করেছেন) যে, নারীকে পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিতে হবেই—ওইটেই তার সহজাত প্রবণতা এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করলেই সমস্ত আর্ট, সমস্ত বিজ্ঞান, এক কথায় আধুনিক সমস্ত চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সতীত্ব বা সংযমের, শ্লীলতার বা শালীনতার কোন মূল্য নেই, থাকা উচিতও নয় যেন। যে যত বেপরোয়াভাবে উলঙ্গ হতে পারবে সে তত আধুনিক, সে তত আর্টিস্টিক। নারী মানেই পুরুষের লালসা-বহ্নির ইন্ধন, অন্য রকম কিছু হ'লেই যেন সে বেমানান। তাকে নানা রঙে রঞ্জিত হতে হবে, নানা ঢঙে সজ্জিত হতে হবে—ওই একই উদ্দেশ্যে। বিদ্যুদ্বেগে কথাগুলো মনে হ'ল তার, নিমেষে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত আগে যে উদ্বুদ্ধ নারীত্ব তাকে বরপ্রদা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়েছিল, এই নূতন আলোক সেই উদ্বুদ্ধ নারীত্ব কামাতুরা কুক্কুরীর রিরংসারই সমপর্যায়ভুক্ত ব'লে মনে হ'ল তার।

"আপনি এ ছাড়া যদি অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে না পারেন, তা হ'লে আমাকে চ'লে যেতে হবে এখান থেকে।"

"অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করা কি সম্ভব এখন?"

"চললুম তা হ'লে।"

রূপচাঁদবাবুর বাইকটা পাশেই ঠেসানো ছিল। ডানা হঠাৎ সেইটেতে চ'ড়েই বেরিয়ে গেল। বিস্মিত রূপচাঁদ তার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। পর-মুহূর্তেই তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন—কোথায় গেল ও? কোথায় যাওয়া সম্ভব? মাথা হেঁট ক'রে ভাবলেন একটু। তার পর ধীরে ধীরে পদচারণ করতে লাগলেন। তার পর চেয়ারটায় গিয়ে

বসলেন। সিগারেট ধরালেন একটা। ঘড়ি দেখলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে চেয়ারে এসে বসলেন আবার। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগলেন পায়ের পাতাটা। ঠিক করলেন, অপেক্ষাই করবেন। হঠাৎ মনে পড়ল, ডানা চা তৈরি করছিল। উঠে ঘরের ভিতর গেলেন। আবার স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করলেন। দু কাপ করলেন। এক কাপ নিজে খেলেন, আর এক কাপ ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। ঘড়িটা দেখলেন আবার। আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। এখনও ফিরল না? ভ্রূযুগল আবার কুঞ্চিত হ'ল। বাইরের চেয়ারে গিয়ে বসলেন আবার। আবার পায়ের পাতাটা নাচাতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তার পর আবার পায়চারি শুরু করলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘড়ি দেখলেন, আরও মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। কোথায় গেল ডানা? ' মনে হ'ল, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন অন্ধকারে। বেশী দূর যেতে হ'ল না। দেখলেন, তাঁর বাইকটা একটা গাছে ঠেসানো রয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হরসুন্দরবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখলেন, ডানাও তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছে। রূপচাঁদের দিকে চেয়ে খুব সপ্রতিভভাবে হেসে ডানা বললে, "খবরটা পেয়ে আমি নিজেই ছুটে গিয়েছিলাম হরসুন্দরবাবুর কাছে। ভাগ্যে গিয়েছিলাম! উনি বাড়ি ছিলেন না। চাকরটা এই খবর নিয়ে ফিরে আসছিল। আমি বাড়ির ভিতর গিয়ে ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, উনি সিংহি মশায়ের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন, সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে এলাম ওঁকে। আমি ওঁকে এখনই সদরে চ'লে যেতে বলছি—"

হরসুন্দরবাবু বিপন্নমুখে রূপচাঁদের দিকে চাইলেন।

বললেন, "এখন গিয়ে লাভ কি। কাল সকালের ট্রেনেই যাব না হয়। এখন গিয়ে কারু সঙ্গে দেখা হবে কি?"

ডানা উত্তেজিত হয়েছিল। বললে, "জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—কটায় ট্রেন?"

হরসুন্দর আরও বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।

"কটায় ট্রেন বলুন না?"

রূপচাঁদ এতক্ষণ স্মিতমুখে চুপ ক'রে চেয়ে ছিলেন।

বললেন, "আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট একজন বাঙালী ভদ্রলোক। তুমি যদি যাও, সঙ্গে সঙ্গে 'বেল' দিয়ে দেবেন। তবে ট্রেনে গিয়ে সুবিধে হবে না, যদি বল রামেশ্বরবাবুর মোটরটা যোগাড় করি। অনুরোধ করলে এখনই পাঠিয়ে দেবেন। হরসুন্দরবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? আমিই চল না হয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তবে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আজ তো আর তাকে ছাড়বে না।"

ডানা বললে, "বেশ, কাল সকালেই যাব তা হ'লে। হরসুন্দর-বাবুর সঙ্গেই যাব। আপনার তো আপিস আছে।"

রূপচাঁদ বললেন, "তা আছে। তবে দরকার হ'লে ছুটিও নেওয়া যায়। কাল দিনের ট্রেনে যদি যাও, আমার অবশ্য যাওয়ার দরকারই হবে না। আমি বরং এস. পি.কে বলব একবার।"

"তা হ'লে তাই ঠিক রইল। চলুন হরসুন্দরবাবু, আপনার গিন্নী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ফুলুরি ভাজা খাওয়ার জন্যে। রাতের খাওয়াটা আপনার ওখানেই সারব আজ—"

"চলুন চলুন। বেশ তো, খুব আনন্দের কথা।"

হরসুন্দরের মুখের বিপন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল। ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রূপচাঁদকে নমস্কার ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। রূপচাঁদ তাদের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে রইলেন।

PDF Compressor Pro

৫

হরসুন্দরবাবুর বাড়ি থেকে ডানা যখন বেরুল, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। চাঁদ উঠেছে। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। হরসুন্দরবাবু একটা চাকর আর একটা টর্চ সঙ্গে দিয়েছিলেন। কিছুদূর এসে ডানা চাকরটাকে বললে, "তুমি শোও গে যাও। টর্চটা সঙ্গে থাকলেই আমি চ'লে যেতে পারব।" চাকর চ'লে গেল। ডানা টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল, অর্থাৎ চিন্তা করতে লাগল, এখন কোথায় যাওয়া যায়। হঠাৎ ঠিক করলে, নিজের বাসাতেই ফিরে যাবে। রূপচাঁদবাবুর ভয়ে গৃহত্যাগী হতে হবে নাকি। দেখাই যাক না ভদ্রলোকের দৌড় কতদূর। ফিরে এসে দেখলে, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর কেউ কোথাও নেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন হতাশ হ'ল একটু। মনের নিভৃত প্রদেশে কে যেন আশা ক'রে বসেছিল যে, রূপচাঁদবাবু তার অপেক্ষায় এখনও অধীরভাবে পায়চারি করছেন মাঠে। তার পায়ের সাড়া পেয়ে চাকরটা উঠে বসল।

"রূপচাঁদবাবুর চাকর এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। জবাবের জন্যে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল, এই একটু আগেই চ'লে গেল।"

খামটা নিয়ে ডানা ঘরে ঢুকে পড়ল। লণ্ঠনটা উসকে চিঠিটা হাতে ক'রে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। কি লিখেছেন ভদ্রলোক! যা লেখা সম্ভব তা তার অজানা নেই···হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। অনেকদিন আগে কথাটা সন্ন্যাসী বলেছিলেন। হাসিমুখেই বলেছিলেন—'ওই রূপচাঁদবাবুর লালসা তোমার মনকেও প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করে নি, আতঙ্কিত করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষার আর একটা রূপ। যে লালসা ওঁর মনে জেগেছে তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের

সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশী হতে… ।'

খামটা ছিঁড়তেই কয়েকখানা নোট বেরিয়ে পড়ল, আর এক টুকরো কাগজ। রূপচাঁদবাবু লিখেছেন—

ডানা,

একটু আগে ঠিক করেছিলাম, তুমি না ডাকলে আর তোমার কাছে যাব না। সে সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতে হ'ল। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল সকালে তুমি সদরে যাবে আনন্দমোহনের 'বেল' নেবার জন্যে। তোমার হয়তো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি জানি পুলিস সংক্রান্ত ব্যাপারে টাকা জিনিসটা দরকারী, তালা খুলতে হ'লে চাবি যেমন দরকারী। তোমার হাতে টাকা আছে কি না আমার জানা নেই। তাই আমার কাছে যা ছিল পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে ফেরত দিও। আমি নিজে পুলিস-আপিসের বড়বাবু, আমার দ্বারা যতটা করা সম্ভব, বলা বাহুল্য, তা আমি করব নিশ্চয়ই; কিন্তু একটা কথা ভেবে মনে হচ্ছে, আমি ব্যর্থকাম হব। পুলিস যেখানে টাকার গন্ধ পায় সেখানে শুধু খাতিরে কাজ করে না। অমরেশবাবু বড় জমিদার, তাঁর ম্যানেজারকে তারা ফাঁসিয়েছে, অতবড় রুইকে তারা শুধু হাতে ছেড়ে দেবে ব'লে মনে হয় না। তবে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিজে যদি যাও, বঁড়শিটা হয়তো খুলে যেতে পারে। ইতি

আরসি

ডানা গুনে দেখলে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল নোটগুলোর দিকে। তারপর সেগুলো আর একটা খামে পুরে খামটা ভাল ক'রে জুড়ে দিলে। চাকরটাকে উঠিয়ে বললে, "জবাবটা রূপচাঁদবাবুকে দিয়ে আয়। চিঠিটা তাঁর হাতেই দিবি।"

চাকরটা ফিরে এল একটু পরে। দেখলে ঘরের কপাট বন্ধ। ভাবলে, মাইজী বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন। সে যদি ভাল ক'রে দেখত তা হ'লে বুঝতে পারত যে, কপাটে খিল বন্ধ নেই, বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। ডানা বেরিয়ে গিয়েছিল চরের দিকে।

ডানা টর্চটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু টর্চের দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে চরে। সে যে ঠিক সন্ন্যাসীর সন্ধান করছিল তা নয়, রূপচাঁদের ভয়ে ভীত হয়ে সে যে পালিয়ে এসেছিল তাও ঠিক নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তর্ক করছিল নিজের সঙ্গে। অতীতে যে জীবনকে সে পিছনে ফেলে এসেছে সে জীবনেরই পুনরাবৃত্তি তার ভবিষ্যৎ-জীবনে কি ক'রে আবার হবে, আবার নূতন ক'রে ভদ্রভাবে কোথায় সংসার পাতবে—এই অতি স্বাভাবিক চিন্তাটাও তার মনে সজাগ হয়ে ছিল না, কখনও থাকতও না। খরস্রোতা জীবননদীর তীরে ছোট একটি গাছের মত বেড়ে উঠেছিল সে, হঠাৎ ধস্ ভেঙে প'ড়ে গেছে নদীর স্রোতে। যে শিকড় আগে স্থাণু মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করত তা এখন করছে বহমান স্রোতের জল থেকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন আর হয় না। ভেসে চলাটাকেই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভেসে এসেছে নূতন জগতে। নূতন জগতের বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ, সন্ন্যাসীকে ঘিরে ঘিরে স্রোতাবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, দাঁড়াতে পারছে না। অস্থির মনও স্বপ্ন রচনা করে। তার মনও করছিল। বিজ্ঞানীকে, কবিকে এবং রূপচাঁদকে কেন্দ্র ক'রে তিন রকম স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছিল তার কল্পনা, যদিও জ্ঞাতসারে তার মনে হচ্ছিল অন্যরকম। মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীই বুঝি তার স্বপ্নের খোরাক জোগাচ্ছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে

ঘিরে কোন বিশিষ্ট স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে ওঠে নি তার মনে। সে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবার উপাদানই পায় নি। ঘুরে ঘুরে তার কাছে এসেছে কিন্তু কিছুই সহ্য করতে পারে নি। অমরেশবাবুকে ঘিরে যে স্বপ্নলোক সে সৃষ্টি করেছিল শ্রদ্ধাই তার প্রধান উপকরণ, কবিকে ঘিরে যে জগৎ সে সৃষ্টি করেছিল তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ছিল কিছু অনুকম্পা, রূপচাঁদের জগতে ছিল রিরংসা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ছিল কেবল কৌতূহল। নিছক কৌতূহল নিয়ে স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করা যায় না, স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করবার জন্যও উপকরণ চাই, কৌতূহল সে উপকরণ সংগ্রহের প্রেরণা মাত্র দিতে পারে। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে যে কৌতূহল জেগেছিল, সে কৌতূহলও সব সময়ে একাগ্র থাকতে পারছিল না। চরে এসে সে সন্ন্যাসীকে খুঁজছিল না। আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ সন্ন্যাসী যে এখানে কোথাও আছেন এই ধারণাটা মনের প্রচ্ছন্নলোকে অস্পষ্ট-রূপে আভাসিত হচ্ছিল, একটা আবছা প্রত্যাশাও ছিল—হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জ্যোৎস্নালোকিত চরটাই কিন্তু পেয়ে বসেছিল তার মনকে। একটা অপরূপ আবির্ভাব যেন তার সমস্ত চৈতন্যকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। জ্যোৎস্না সে আগে অনেকবার দেখেছে, চরও দেখেছে, কিন্তু গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার সঙ্গে আকাশ-ভরা নির্মল জ্যোৎস্না আর দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র চরের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কখনও সে দেখে নি। আকাশ যেখানে চক্রবাল-রেখাকে স্পর্শ করেছে সেই দিকেই স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। সমস্ত জ্যোৎস্না যেন তারস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠল। কলরব করতে করতে চরের উপর দিয়ে পাখী উড়তে লাগল, মনে হ'ল চরটাই বুঝি বহু পক্ষীর রূপ ধ'রে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আগমনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল। একটা বালুস্তূপের আড়ালে ব'সে ছিলেন তিনি, উঠে দাঁড়াতেই

দেখা গেল। পাখীদের এই হঠাৎ চাঞ্চল্য কেন জানবার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ডানাকে তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু এগিয়ে এলেন না, কোনও সম্ভাষণও করলেন না। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। ডানাই এগিয়ে এল।

"ও, আপনি এখানে ব'সে আছেন বুঝি? আপনাকে দেখতেই পাই নি। পাখীগুলোকেও দেখতে পাই নি। ওগুলো টিট্টিভ মনে হচ্ছে—"

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, টিট্টিভই। তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছি।"

"ভাব ক'রে ফেলেছেন?"

"তোমার সঙ্গেও ভাব হয়ে যাবে যদি ওরা বোঝে যে, তুমি ওদের হিতৈষী।"

"সেটা কি ক'রে বোঝাব ওদের?"

"আপনিই বুঝবে। মন অন্তর্যামী।"

"তা হ'লে এখনই বোঝা উচিত ছিল। আমি তো ওদের কোনও অনিষ্ট চিন্তা করি নি।"

"কিন্তু তোমার মত চেহারাওলা অনেকে করেছে। এই সেদিনই ভোরবেলা নৌকো ক'রে শিকারীরা এসেছিল হাঁসের সন্ধানে। হাঁসেরা অনেক আগেই চ'লে গেছে, অনর্থক কতকগুলো টিট্টিভকে মারলে ওরা।"

"মানা করলেন না আপনি?"

"মানা করলে শোনে না কেউ। উপদেশও শোনে না। সবাই আপন প্রবৃত্তি অনুসারে চলে। আমাকে তুমি যদি বল," আপনি এমন ছন্নছাড়া জীবন যাপন করছেন কেন, বিয়ে ক'রে সংসারী হোন—তোমার এ উপদেশ আমি শুনব না।"

"সত্যিই এই ছন্নছাড়া জীবন ভাল লাগে আপনার?"

সন্ন্যাসী হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "ব'স। একটু আগে তুমি একটা অদ্ভুত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছ। না জেনেই করেছ বোধ হয়। ব'স, সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাক। আলোচনা করলে ব্যাপারটা আমার কাছেও বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পরিবেশটাও মনোমত হয়েছে। ব'স।"

এই ব'লে চুপ ক'রে গেলেন তিনি। তলিয়ে গেলেন যেন কোথায়। তারপর বসলেন আস্তে আস্তে। ডানাও বসল। অনেকক্ষণ কোনও কথা হ'ল না। নীরবতা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ডানার।

বললে, "পাখীগুলো এইবার থিতিয়ে বসেছে। খুব কাছেই বসেছে অনেকগুলো। ও-রকম ক'রে বসেছে কেন ?"

"ডিম পেড়েছে ওরা। ডিমে তা দিচ্ছে। রাত্রেই ওরা ডিমে তা দেয়। দিনে বড় একটা বসতে দেখি না। দিনের বেলা নদীর ওপর উড়ে উড়ে মাছ ধরে খালি।"

"ওদের ডিম দেখেছেন আপনি ?"

"হাত দিয়ে তুলে দেখি নি, দূর থেকে ব'সে ব'সে দেখেছি। দিনের বেলা আমিই তো ওদের ডিম পাহারা দি।"

নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে ডানা বললে, "ওরা বালির খাঁজে খাঁজে ডিম পাড়ে, নয় ?"

"হ্যাঁ। কি ক'রে জানলে তুমি ? এসেছিলে নাকি কোনদিন ?"

"বইয়ে পড়েছি। ওরা দিনের বেলা ডিমে তা দেয় না কেন জানেন ? রোদে বালি এত তেতে যায় যে তা দেবার দরকারই হয় না। ওদের ডিম পাহারা দেবারও দরকার নেই, বালির সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।"

"ওদের দরকারের জন্যে পাহারা দিই না, পাহারা দিই নিজের প্রয়োজনে। আমি যে ওদের বন্ধু সেটা ওদের বোঝাবার জন্যে। ওরা সেটা বোঝে। সেদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল।"

"কি ?"

"ওই যে উঁচু বালির ঢিপিটা দেখছ, তার ওপারে কয়েক জোড়া বেশ বড় ধরনের টিট্টিভ আছে। টিট্টিভই বোধ হয়, বেশ বড় ঠোঁট, পিঠ আর ডানার উপরটা কালচে বাদামী, জলের ঠিক ওপর দিয়ে দিয়ে উড়ে যায়—"

"বুঝেছি, বোধ হয় স্কিমার (Skimmer)।"

"তা হবে। ওদের বাচ্চা হয়েছে ওখানে। দুপুরে ব'সে আছি সেদিন, হঠাৎ দু-তিনটে পাখী উড়ে এল, এসে আমার মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করতে লাগল। প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। তারপর মনে হ'ল, পাখীগুলো আমাকে বোধ হয় বলতে চাইছে কিছু। উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দাঁড়াতেই পাখীগুলো আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে ওই ঢিপিটার দিকে উড়তে লাগল। মনে হ'ল, আমাকে যেন ইঙ্গিত করছে অনুসরণ করতে। অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি, একটা সাপ ওদের একটা বাচ্চাকে ধরেছে। তাড়া দিলাম, নড়ল না। তখন বাধ্য হয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে মারতে হ'ল সাপটাকে।"

"কি সাপ ?"

"কোনও চেনা সাপ নয়।"

"আহা, কেন মেরে ফেললেন বেচারীকে! ও তো কোনও দোষ করে নি, নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল—"

"আর্তকে রক্ষা করা কর্তব্য—শাস্ত্রের এই উপদেশ। ভৃগুপত্নী আর্ত দৈত্যদের রক্ষা করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন—"

"ভৃগুপত্নী মানে ?"

"শুক্রের মা।"

"তাই বুঝি শুক্র দেবতাদের ওপর চটা ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আসল প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছি।"

"বলুন।"

"আমার মনে হচ্ছে, ব'লে কি-ই বা হবে। ভাবের সমুদ্রে কত বুদ্বুদই তো উঠছে, প্রত্যেকটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়ও না, প্রকাশ করবার দরকারও নেই—"

"না না, বলুন তবু।"

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই রইলেন।

নীরবতাটা আবার পীড়া দিতে লাগল ডানাকে।

"বলুন না, কি বলতে চাইছিলেন।"

"তুমি তখন বললে, মন অন্তর্যামী, কিন্তু সে এক নজরে বন্ধু বা শত্রুকে চিনতে পারে না কেন? কেন ভয় পায়, কেন সন্দেহের চক্ষে দেখে, কেন যাচিয়ে নিতে চায়? ওটা একটু অদ্ভুত রহস্য। ওর আসল উত্তর কি জান? অন্তর্যামীর শত্রু কেউ নেই, মিত্রও কেউ নাই, কারণ, এই নিখিল বিশ্বই অন্তর্যামী। সে-ই সব, তার আবার শত্রু-মিত্র কি? তোমার ডান হাতটা কি তোমার মিত্র, না, তোমার ডান পাটা তোমার শত্রু? ডান হাতও তোমার, ডান পাও তোমার, তুমিই সবটা। তেমনই বাইরে যা কিছু দেখছ, সবই অন্তর্যামী, তিনিই প্রকাশিত হয়েছেন নানা রূপে, তাঁর কাছে ভেদাভেদ নেই কিছু।"

"তা হ'লে আমাদের মধ্যে যে অন্তর্যামী আছেন, তিনি একজনকে শত্রু, একজনকে মিত্র মনে করেন কেন?"

"ওইটেই তাঁর খেলা। অনেকে বলেন—লীলা।"

"তার মানে?"

"তিনিই যুধিষ্ঠির, তিনিই দুর্যোধন, তিনিই বেদব্যাস, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রই তিনি। এ না হ'লে মহাভারতের কাব্য জমত না। মহাকবি তিনি, অনন্ত তাঁর কাব্য, সে কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে নিজেকেই মূর্ত করছেন তিনি নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা ছন্দে—"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আমিও পারি নি। আভাসে যতটুকু বুঝেছি বললাম। হয়তো ভাল ক'রে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কারণ ঠিক বুঝি নি। বুঝতে পারলেই তো মুক্তি।"

"কি বুঝতে পারলে?"

"যে তুমিই সেই।"

আবার নীরব হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। ডানাও চুপ ক'রে রইল। মনে হতে লাগল, একটা অসীম পাথার যেন থৈ-থৈ করছে চারিদিকে



কবি হাজতে গিয়ে মন্দ ছিলেন না। তাঁর বিবেকে কোনও গলদ ছিল না, মনে তাই কোন অশান্তিজনক আশঙ্কা জাগে নি। তিনি যে অবিলম্বে ছাড়া পেয়ে যাবেন—এ বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। পুলিসের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে এবং অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অভিনব পারিপার্শ্বিকে নীত হয়ে বরং একটু মজাই লাগছিল তাঁর। কোনও অদৃশ্য বিধাতা তাঁকে যেন দৈনন্দিন একঘেয়েমির বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতলোকে এনে হাজির ক'রে দিলেন, রূপকথার হারুন-অল-রশিদ যেমন দিয়েছিলেন আবুহোসেনকে। আর একটা কথা ভেবেও পুলকিত হচ্ছিলেন তিনি। ডানা নিশ্চয়ই খবরটা পাবে, পেয়ে উতলাও হবে নিশ্চয়। উতলা হয়ে জানলার গরাদে ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবার মেয়ে সে নয়, কিছু একটা করবেই। কি করবে, কি করা সম্ভব? কল্পনা নানা রকম ছবি আঁকছিল। মশগুল হয়ে এক-একটা ছবির দিকে চেয়ে দেখছিলেন তিনি। ডানা কি [illegible] শরণাপন্ন হবে? অমরেশবাবুকে টেলিগ্রাম

করবে ? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা হওয়াতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মন্দাকিনীকে খবর দিয়ে দেবে না তো ? তা হ'লে কিন্তু হুলুস্থুল বেধে যাবে। মন্দাকিনীর ঠিকানা অবশ্য ডানার জানা নেই। রূপচাঁদ জানে। চিন্তিত হয়ে হাঁটু দোলালেন খানিকক্ষণ। চিন্তার অন্তরালেও কিন্তু একটা পুলকের স্রোত ফল্গুর মত বইছিল। ডানা যা-ই করুক, তাঁকে নিয়েই যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—উঠেছে নিশ্চয়ই—এই ধারণাটা পুলকিত ক'রে তুলেছিল তাঁকে।

যে ঘরটায় ছিলেন তিনি, সে ঘরে জানলা ছিল একটা। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নীল আকাশ। নীল আকাশের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল একটি গাছের কঙ্কাল। পাতা সব ঝ'রে গেছে। যে শাখা-প্রশাখাগুলি অসংখ্য সবুজ পত্রকে আঁকড়ে ধরেছিল তারা আজ রিক্ত। একটি পাতাও নেই। গাছের শীর্ষদেশে ব'সে আছে এক গোদাচিল। খানিকক্ষণ চিলটার দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে ভাব জাগল। একটা ছোট খাতা আর পেন্সিল তাঁর পকেটে সর্বদা থাকত। বার ক'রে লিখতে লাগলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

যে নিগূঢ় মিল আছে ছবি আর পটভূমিকায়
ফুটিবে তা কোন্ বর্ণে কার তুলিকায় ?
পিছনে আকাশ গাঢ় নীল,
এই পটভূমিকায় গাছের কঙ্কাল আঁকা
শিরে তার ব'সে আছে চিল।
তীক্ষ্ণ নখ-চঞ্চুবান ব'সে আছে অশঙ্কিত হিয়া
তাম্রবর্ণ পক্ষ দুটি সূর্যালোকে ওঠে ঝলসিয়া,
শক্তি-দৃপ্ত অকুণ্ঠিত মহিমার প্রতীক যেন সে,
দৃষ্টি তার প্রশ্ন করে এখনও কেন সে
পায় নি শিকার ;

গাছের কঙ্কাল কিম্বা আকাশের নীল বর্ণ
চিত্তে তার তোলে নি বিকার
আমি কবি, আমি শুধু মুগ্ধ নেত্রে হেরি এই ছবি ;
মনে মনে খুঁজি সেই মিল
রিক্ত-বৃক্ষ, ক্ষুব্ধ-চিল, নির্বিকার আকাশের নীল
যে মিলে মিলিত হ'লে খুলে যাবে সমস্যার খিল।
স্বপ্নে দেখি যেন এক নূতন ধরণী,
নূতন নদীর স্রোতে ভেসে চলে নূতন তরণী ;
আরোহী ওরাই
আকাশের নীল আর গাছের কঙ্কাল আর ওই চিলটাই ;
সে তরীতে আমিই নাবিক
কোন ঘাটে ভিড়িব যে তাও যেন জানি আমি ঠিক।

কবিতাটা লেখা শেষ ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। নূতন ধরণীর নূতন নদীস্রোতে ভাসতে ভাসতে চ'লে গেলেন কোথায় যেন। হঠাৎ চমক ভাঙল, জানলার ঠিক নীচেই খুব চেনা পাখী ডেকে উঠল একটা। ছোট ছেলেরা 'টু' শব্দ ক'রে যেমন লুকোয়, অনেকটা তেমনি মনে হ'ল তাঁর। মনে হ'ল, তাঁকে ডেকে যেন বলছে—কি যা-তা ভাবছ তুমি। আমি এত কাছে রয়েছি দেখতে পাচ্ছ না। কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঠিক নীচেই কুন্দফুলের ঝাড় রয়েছে একটা। আর কিছু দেখতে পেলেন না প্রথমে। একটু পরেই পেলেন। দরজিপাখী একটি, কুন্দ-ঝাড়ের নীচের ডালটিতে ব'সে আছে, ডালটি দুলছে, একফালি রোদ এসে পড়েছে তার ওপর। দরজিপাখীকে একাধিক বার দেখেছেন তিনি ইতিপূর্বে, তার নানা রকম ডাক শুনেছেন, তার পাতায় পাতায় সেলাই-করা বাসাও দেখেছেন—সংগ্রহ করা আছে একটি অমরেশবাবুর মিউজিয়মে ;

কিন্তু এত কাছে, এমন ঘনিষ্ঠভাবে দরজিপাখীকে দেখবার সুযোগ তিনি পান নি। বইয়ে যে বর্ণনা পড়েছিলেন তা মনে করবার চেষ্টা করলেন। বইয়ে লেখা আছে 'অলিভ গ্রান' রঙ, লালচে পা, ছোট্ট মুখ, ছোট্ট ঠোঁট, গলায় কালো কণ্ঠী। সবই মিলে যাচ্ছে। হঠাৎ ল্যাজটা সোজা খাড়া হয়ে উঠল পিঠের ওপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'টোয়িট্' 'টোয়িট্' 'টোয়িট্' শব্দ ক'রে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল দরজিপাখী। বোঝা গেল, কবিকে দেখতে পেয়েছে এবং চটেছে। 'স্পাই'কে পাখীরাও ঘৃণা করে। কবির মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি, ছোট নাতির কাণ্ডকারখানা দেখে দাদামশায়ের মুখে যেমন ফোটে। খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে, এঁকেবেঁকে নানারকমে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাখীটাকে আর দেখতে পেলেন না। একটু দূরে ডাক শোনা গেল—পীপ্ পীপ্ পীপ্। ঠিক এর পরই কবি বুঝতে পারলেন, বন্দীত্বের দুঃখটা কোথায়! তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে গিয়ে পাখীটার খোঁজ করেন; কিন্তু তার উপায় নেই এখন। অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালেন ঘরের মধ্যেই। তারপর চেয়ারে এসে বসলেন। একটু পরে খাতা পেন্সিল বেরুল পকেট থেকে, ভাব ছন্দ আর মিলের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে পড়ল মন, ভেসে চলল কল্পনা-তরণী নূতন নদীর নূতন স্রোতে। অনেকক্ষণ লাগল কবিতাটা লিখতে, অনেক কাটাকুটি হ'ল, তবু মন খুঁতখুঁত করতে লাগল, মনে হ'ল বক্তব্যটা ঠিক যেন বলা হ'ল না।

দরজিপাখী শিল্পী মানুষ মরজি মতন চলেন
'পীপ্' 'পীপ্' 'পীপ্' দু-চার কথা খেয়াল মাফিক বলেন।
তোমার আমার দৃষ্টিটিকে পারতপক্ষে এড়ান,
পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান।

চ'টে গেলেই ধমকে ওঠেন 'টোইট্' 'টোইট্' 'টোইট্'
যার অর্থ সরল ভাষায়—চটছি আমি, 'নো ইট'।
মনটা যখন তলিয়ে ছিল বিষণ্ণতার তলায়
হঠাৎ গানের উঠল গমক দরজিপাখীর গলায়।
চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দেখি, সবুজ কুন্দ-শাখায়
দোল খাচ্ছেন দরজিপাখী রোদ পড়েছে পাখায়।
বুকটি সাদা পিঠটি রঙিন গলায় আভাস কালোর,
হচ্ছে মনে ঝুলছে যেন রঙিন সুরের ঝালর।
জলপাই রঙ সাধছে সারং শুনছে স্বয়ং তপন
বইছে হাওয়া মন্দ-মৃদু আকাশ দেখছে স্বপন।
দেখছে যেন বসুন্ধরাই দরজিপাখীর মতন
রূপের হট্টলোকের মাঝে খুঁজছে অরূপ রতন।
আকাশ-ভরা সূর্য তারা লক্ষ পাতা শাখীর
সব ছাড়িয়া সুর উঠেছে বসুন্ধরা-পাখীর।
পাতায় পাতায় সেলাই ক'রে সেও তো বাসা বানায়
কিন্তু সে যে নয়কো ছোট গান গেয়ে তা জানায়।

কবিতাটি বার দুই মনে মনে পড়লেন তিনি। তারপর জোরে জোরে পড়লেন একবার। 'ছোট্ট' কথাটাকে কেটে 'ছোট' করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন কবিতাটার দিকে ভাবতে লাগলেন, আরও গোটা দুই লাইন জুড়ে দেবেন কি না। এমন সময় জেলারবাবু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

"আপনার 'বেল' হয়ে গেছে। আসুন।"

কবি দাঁড়িয়ে উঠলেন হঠাৎ। খাতাটা প'ড়ে গেল তাঁর কোল থেকে। সেটাকে তুলে আবার পকেটে পুরলেন। খবরটা শুনে তিনি মনে মনে একটু হতাশই হয়ে গেলেন যেন। এত সহজে সব

শেষ হয়ে গেল? তিনি আশা করেছিলেন, অনেক হৈ-চৈ হবে এ নিয়ে।

"'বেল' হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। একজন ভদ্রমহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে। উনিই সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর এস. পি.র সঙ্গে দেখা ক'রে 'বেলে'র ব্যবস্থা করেছেন। আসুন।"

কবি বেরিয়ে দেখলেন, ডানা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। তারপর হঠাৎ গদগদ হয়ে বললেন, "চমৎকার। এইটেই আশা করেছিলাম।"

"চলুন, ট্রেনের বেশী দেরি নেই আর।"

"এ ঘোড়ার গাড়ি কি আমাদের জন্যে?"

"হ্যাঁ। ওইটে ক'রেই তো ঘুরছি সকাল থেকে।"

"ও। খুব ঘুরতে হয়েছে বুঝি?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে ডানা কেবল বললে, "চলুন।"

গাড়িতে উঠে কিছুই কথা হ'ল না খানিকক্ষণ। ডানা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কবি উসখুস করতে লাগলেন। ডানাই কথা কইলে প্রথম।

"মনে হচ্ছে, এরা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে।"

"ষড়যন্ত্র? মানে? কারা ষড়যন্ত্র করছে?"

"মল্লিক মশাইরা।"

"আগে যে মল্লিক ম্যানেজার ছিল, সেই?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটা তো খারাপ নয়। তুমি জানলে কি ক'রে?"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন। মল্লিক মশাই নাকি লোকজন

পুলিস সাহেবকে খবর দিয়েছিলেন যে, এ খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত ?”

“কি রকম ?”

“ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সব কথা খুলে বললেন না। ইঙ্গিতে শুধু বললেন যে, আপনাদের নিজের লোকই তো পুলিসকে এ খবর দিয়েছে। নিজের লোকটি কে তা জিজ্ঞেস করাতে একটু ইতস্তত ক’রে তিনি মল্লিক মশাইয়ের নামটা বললেন। তাঁর ধারণা, মল্লিক মশাই এস্টেটেরই কর্মচারী একজন। আমি যখন তাঁকে বললাম যে, মল্লিক মশাই আগে এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং অমরেশবাবুর স্ত্রী তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আপনাকে বসিয়েছেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত ক’রে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হ’ল, মল্লিকের এই অদ্ভুত আচরণের হেতুটা যেন তাঁর কাছে স্পষ্ট হ’ল। তারপর যখন শুনলেন আপনি প্রফেসার ছিলেন, তখন তাঁর ভুরু আরও কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কলেজের প্রফেসার ছিলেন ? আমি জানতাম না, বলতে পারলাম না। তিনি বললেন, আমি এক আনন্দবাবুর ছাত্র ছিলাম, ইনি তিনি নন তো ? প্রশ্ন করলেন, কবিতা লেখেন কি খুব ? এ খবরটা জানা ছিল। বললাম, লেখেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ইনি তা হ’লে সেই আনন্দবাবু। আমাকে একটা দরকারে এখুনি এক জায়গায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, তা না হ’লে আমি নিজেই যেতাম তাঁর কাছে। যাই হোক, তাঁর ‘বেলে’র ব্যবস্থা আমি এখুনি ক’রে দিচ্ছি—”

কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

“নাম কি বল তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ?”

“তা তো ঠিক জানি না।”

“আমার এক ছাত্র—নিখিল বোধ হয় তার নাম—কোথায় যেন এস.ডি.ও. হয়েছিল শুনেছিলাম, এ হয়তো সেই—”

ডানা বললে, "উনি একদিন আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

কবি হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর কল্পনা-তরণী তখন বিশাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—অকূলে কূল খোঁজবার আশায় নয়, আনন্দের আবেগে।

ডানা বললে, "মিছিমিছি কি কাণ্ড দেখুন তো। খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয় আপনার ?"

"কিছুমাত্র না। আমি কবিতা লিখছিলাম। শুনবে ?"

"এখন থাক্‌। বাড়ি গিয়ে শুনব।"

"না, অত তর সইবে না আমার। এখনিই শোন।"

ছ্যাকড়া গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বর পাল্লা দিতে লাগল।

ডানা ইণ্টার ক্লাস টিকিট করতে চেয়েছিল, কবি কিন্তু শুনলেন না।

ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করতে হ'ল।

কবি বললেন, "তোমাকে ভিড়ের মধ্যে দেখলে ঠিকমত দেখা হয় না। মনের সঙ্গে চোখের ঝগড়া চলতে থাকে খালি।"

ডানা মৃদু হেসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল। হাওয়ার বেগে বিস্রস্ত হতে লাগল তার চুলগুলো।

কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন তার দিকে।

হঠাৎ বললেন, "তুমি যদি আমার মেয়ে হতে, বেশ হ'ত তা হ'লে—ভারি খুশী হতাম।"

"কেন ?"

"অসঙ্কোচে আদর করতে পারতাম। আদর ক'রে যা বলতাম তা বেমানান হ'ত না। এখন কিছু বললেই তুমি চ'টে যাবে, লোকে শুনলেও ছি-ছি করবে।"

"কেন, কি বলতে চান?"

ডানা মুখ টেনে নিলে ভিতরে।

"বলতে চাই— ।" ব'লেই কবি পকেট থেকে খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন-

তুমি সুন্দরী, মন্দার মালা,
তুমি কর্পূরলতা,
দিবসের আলো, রাতের আঁধার
যাচে তব সখ্যতা।

জ্যোৎস্না-সাগরে তোমার তরণী
পাড়ি দেয় যবে রাতে
বেরসিক যারা ঘুমাইয়া থাকে
কবি জেগে থাকে ছাতে।

তাহারই কাব্য-তীর্থে, কণিকা,
ক্ষণতরে অবতরি,
মর্ত্ত্য-মলিন কল্পনা তার
দাও যে সুধায় ভরি।

তুমি দেহ নও, তুমি কেহ নও,
অথচ তুমি যে সব,
তোমারে ঘিরিয়া হয় যে মূর্ত্ত
নিখিলের উৎসব।

তোমারই নয়নে, তোমারই অধরে,
তোমারই ডাহিনে বামে

সত্য-শিবের চির-সহচর
সুন্দর এসে নামে।

জানি না তাহারে, চিনি না তাহারে,
নাম নাই তার জানা,
তবু তারি লাগি কাব্যে ও গানে
সাজাই ছন্দ নানা।

ডানা স্মিতমুখে শুনছিল।

কবি থামতেই হেসে বললে, "আমি তা হ'লে, আপনার মতে, স্টেজ মাত্র।"

"স্টেজের মহত্ত্ব কম নাকি। স্বয়ং শেক্স্‌পীয়র ব'লে গেছেন—সমস্ত পৃথিবীটাই স্টেজ।"

ডানা হাসিমুখে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। তারপর জানলা দিয়ে আবার মুখ বাড়াল। কোন কথা কইল না। যে আমগুলো স্টেশন থেকে কেনা হয়েছিল, কবি তাই একটা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন—হাত বেয়ে রস পাঞ্জাবিতে লাগল।

হঠাৎ ডানা মুখ ফিরিয়ে বললে, "ও কি করছেন? দিন, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। খিদে পেয়েছে আপনার? বলেন নি কেন?"

কবির হাত থেকে আমটা নিয়ে ডানা নিপুণভাবে কাটতে লাগল। কবি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন।

"কি দেখছেন অমন একদৃষ্টে?"

"মেয়েকে, মাকে।"

ডানা চোখ তুলে চাইল। কবি দেখলেন, চোখে যে হাসি চিকমিক করছে তাতে আর শঙ্কার ছায়া নেই। তা প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ।

৭

ফিরে এসেই ডানা আবার বেরিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর খোঁজে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। এই রোদে কেন যে সে বেরিয়ে পড়ল তা নিজেও সে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করল না। আমাদের সব কাজের আসল কারণ কেউ আমরা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি না। অজুহাত অবশ্য সকলেরই একটা থাকে, ডানারও ছিল। যে আমগুলো কাল স্টেশনে কিনেছিল, তাই সে দিতে যাচ্ছিল সন্ন্যাসীকে। পরে দিলেও চলত, চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলত। কিন্তু পিপাসার্ত পশু যেমন সহজ বুদ্ধিবলে টের পায়—জল কোথায় আছে এবং সে জলের সমীপবর্তী কি ক'রে হতে হয়, ডানাও ঠিক তেমনই অনুভব করছিল সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য তাকে এমন কিছু একটা দেবে যার জন্যে সে মনে মনে আকুল। কিন্তু সেটা যে কি, সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার। ধারণা করবার প্রয়োজনও অনুভব করে নি সে। সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, এই হেতুটুকুই যথেষ্ট ছিল তার কাছে।...বেরিয়েই চোখে পড়ল ছাই-রঙের একটা পাখী জিওলগাছের ডালে ব'সে আছে। অনেকটা বাজের মত। বুকের কাছটা বাদামী, তাতে ডোরাও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। চোখ দুটো লালচে। ডানার মনে হ'ল, বাজ নয়, বাজ হ'লে ঠোঁটটা বাঁকা হ'ত। কি পাখী ওটা? এর আগে দেখে নি তো এ পাখী। পাখীটা যেই দেখলে ডানা তাকে লক্ষ্য করছে, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। উড়তেই ডানার নজরে পড়ল, পাখীটার ল্যাজের নীচে কালো রঙের ডোরা রয়েছে। পাখীটা উড়ে গিয়ে দূরে একটা আমগাছে বসল। ডানা চলতে শুরু করল আবার। চলতে চলতে ভাবতে লাগল, কি পাখী ওটা। মনে পড়ছে অথচ পড়ছে না। ঘুরতেই আবার পাখী। এক ঝাঁক ছাতারে একটা ঝোপের ধারে কচকচ করছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দূরে টেলিগ্রাফ-

পোস্টের উপর ব'সে আছে ফিঙে। আর একটু দূরে মন্দিরের চূড়ার উপর নীলকণ্ঠ—ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করছে আর ল্যাজ নাড়ছে। শালিকের বাসা চোখে পড়ল একটা। পক্ষীজগতের সঙ্গে আগে তার কোনও পরিচয় ছিল না, কোন ঔৎসুক্যও ছিল না। বাড়ির বাইরে বেরুলে পাখীদের সম্বন্ধে চোখ কান আগে সজাগ হয়ে উঠত না। এখন হয়। পাখীদের সামান্য সাড়াও মনে সাড়া জাগায়। অমরেশবাবু তাকে নূতন একটা রহস্যলোকের সন্ধান দিয়ে গেছেন। অমরেশবাবুর মুখটা মনে পড়ল। কত বড় বিদ্বান, অথচ কত সরল! এ দেশের এত রকম পাখী দেখেও তৃপ্তি হয় না ভদ্রলোকের। আরও টাকা থাকলে বিদেশে গিয়ে আরও পাখী দেখতেন। ছোট শিশু যেন। ডানার মনের নিভৃত কন্দর থেকে মাতৃস্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, কত টাকা লাগে বিদেশে যেতে? আমার যদি থাকত আমি নিশ্চয় দিয়ে দিতাম। কবির কথাও মনে হ'ল, উনিও একটি শিশু. কিন্তু একটু অন্যরকম। ছিটগ্রস্ত। ভাবের ঘোরে কখন যে কি বলেন, কি করেন—কিছু ঠিক নেই। অনুকম্পা হ'ল। চিন্তাধারায় বাধা পড়ল হঠাৎ। রাস্তার ধারে একটা কাক কি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তাকে দেখেই উড়ে গেল। ডানা দেখলে, মরা ইঁদুর একটা। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, নীচের দাঁত দুটোও দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ ক'রে ব্যঙ্গ করছে যেন। কাকে? বিধাতাকে? মৃত্যুর সম্মুখীন হ'লে সকলেরই যেমন ক্ষণকালের জন্য জীবনের নশ্বরতার কথা মনে জাগে, ডানারও জাগল। বর্মা থেকে পালাবার সময় একবার মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিল সে। মনে পড়ল সে কথা। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বাবার মুখটা স্পষ্ট ফুটে উঠল মনে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? হারিয়ে যায় কি চিরকালের মত? নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাওয়াই ভাল বোধ হয়। এই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখবোধ সমস্ত স্মৃতিসম্ভার বহন করার

সার্থকতা কি থাকতে পারে, জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রই যদি চিরকালের মত ছিন্ন হয়ে যায়? যায় কি? তার এ চিন্তাস্রোতও ব্যাহত হ'ল। দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল আর একটা পাখী—বউ কথা কও। চমৎকার মিষ্টি ডাকটি। 'থা'টির উপর একটু সামান্য জোর দিয়ে, সামান্য একটু টান দিয়ে কি অপরূপ ক'রে বললে—বউ কথা কও। একবার ডেকেই কিন্তু চুপ ক'রে গেল। ডানা এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগল, কোন্ গাছের ফাঁকে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে। যে ছাই-রঙের পাখীটাকে একটু আগে দেখতে পেয়েছিল, সেটা বউ-কথা-কও নয়। যদিও সে চোখে দেখে নি এখনও, কিন্তু বইয়ে পড়েছে বউ-কথা-কও পাখীর রঙ কালো, ঠোঁটের দিকটা সাদা। ওর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo···ছাই-রঙের পাখীটা কি তা হ'লে? পর-মুহূর্তেই পাখীটা তারস্বরে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল। সুরের উৎস পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে উৎসারিত হ'ল, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতপ্ত নির্মেঘ আকাশ সে উচ্ছ্বাসে বিব্রত হয়ে পড়ল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দিগ্‌দিগন্তকে আকুল ক'রে তুলল যেন। ডানার তখন মনে পড়ল, অনেক কষ্টে এই চোখ-গেলকে একবার মাত্র দেখতে পেয়েছে সে। আরও মনে পড়ল, এর সঙ্গে বাজের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে ব'লে এর ইংরেজী নাম Hawk Cuckoo···ডানা চেয়ে দেখলে, কিছুদূরে একটা আমগাছের শাখা ফলভারে অবনত হয়ে পড়েছে। আরও কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া শাখায় শাখায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে, তার পাশেই কর্ণিকার, মনে হচ্ছে অসংখ্য হলুদ-রঙের প্রজাপতি যেন কোনও মন্ত্রবলে অচঞ্চল হয়ে গেছে ওর পত্র-পল্লবে। সমুজ্জ্বল উত্তপ্ত রৌদ্র-কিরণেও উৎসবের আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে। সরবে-নীরবে, আভাসে-ইঙ্গিতে, স্পষ্টতা-অস্পষ্টতায় সে উৎসব আত্মপ্রকাশ করছে নানা সুরে নানা ছন্দে। বউ-কথা-কও আবার ডেকে উঠল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডানার

আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু। সন্ন্যাসীর কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছিল, রাস্তার মাঝখানে ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে পাখীর ডাক শুনে আর ফুলের গাছ দেখে। আবার চলতে শুরু করল। অনেক দিন আগে কবি একটা কবিতা লিখে শুনিয়েছিলেন তাকে। তার লাইনগুলো মনে পড়ল :—

নকল কাজেতে মত্ত থাকিয়া আসল কাজটি হয় নি করা,
মিলন-সভায় যাইতে পারি নি, সে যে হবে ওগো স্বয়ম্বরা।
সে বারতা লেখা তারায় তারায় ফুলে ফুলে তাহা উঠেছে ফুটি।
অকাজের পাকে রয়েছি জড়ায়ে কিছুতেই যেন পাই না ছুটি।

কবিতার লাইনগুলো গুঞ্জন করতে লাগল মনের ভিতর। এর যে অর্থ সে আগে বোঝে নি, সেই অর্থটা ক্রমশ যেন প্রতিভাত হ'ল তার মনে। মনে হ'ল, আনন্দের একটা উৎসব অহরহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে চোখের সামনে, কিন্তু তাতে যোগ দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার।

সন্ন্যাসীর বাসার কাছাকাছি গিয়ে ডানা যখন পৌঁছল, তখন আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। দূর থেকে সে যা দেখতে পেলে তা অপ্রত্যাশিত। দেখলে, একটা শাবল নিয়ে সন্ন্যাসী একটা নারকেলের ছোবড়া ছাড়াবার চেষ্টা করছেন প্রখর রৌদ্রে ব'সে। ডানার মনে পড়ল কাকের ইঁদুর খাওয়ার দৃশ্যটা।

"কি করছেন আপনি ?"

সন্ন্যাসী একটু অপ্রতিভ হলেন।

"ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছি। তুমি এই রোদে বেরিয়েছ যে ?"

"এই আমগুলো দিতে এসেছি আপনাকে।"

"দেখ, কি অদ্ভুত যোগাযোগ !"

শাবল ও নারকেল সরিয়ে রেখে হাসিমুখে সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ।

"যোগাযোগ মানে ?"

ডানা আমগুলি রেখে জিজ্ঞেস করল।

আর একটু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, "যোগাযোগ বলছি এইজন্যে যে, ভগবানই আমার নিতান্ত দৈহিক ক্ষুধায় বিচলিত হয়ে প্রথমে নারকেল পাঠিয়ে দিলেন, তারপর যখন দেখলেন নারকেলটা আমি ছাড়াতে পারছি না তখন তোমাকে দিয়ে আম পাঠালেন—এ কথা ভাবতে পারছি না। যাঁকে নির্বিকার পরব্রহ্ম ব'লে ভাববার চেষ্টা করছি, তিনি এভাবে বিচলিত হচ্ছেন—এ কথা আমার পক্ষে ভাবা শক্ত। তাই যোগাযোগে বলছি।"

"নারকেলটা কে দিলে ?"

"কেউ দেয় নি। নদীর ধারে ব'সে ছিলাম, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আমার সামনে ঠেকল, ঠেকেই রইল অনেকক্ষণ, তাই তুলে নিয়ে এলাম। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব।"

"আপনি তো রোজ ভিক্ষা করতেন। ভিক্ষেয় কিছু পান নি বুঝি ?"

"ভিক্ষা আজকাল আর করি না। আজকাল উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেছি।"

"উঞ্ছবৃত্তিটা আবার কি ?"

"তুমি মহাভারত পড়েছ ?"

"না। কেন ?"

"মহাভারতে শান্তিপর্বে এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কাহিনী আছে। পদ্মনাভ সে কাহিনী ধর্মারণ্য নামক এক ব্রাহ্মণকে বলছেন।"

"কি বলুন না শুনি।"

"এখানে বড্ড রোদ, ঘরে চল।"

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল, সেখানেও খুব ছায়া নেই। ভাঙা চালের ভিতর দিয়ে সেখানেও রোদ ঢুকেছে।

ডানা বললে, "এই ঘরে কি ক'রে যে আপনি আছেন! আনন্দবাবু আজকাল অমরেশবাবুর ম্যানেজার হয়েছেন, তাঁকে বলব আপনার ঘরটা সারিয়ে দিতে।"

"না, থাক্। কদিনই বা আর আছি।"

ভাঙা ঘরটার আসল মালিক যে তিনিই, অমরেশবাবু নন—এ কথা তিনি ডানাকে বললেন না। অমরেশবাবু নিজেও সে কথা জানতেন না বোধ হয়।

"চ'লে যাবেন না কি এখান থেকে?"

"সবাইকেই যেতে হবে, তোমাকেও। এক জায়গায় বেশীদিন থাকবার জো আছে কি! স্রোতের মুখে ভাসছি যে সব।"

"স্রোতের মুখে থেকেও তো মনে হয়, নড়ছি না।"

ডানা হেসে জবাব দিলে।

"বাইরের জগৎটা কার চোখে যে কেমন ঠেকে, কার মনে যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয় তা বলা শক্ত। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, সেইজন্য কারও মাপের সঙ্গে কারও মেলে না।"

"ওসব আধ্যাত্মিক কথা থাক্ এখন। আপনি আমগুলো খান আগে।"

"এনেছ যখন খাবই তো। তুমি ওই কোণের দিকটায় ব'স, যদি বসতে চাও অবশ্য। দাঁড়াও, আমগুলো নিয়ে আসি বাইরে থেকে।"

সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন আবার। ঘরের কোণে ছেঁড়া মাদুর গোটানো ছিল একটা। সেইটে পেতেই ডানা বসল। সন্ন্যাসী আমগুলি নিয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, "তুমি ওই মাদুরটা পেতে বসলে! আচ্ছা থাক্, বসেছ যখন—"

"কেন, কি হয়েছে মাদুরে?"

"হবে আবার কি! নদীর চরে শ্মশানে প'ড়ে ছিল, কুড়িয়ে এনেছিলাম একদিন। ওতেই শুই রাত্তিরে। তোমার ওতে যদি বসতে আপত্তি থাকে আমার ওই আসনটায় ব'স। আমি আমগুলো কাটি ততক্ষণ।"

মাতুরের ইতিহাস শুনে ডানার উঠে পড়তেই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সেটা অশোভন হবে ভেবে উঠল না। মনে হ'ল, সন্ন্যাসী এতে শুতে পারেন আর আমি ব'সে থাকতে পারব না?

সন্ন্যাসী ঝুলি থেকে ছুরি বার ক'রে আমগুলি ধুয়ে কাটতে লাগলেন। ঝুলি থেকেই বার করলেন কয়েকটি শালপাতা। একটি আম কেটে শালপাতায় রেখে এগিয়ে দিলেন ডানার দিকে।

"তুমি খাও।"

"আমি এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।"

"তবু খাও। তুমি সামনে ব'সে থাকবে, আর আমি একা খাব—সেটা কি ভাল দেখায়?"

"তা হ'লে আমি উঠি। আপনি খান।"

"তুমি না খেলে আমি খাবই না। তা ছাড়া একটা আমই যথেষ্ট আমার পক্ষে। অতগুলো আম নিয়ে কি করব আমি? তুমি একটা খাও, আমি একটা খাই। বাকিগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"রেখে দিন, কাল খাবেন।"

"আমি সঞ্চয় করি না। কালকের আহার কাল জুটেই যাবে কোথাও থেকে।"

ডানার মনে একটু খটকা লাগল। সন্দেহ হ'ল, লোকটা তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য বাজে ভাঁওতা দিচ্ছে না তো! মুখে কিন্তু কিছু বললে না। শালপাতা থেকে আমের একটা চোকলা তুলে নিয়ে খেতে লাগল হাসিমুখে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সন্ন্যাসী নিজের এবং ডানার শালপাতাটা তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এলেন, ডানাকে কিছুতেই ফেলতে দিলেন না। ডানা হাত মুখ ধুয়ে নিজের

আঁচলেই হাত মুখ মুছতে মুছতে বললে, "আপনি এত একগুঁয়ে কেন বলুন তো ?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"কিছু বলছেন না যে ?"

"যা বলতে ইচ্ছে করছে তা বললে তুমি আমাকে হয়তো ভণ্ড মনে করবে। এ সব জিনিস বললেই খেলো শোনায়। চুপ ক'রে থাকাই ভাল।"

এবার ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো, একটু আগে ওঁকে ভণ্ডই মনে হচ্ছিল। তার মনের কথা টের পেয়ে গেলেন নাকি! শক্তিশালী সন্ন্যাসীরা অন্তর্যামী। এ কথা সে শুনেছিল যেন কার কাছে। সরলভাবে সত্য কথাই বললে সে, "আমরা সাধারণ লোক অনেক সময় আপনাদের বুঝতে পারি না, তাই ভণ্ড ব'লে মনে হয়। ভণ্ড সাধুরও অভাব তো নেই দেশে।"

সন্ন্যাসী খুশী হলেন।

বললেন, "সত্যি কথা বললে বলতে হয়—আমিও ভণ্ড। আমার বাইরেটা দেখে বা আমার কথাবার্তা শুনে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা লোকের হওয়া স্বাভাবিক, আমি ঠিক তা নই। অথচ মুশকিল, আমি আমার বাইরের প্রকাশটা ঠিক আমার স্বরূপের অন্তরের অনুরূপ করতেও পারি না। তাই চেষ্টা করি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে—"

এই স্বীকারোক্তির পর কি বলা উচিত, ডানার মাথায় এল না। কিন্তু আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, লোকটা ভণ্ড নয়।

"উঞ্ছবৃত্তির সম্বন্ধে আপনি কি একটা গল্প বলবেন বললেন। বলুন না শুনি।"

"এ সব আজগুবি গল্প কি ভাল লাগবে তোমার ? মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে গল্পটা। ধর্মারণ্য ব'লে একজন ব্রাহ্মণ, কোন্ ধর্ম

আচরণীয় তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁকে একজন পরামর্শ দিলেন—তুমি পদ্মনাভের কাছে যাও, তিনি তোমাকে নির্দেশ দেবেন। ধর্মারণ্য পদ্মনাভের বাড়ি গিয়ে শুনলেন, পদ্মনাভ সকালে উঠে সূর্যের রথচক্র বহন করতে গেছেন। রোজই যান। সূর্য অস্ত গেলে তিনি বাড়ি ফিরবেন। ধর্মারণ্য শুনে অবাক হয়ে গেলেন। নদীর ধারে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে এলেন তিনি। ধর্মারণ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সূর্যলোকে কি কি আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন আপনি? পদ্মনাভ নানা রকম আশ্চর্য জিনিসের বর্ণনা ক'রে শেষে বললেন—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম একটি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে। তিনি সূর্যের মতই জ্যোতিষ্মান। তিনি যেন দ্বিতীয় সূর্য। দেখলাম, তিনি এসে সূর্যের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেলেন। আমি সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠিক আপনার মত দীপ্তিশালী এই মহাপুরুষ কে? সূর্য বললেন—ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিধারী তপস্বী। এই গল্পটি শুনেই ধর্মারণ্য উঠে পড়লেন। পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছিলেন তা তো বললেন না? ধর্মারণ্য উত্তর দিলেন—আমি যা জানতে এসেছিলাম তা জেনেছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, তাই আমি চ'লে যাচ্ছি।"—এই ব'লে প্রণাম ক'রে তিনি চ'লে গেলেন।

গল্পটি ব'লে সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন। ডানাও চুপ ক'রে রইল। তার কানে এল অনেক দূরে বউ-কথা-কও পাখীটা আর একবার ডেকে উঠল। মনে হ'ল, পাখীটাই যেন তাকে বললে—চুপ ক'রে আছ কেন? কথা কও, যা জানতে চাইছ জেনে নাও। একটু ইতস্তত ক'রে ডানা বললে, "উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলে তা আমি জানি না। আমার মূর্খতায় আপনি হাসবেন হয়তো।"

"কুড়িয়ে খাওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি। ফল ফুল শস্য কন্দ কত রকম খাবার ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে চতুর্দিকে। কুড়িয়ে খেলে একজনের

অনায়াসে চ'লে যায়। বিষয়ী মানুষরাই কেবল খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে, পৃথিবীর বাকি সমস্ত প্রাণীই তো কুড়িয়ে খায়। পৃথিবীই অন্নপূর্ণা, তিনিই সকলের জন্য অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে রাখছেন অহরহ। আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?"

ডানা হেসে বললে, "পশুত্বের স্তরে নেমে আসাই তা হ'লে সাধুত্বের লক্ষণ বলুন!"

"পশুরা অসহায়। উঞ্ছবৃত্তি না ক'রে ওদের উপায় নেই। মানুষ কিন্তু স্বাধীন, সে ইচ্ছে করলে রাজরাজেশ্বর হতে পারে আবার উঞ্ছবৃত্তিধারীও হতে পারে। সাধুরা রাজরাজেশ্বর হতে চান না, কারণ রাজরাজেশ্বর হ'লে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। সাধুরা চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে চান—"

"সেই চিরানন্দলোক কোথায়? ঠিকানা পেলে যাবার চেষ্টা করতাম।"

"ঠিকানা কেউ ব'লে দিতে পারবে না। তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।"

"আমি কোথায় খুঁজব?"

"ঠিকানা তোমার মনেই মধ্যেই আছে। যদি খোঁজ, পাবেই নিশ্চয়।"

"কই, কোনদিন আভাস মাত্র তো পাই নি!"

"চেষ্টা করলেই পাবে। শুধু আভাস কেন, তোমার তেমন আগ্রহ যদি থাকে সাক্ষাৎদর্শন পর্যন্ত পাবে।"

"কার সাক্ষাৎদর্শন পাব?"

"সত্যের।"

"কিন্তু আপনি চিরানন্দলোকের কথা বলছিলেন যে!"

"সত্যই চিরানন্দময়। সত্যই আনন্দ, সত্যই শিব, সত্যই সুন্দর। যে মুহূর্তে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবে সেই মুহূর্তে এমন আনন্দ তোমার সত্তায় ওতপ্রোত হয়ে যাবে, যার শেষ নেই, যা অবর্ণনীয়।"

"কি রকম সে ব্যাপারটা—কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সেটা কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না। প্রভাতের সূর্যোদয় যে দেখে নি, তাকে বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো অসম্ভব। তোমার রাত্রি শেষ হ'লে নিজেই তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে তা বুঝতে পারবে একদিন। সে উপলব্ধি এ জন্মে হতে পারে, জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করতে হতে পারে তার জন্য। কারও বক্তৃতা শুনে তাড়াহুড়ো ক'রে তা হবে না। কাছে বা দূরে সে প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য। তোমাকে যেতে হবে সেখানে।"

"কিন্তু আপনি এখনই তো বললেন, তা আমার মনের মধ্যেই আছে। তবে আবার দূরে আছে বলছেন কেন?"

"মনের মধ্যেই আছে। কিন্তু তোমার মন কি ছোট? সে যে বৃহৎ—অতি বৃহৎ। তারও সীমা নেই, শেষ নেই, তাও দূর থেকে দূরান্তে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিস্তৃত। তা তোমার ওই দেহটুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। তার স্বরূপ-আবিষ্কারই তো আত্ম-আবিষ্কার। সে আবিষ্কার সকলকেই করতে হবে একদিন, আর সেই আবিষ্কারের পথেই সত্য-দর্শনও হবে। তখনই বুঝতে পারবে, চিরানন্দলোক কোথায়।"

...ডানা আনত দৃষ্টিতে শুনছিল। শুনতে শুনতে তার মনে হ'ল, সে যেন খর-স্রোতে ভেসে চলেছে। ছোট একটা নৌকার উপর ব'সে আছে সে। কোথাও কূলকিনারা নেই। মনে হচ্ছে, স্রোতের ধারা দূরদিগন্তে আকাশে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। দিগন্ত-রেখা স'রে স'রে যাচ্ছে কেবল। সে যে কঠিন মাটির উপর সন্ন্যাসীর সামনে ব'সে আছে, তা ভুলে গেল সহসা। কয়েক মুহূর্তের জন্য অসীম যাত্রাপথের যাত্রী হয়ে পড়ল সে যেন, স্থান কাল অবরুদ্ধ হয়ে গেল তার চেতনা থেকে। একটা সুনিশ্চিত অবলম্বনের আশায় আকুল হয়ে উঠল সে...ভয়-ভয় করতে লাগল...মনে হ'ল, নৌকাটা এই স্রোতের ধাক্কা কতক্ষণ সইতে পারবে—টুকরো টুকরো

হয়ে যাবে এখনই···আশ্রয় চাই, অবলম্বন চাই একটা। আশ্রয় মিলল। বাইরে একটা দোয়েল পাখী তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠে আশ্বাস দিলে। কি বললে, ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না; কিন্তু মনে হ'ল, যেন আশ্রয় মিলল।

ডানা চেয়ে দেখলে, সন্ন্যাসী চোখ বুজে ব'সে আছেন।



সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ডানা যখন চ'লে এল, তখনও বাইরে রোদের তেজ একটুও কমে নি। তখনও 'লু' বইছে। বাইরের এই রুদ্র রূপ কিন্তু ডানার মনকে একটুও স্পর্শ করল না। সে সন্ন্যাসীর কথাই ভাবছিল কেবল। ভাবছিল, উনি নিশ্চয়ই এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, যার তুলনায় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ওঁর কাছে। নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে কি পেতে চাইছেন উনি? ভগবানকে? উঞ্ছবৃত্তিধারী না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না? প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না, চুপ ক'রে থাকেন, মাঝে মাঝে একটু হাসেন। কখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, কখনও আবার সোৎসাহে এমন সব কথা বলেন যার মানে বোঝা যায় না। অথচ ওঁকে পাগলও ঠিক বলা চলে কি। এই সব ভাবতে ভাবতে ডানা পথ চলছিল।

"মাসীমা, মাসীমা, শুনুন—"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, চণ্ডী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কয়েক দিন আগে রূপচাঁদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ছেলেটি এসেছিল—ডানার মনে পড়ল।

"কি?" ডানা দাঁড়িয়ে পড়ল।

চণ্ডী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "চৌধুরীদের বাগানে একটা গাছে হলদে পাখীর বাসা দেখে এসেছে গণেশ।"

"ও, আচ্ছা। গণেশকে নিয়ে এস। একটা চাকরকে নিয়ে যাব আমি। বাসাটা দেখব।"

"আপনি নিজে যাবেন?"

"যাব।"

"কখন আসব?"

"তোমাদের যখন সুবিধে। এখনই যেতে পারি।"

"গণেশকে নিয়ে আসছি তা হ'লে।"—চণ্ডী একছুটে চ'লে গেল আবার।

সন্ন্যাসীর কথাটা ডানার মনের প্রত্যক্ষলোক থেকে স'রে গেল, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসে দেখলে, কবি ব'সে আছেন। ডানাকে দেখেই বললেন, "ছিলে কোথা? অমরেশবাবুর একখানা চিঠি এসেছে। আমি ভাবছিলাম, কাজে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখ। উনি সিমলায় গিয়ে পাখী দেখে বেড়াচ্ছেন। কাশ্মীর ঘোরবারও ইচ্ছে আছে অথচ চিঠিতে কোনও ঠিকানা নেই যে, চিঠি লিখি।"

ডানা চিঠিখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি এই দুপুর রোদে?"

"সন্ন্যাসীটিকে কয়েকটা আম দিতে গিয়েছিলাম।"

"ও। সেই সন্ন্যাসী এখনও আছেন নাকি?"

"আছেন।"

"চিঠিটা আর একবার পড় দেখি চেঁচিয়ে।"

ডানা পড়তে লাগল।—

প্রীতিভাজনেষু,

আনন্দবাবু, গতবার 'প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার'-এর (Paradise Flycatcher) যুগ্মমূর্তির একটা রঙিন ক্রিশমাস্ কার্ডে আপনি একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন আমাকে। নকল ক'রে রেখেছিলেন কি না জানি না। তাই প্রতিলিপি আপনাকে আবার পাঠালাম।

প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের দেশী নাম—দুধরাজ। কেউ কেউ শাহবুলবুল বলে। কিন্তু ওটা সম্ভবত ঠিক নয়। আপনার কবিতাটি এই—

১

সমাজ মানে আঁধার গলি
বাধার কাদা মানার পলি
পরদানসীন আনারকলি
ছদ্মবেশে তাই বুঝি।
চুলগুলো তাই বব্ করেছে
নাই বুঝি তাই বোখরাটা
পরদা-ভাঙা সুর ধরেছে—
জরদা-রঙের ওড়নাটা।

২

তেপান্তরি মাঠের শেষে
রূপান্তরি স্বপনদেশে
শঙ্খধবল পাখীর বেশে
রাজপুত্র ওই বুঝি
নূতন ধরন নূতন বরণ
নূতন রকম ছন্দ রে
সাদায় কালোয় মেলায় চরণ
কষ্টি এবং মর্মরে।

কবিতাটি টুকে রাখবেন। আমার খুব ভাল লেগেছে। মেয়ে-পাখীটির মধ্যে আপনি যে আনারকলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এতে আপনার কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এখন সিমলায় আছি। কাশ্মীরের নানা জায়গায়

বেড়াবার ইচ্ছে আছে। আপনাকে কাশ্মীরের পাখী বিষয়ে একটি বই পাঠালাম। ছবি দেখে যদি কবিতার প্রেরণা পান খুশী হব। যদি কবিতা লেখেন আমাকে পাঠাবেন।

এখানে অনেক নূতন পাখী দেখলাম।

আমাদের শালিকের মত অনেকটা দেখতে একরকম পাখী আছে, গায়ে সাদা সাদা দাগ, নাম Striated Laughing Thrush (স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ্)—এদের দেশী নাম কি জানি না। তবে থ্রাশ্ পাখীর কাস্তরা, পাণ্ডু, শামা এসব নাম শুনেছি, পড়েওছি। এদের হুইশলিং ডাকটা খুব অদ্ভুত—'ও সি হোয়াইটি—ও হোয়াইট্' । এ অঞ্চলে এ পাখী অনেক। হিমালয়ের বসন্ত-বউরি পাখীও দেখলাম। বেশ বড় পাখী। প্রায় পায়রার মত। সালিম আলির 'ইণ্ডিয়ান হিল বার্ড স্' বইটাতে ছবি আছে দেখবেন। পাখীটার সর্বাঙ্গে চমৎকার রঙ—নানা রকম রঙ। তা ছাড়া গ্রেহেডেড ফ্লাইক্যাচার, ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারও (Verditer Flycatcher) অনেক দেখলাম এখানে। এই শেষোক্ত পাখীটি চমৎকার দেখতে। নীল রঙের ওপর সবুজের আভা। আপনি দেখলে নীল-পরী বা ওই ধরনের কিছু একটা নামকরণ ক'রে ফেলতেন। আসামের দিকে ফেয়ারি ব্লু বার্ড (Fairy Blue Bird) নামে নাকি এক রকম পাখী আছে, দেখি নি এখনও। এখানে হিমালয়ান হুইশলিং থ্রাশের একটানা শিস ঝরনার কলধ্বনি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বেশ। কোকিলের কুহু কুহু ডাকেই অভ্যস্ত আমরা। এখানে কুলু উপত্যকায় কুকুর 'কুক্-উ' ডাক শুনলাম। কিন্তু সালিম আলির বইয়ে এ কথা লেখা নেই। আর একটি নতুন পাখী দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। ব্রাউন ডিপার। ব্যাস নদীর স্রোতে খেলতে দেখলাম পাখীটিকে। এর কথা প'ড়ে দেখবেন। অদ্ভুত লাগবে। এরা খুব উঁচুতে তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে থাকে। আর খেলা করে স্বচ্ছ বরফ-গলা নদী-স্রোতে। কথাটা যত সহজ শোনাল, আসলে ততটা

সহজ নয়। পাহাড়ের বরফ-গলা নদী তোড়ে নেবে আসে—ফেনায় আবর্তে কলকলধ্বনিতে চতুর্দিক মাতিয়ে। এই দুর্দম দুরন্ত নদীর জলে ওই ছোট্ট বাদামী রঙের পাখীটি (আমাদের দোয়েলের চেয়ে বড় নয়) ঝাঁপাই ঝুঁড়তে ভালবাসে। জলের তলায় ডুব-সাঁতার কেটে খাদ্য অন্বেষণ করে। ব্যাপারটা কল্পনা করুন। একে যদি জল-পরী বলেন ঠিক মানাবে না। জলদস্যু বললে খানিকটা ঠিক হবে হয়তো। দু রকম ডিপার আছে, এক রকম পুরোপুরি বাদামী, আর এক রকমের বুকটা সাদা (এর ছবি সালেম আলিতে পাবেন)। ব্লু ম্যাগপাইও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। আপনারা ওখানে যে ল্যাজঝোলা পাখী দেখেন (যার ইংরেজী নাম ট্রি পাই, বাংলায় কেউ কেউ হাঁড়িচাঁচাও বলে) তারই জ্ঞাতি এই ব্লু ম্যাগপাই। বেশ বড় পাখী। প্রায় বাইশ-তেইশ ইঞ্চি লম্বা হবে। ল্যাজটা খুবই লম্বা। নীল (প্রায় কালো) রঙের সঙ্গে সাদা ও ধূসরের অপূর্ব সমন্বয়। ঠোঁটটি লাল। হলদে ঠোঁটওলা আর একটা জাতও আছে, কিন্তু এখানে লাল-ঠোঁটই বেশী। কালিজ ফেজান্ট (Kaleej Pheasant), মোনাল ফেজান্টও (Monal Pheasant) দেখেছি। চমৎকার বর্ণসজ্জা। একটা 'স্কিন' জোগাড় করেছি। এখানে বার্কিং ডিয়ারও (Barking Deer) পাওয়া যায়। শিকার করতে দেখেছি।

আরও নানা রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সব চিঠিতে লেখা যাবে না। আপনারা আশা করি ভাল আছেন। আমি দিন সাতেক পরে এখান থেকে চ'লে যাব আরও উঁচুতে। সম্ভব হ'লে নূতন ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখব। শ্রীমতী ডানা আশা করি ভাল আছেন। আমার পাখীগুলি কেমন আছে ?

আমরা ভাল আছি। আপনারা আমাদের ভালবাসা নিন। রত্না ডানাকে একটা চিঠি দেবে বলেছিল, কিন্তু আর ডাকের সময় নেই। ইতি

আপনাদের অমরেশ

চিঠি পড়া শেষ হতেই কবি বললেন, "কাণ্ড দেখ। এ এক আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। এই খুনের মোকদ্দমা এখন কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। এখুনি আমার কাজে ইস্তফা দিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

ডানা একটু মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু আমি যা শুনলাম তাতে কাজে ইস্তফা দিলেও আপনি মোকদ্দমার হাত থেকে উদ্ধার পাবেন না।"

"কেন ?"

"যে মেয়েটি খুন হয়েছে, তার ঘর খানাতল্লাসি ক'রে পুলিস আপনার লেখা এক টুকরো চিঠি নাকি বার করেছে। বাকী খাজনার নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে আপনি কিছু লিখেছিলেন নাকি ?"

"লিখেছিলাম হয়তো। শুধু তার নয়, অনেকেরই নোটিশের পিছনে লিখেছি। দেখলাম, অনেক খাজনা বাকি প'ড়ে রয়েছে, যদি কিছু মাপ ক'রে দিলে আদায় হয় তাই সে কথা লিখে দিয়েছিলাম অনেক নোটিশের পেছনে। কেন, তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে ?"

"অন্যায় কিছু হয় নি। তবে পুলিস নাকি ওই সূত্র ধ'রেই আপনাকে জড়িয়েছে এতে ?"

"কে বললে ?"

"রূপচাঁদবাবু।"

"রূপচাঁদ কবে এসেছিল তোমার কাছে ?"

"আপনি যেদিন সদর এস. ডি. ও.র কাছে যান, সেই দিনই। ও নিয়ে মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? আপনার কোনও ভয় নেই। আমাদের এস্টেটের ভাল উকিল আছেন, তিনি যা করবার করবেন। আমি ফিরে এসেই অমরবাবুর স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছি। কিন্তু তিনি সে চিঠি পাবেন না বোধ হয়।"

"কি লিখেছ ?"

"এখানকার সব ঘটনা। আপনি অমরবাবুকে কিছু লেখেন নি ? ওঁদের সব জানানোই তো ভাল।"

"আমি ভাবছিলাম, কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু মন স্থির করতে পারি নি, তাই দেরি হচ্ছে। তোমার মতে তা হ'লে কাজ ছাড়া ঠিক নয় ?"

ডানা হেসে বললে, "সেটা আপনি ঠিক করুন। আমি কি বলব।"

"না, তুমিই ঠিক কর। তুমি যা বলবে তাই করব। আমার নিজের ওপর আর আস্থা নেই।"

কবির কণ্ঠে যে অসহায় সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল তা শিশুর কণ্ঠেই মানায়।

ডানা হাসিমুখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বললে, "তাড়াতাড়ি এখন কাজ ছাড়বার দরকার কি। যেমন চলছে চলুক না। এ মোকদ্দমার কিছু হবে না।"

"বেশ।"

গণশাকে সঙ্গে ক'রে চণ্ডী এসে হাজির হ'ল। গণশা চণ্ডীরই সমবয়সী, কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। মাথার চুল দশ-আনা ছ-আনা, পরিধানে হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট, হাতে একটি গুলতি। ডানার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, "আপনি ডেকেছেন আমাকে ?"

ডানা একবার চণ্ডীর দিকে একবার গণশার দিকে চেয়ে দেখলে।

"তুমি হলদে পাখীর বাসা কোথায় দেখেছ ?"

"অমরবাবুর বাগানে।"

"আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে ?"

"পারব। অনেক উঁচুতে আছে। গাছে না উঠলে দেখা যাবে না কিন্তু।

"আমার দূরবীন আছে, আমি নীচে থেকেই দেখতে পাব।"

"বেশ, চলুন তা হ'লে।"

ডানা কবির দিকে ফিরে বললে, "আপনি বসুন। আমি হলদে পাখীর বাসাটা দেখে আসি চট ক'রে।"

কবি বললেন, "এরা কে?"

"চণ্ডী আর গণেশ। এদের হলদে পাখীর বাসার সন্ধান করতে বলেছিলাম। আপনি বসুন, আমার বেশী দেরি হবে না।"

"চল না, আমিও যাই।"

"না, এই রোদে আপনার কষ্ট হবে। আপনি বরং বসুন এখানে। এই বইগুলো ওলটান কিংবা লিখুন কিছু।"

"বেশ। বেশী দেরি ক'রো না কিন্তু।"

"না, দেরি হবে না।"

চণ্ডী ও গণশাকে নিয়ে ডানা বেরিয়ে পড়ল।

অমরবাবুর বাগানে ডানা ইতিপূর্বে আসে নি কখনও। দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল, এ একটা আলাদা জগৎ যার পরিচয় সে জানত না। নানা রকম পাখী ডাকছে—কোকিল, বসন্ত-বউরি, চোখ-গেল, দোয়েল, ফিঙে, নীলকণ্ঠ। ভগীরথের অবিশ্রান্ত টুক্-টুক্-টুক্ও ধ্বনিত হচ্ছে কোথায় যেন। প্রজাপতি উড়ছে নানা রঙের। পতঙ্গের বিচিত্র ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দূরে একটা তালগাছের ওপর শকুনি ব'সে আছে একটা। আর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে আমগাছেরা—কেউ ফলভারনত, কেউ মুকুল-ভূষিত, কেউ রিক্ত, কারও বা শাখায় কিশলয়ের শোভা। তারা নীরব ভাষায় যা বলছে তা অবর্ণনীয়। ডানা বাগানের মাঝখানে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার মনে হ'ল সন্ন্যাসীর কথা। মনে পড়ল, তিনি একদিন বলেছিলেন—পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে যিনি আছেন, তিনিই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানলে মানুষের কোন ভয় থাকে না, তাই তিনি অভয়।

এমন ভাবে বলেছিলেন যেন তিনি চেনেন তাঁকে। অথচ স্বীকার করেন না সে কথা। বলেন—পাই নি এখনও, খুঁজছি। ডানা ভাবতে চেষ্টা করল, ওই মুকুল-ভরা আমগাছ, ওই দোয়েলের গিটকিরি, ওই পতঙ্গের কর্কশ চীৎকার আর ওই শকুনির বীভৎস চেহারা—এ সবই ব্রহ্মের প্রকাশ? এদের মধ্যে মিল কোথায়? কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে একদিন।

চণ্ডী আর গণেশ এসেই চ'লে গিয়েছিল খুব বড় একটা আমগাছের তলায়। গণেশ গাছটায় উঠেছিল। ডানা দেখতে পেলে, গণেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ডানা এগিয়ে গেল। গণেশ গাছের ওপর থেকেই ফিসফিস ক'রে বললে, "আমি যেদিকে আঙুল দেখাব, সেইদিকে দূরবীন দিয়ে দেখুন। ওই যে ডালটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই ডগায় দেখুন বাটির মত ঝুলছে, তার ওপর হলদে পাখীটা ব'সেও আছে। ওই দেখুন, উড়ে গেল।"

ডানা দূরবীন দিয়ে বাসাটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু পাখীটাকে দেখতে পায় নি।

বললে, "দেখেছি। নেবে এস। রোজ এসে খবর নিতে হবে। ওটা হলদে পাখীরই বাসা।"

গণেশ তরতর ক'রে নেবে পড়ল।

"রোজ খবর নেওয়া তো মুশকিল। ইস্কুল পালিয়ে আসা যাবে না। মাসী জানতে পারলে খাওয়াই বন্ধ ক'রে দেবে।"

"ও। মাসীমা বুঝি খুব কড়া গার্জেন?"

"আর বলবেন না। সমস্ত সকালটি তাঁর সামনে ব'সে পড়া করতে হয়। দুপুরে ইস্কুল, সেখানে আছেন রামবাবু। আসলে তিনি রাবণবাবু। একটি ভুল হ'লে আর রক্ষে নেই। বিকেলে ফিরে জলখাবার খেয়ে মাসীমার সামনে ব'সে দুখানি বাংলা, দুখানি ইংরিজী হাতের লেখা লিখে তবে ছুটি। তখন অন্ধকার হয়ে যায়,

তখন এই বাগানে এসে কি পাখীর খবর নেওয়া যায়? রবিবারে কিংবা ছুটির দিনে নিতে পারি।"

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মা-বাবা কোথা?"

"তাঁরা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। মাসীই আমাকে মানুষ করেছেন।"

"তোমার মেসোমশাই কি করেন?"

"তিনিও মারা গেছেন। অমরবাবুর এস্টেটে চাকরি করতেন আগে।"

"এখন তোমাদের চলে কি ক'রে তা হ'লে?"

"অমরবাবুর এস্টেট থেকেই মাসী মাসোহারা পান। কিছু জমিও দিয়েছেন অমরবাবু।"

"তোমার মাসীমার ছেলেপিলে কটি?"

"মাসীর কোনও ছেলে হয় নি।"

চলতে চলতে কথাবার্তা হচ্ছিল। চণ্ডী চুপ ক'রে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সে বললে, "গণশা প্রতিবার ফার্স্ট হয়।"

গণেশ ধমক দিয়ে উঠল, "চুপ কর্‌, ফাজিল কোথাকার।"

চণ্ডী যেন চুপসে গেল।

এই ছুটি কিশোরের সঙ্গ খুব ভাল লাগছিল ডানার। একটা গোপন মাধুর্য ধীরে ধীরে তার মনকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলছিল। তার এও মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর চারিদিকে—দূরে নিকটে এই যে এত মাধুর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে তার যেন ঘনিষ্ঠ কোন যোগ নেই। সকলের কাছেই সে যেন পর। কারোরই আপন লোক নয় সে। সবাই তাকে খাতির করে, অনেকেই তার সঙ্গে আত্মীয়ের মত কথাও কয়, খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেতেও চায় ছু-একজন (যেমন আনন্দবাবু, রূপচাঁদ); কিন্তু দূরত্বটা যেন ঘুচতে চায় না। মনে হয়, সে যেন এদের মাঝখানে আগন্তুক একজন। এসেছে, আবার

চ'লে যাবে। সন্ন্যাসীর কথা মনে হ'ল হঠাৎ। মনে হ'ল, আজই আবার দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।

চণ্ডী বললে, "আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব রোজ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি গাছে উঠতে পারি না ভাল।"

"তোমাদের কাউকে আসতে হবে না। আমিই আসব এখন বিকেলের দিকে।"

"আমিও থাকব আপনার সঙ্গে। আমাকে দূরবীন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তো?"

"দেব।"

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর চণ্ডী সসঙ্কোচে বললে, "রূপচাঁদবাবুর বাড়ি যাবেন? কাছেই খুব।"

"রূপচাঁদবাবু আপিস থেকে ফিরেছেন এখন। বকুলদি ব্যস্ত আছেন। পরে যাব কোনদিন দুপুরে।"

"কবে যাবেন?"

চণ্ডীর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল। ডানা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সে আবার বললে, "দুপুরে যাওয়াই ভাল। আপনি যেদিন বলবেন এসে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল যাবেন?"

"ঠিক বলতে পারছি না।"

"কাল সকালে এসে তা হ'লে জেনে যাব। কেমন?"

"আচ্ছা।"

চণ্ডীর কেমন যেন মনে হচ্ছিল, ডানার সঙ্গে বকুলবালার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারলে তার এয়ার্-গান্ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে।

গণেশ হঠাৎ বললে, "ফিঙে পাখীর বাসাও দেখেছি আমি একটা। অনেকটা হলদে পাখীর বাসার মত দেখতে। একবার দেখেছিলাম, একই গাছে প্রায় পাশাপাশি ফিঙে পাখী আর হলদে পাখীর বাসা ছিল—"

গণেশের কথাবার্তায় ডানা বুঝতে পেরেছিল যে, ছেলেটি সত্যিই বুদ্ধিমান। তার মনে হ'ল, অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তিনি হয়তো ছেলেটিকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে সাহায্য করবেন।

"পাখীর বাসা দেখবার খুব ঝোঁক বুঝি তোমার ?"

গণেশ বললে, "ঝোঁক আগে ছিল না। কিন্তু অমরেশবাব বলেছেন যে, পাখী সম্বন্ধে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখবে তাকে তিনি এক শো টাকার প্রাইজ দেবে প্রাইজটা আমাকে নিতে হবে। অমরেশবাবু বলেছেন—বই দেখে লিখলে চলবে না, নিজের চোখে পাখীদের লক্ষ্য ক'রে লিখতে হবে। তাই সময় পেলেই পাখী দেখে বেড়াই।"

"তুমি লক্ষ্য করেছ কিছু ?"

"কিছু কিছু করেছি।"

"খাতায় লিখে রেখেছ ?"

"রেখেছি।"

"দেখিও তো আমাকে একদিন।"

"আচ্ছা। আমি এবার যাই। আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। ওই যে আমার বাড়ি।"

গণেশ আঙুল দিয়ে ছোট একটি মাটির বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

"ও, আচ্ছা। তোমার মাসীমার সঙ্গে এসে আলাপ করব একদিন।

"আসবেন।"

গণেশ চ'লে গেল।

গণেশ সব দিক দিয়েই চণ্ডীর চেয়ে ভাল ছেলে। উঁচু ক্লাসে পড়ে, ফার্স্ট হয়, পাখীর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে—এ সবই সত্য; কিন্তু এ সত্য ডানার কাছে এমন ভাবে প্রকটিত হওয়াতে চণ্ডী একটু মন-মরা হয়ে পড়ল। সে স্কুল-পালানো খারাপ ছেলে।

এক বকুলবালা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার আশা হয়েছিল, ডানাও হয়তো দেবে। কিন্তু গণেশের মত একটা জ্যোতিষ্ক এসে পড়াতে সে একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "গণশা মাথায় মাথায় আমার মত দেখতে। কিন্তু ওর বয়স হয়েছে বেশ। ষোল পেরিয়ে গেছে— ওর মাসী বলছিল।"

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, কোনও উত্তর দিলে না। চণ্ডী আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে ডানার দিকে, আর কিছু বলা সমীচীন মনে হ'ল না তার। নীরবেই বাকি পথটুকু হেঁটে ডানার বাসার কাছাকাছি যখন এল, তখন বললে, "মাসীমা, আমি তা হ'লে এবার যাই। কাল আসব সকালে।"

"এসো। কিছু খাবে নাকি?"

"না, আমার খিদে পায় নি।"

"তবু দুখানা বিস্কুট নিয়ে যাও।"

ডানা ঘরে ঢুকে চারখানা বিস্কুট এনে দিলে তাকে। মহানন্দে চ'লে গেল চণ্ডী। ডানা ঘরে ঢুকে দেখলে, কবি টেবিলের উপর কবিতা লিখে গেছেন একটা।

"অমরবাবুর নির্দেশ অনুসারে একটি পাখীর ছবি দেখে কবিতা লেখবার চেষ্টা করলাম। এই দাঁড়াল—

১

খাঁচার টিয়ার সাথে বুনোটার মিল নেই
এটা পড়ে, ওটা পড়ে না,
আসল পাখীর সাথে ছবিটার মিল নেই
এটা নড়ে, ওটা নড়ে না।
কার সাথে কার কত মিল বা অমিল আছে
খুঁজি খালি দিবা-রাত্তি রে

হিসাবের গোলমালে বেসামাল হয়ে পাছে
ছুঁচো ব'লে ফেলি হাতীরে
এই ভয়ে ক্রমাগত কষিতেছি অঙ্ক
ওদিকে কমল ফোটে ভেদ করি পঙ্ক।

জীবনের পথে যেতে দেখা হ'ল যার সাথে
সে যেন রাগিণী ললিতা
কিংবা পাহাড়ি-পথে ঝরনার ধারা যেন
উচ্ছলা কল-কলিতা।
তারে ল'য়ে কি করিব ভাবিতে ভাবিতে মোর
বেলা ব'য়ে গেল হায় রে
কি লেবেল গায়ে তার জানি না মানাবে ঠিক
বিবেক যে ধমকায় রে
"ঠিক ক'রে যুক্তির তুলোটাকে ধোন্ না
ওটা তোর মাসী, পিসী, প্রেয়সী না কন্যা।"

৩

কবি কয়—ছত্তোর
দেব নাকো উত্তর।"

কবিতাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ভানা। আবার পড়ল কবিতাটা। তার অজ্ঞাতসারেই সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে, অন্তর্লীন একটা গর্ব যেন অভিব্যক্ত হতে চাইল সে হাসির রেখায়। হঠাৎ কিন্তু ভয় হ'ল তার, মনে হ'ল সে যেন অতলস্পর্শ একটা গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বেসামাল হ'লেই প'ড়ে যাবে। আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। মনে

হ'ল, ঘরের ভিতরেই বুঝি বিপদটা লুকিয়ে আছে। ঘর থেকে বেরিয়েই মুখে লাগল রোদের তাত, চোখে পড়ল কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় উদ্দাম বর্ণসমারোহ, কানে এল দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্ষণকালের জন্য। মনে হ'ল, সমস্ত প্রকৃতি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে; যেন বলছে—পালাচ্ছ কোথায়, পালাচ্ছ কেন, চারিদিকেই যে ফাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ফুলে, দোয়েলের গানে, স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে যে নাটক জ'মে উঠছে তাতে যোগ না দিয়ে পালাবার প্রবৃত্তি কেন তোমার। এই স্পষ্ট অথচ অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। মনে হতে লাগল, তার বুকের ভিতর কাঁটার মত কি যেন একটা বিঁধে আছে, যা আনন্দজনক অথচ কষ্টকর। আবার চলতে শুরু করল। সন্ন্যাসী কি আছেন এখন বাসায়? না থাকলেও খুঁজে বার করবে সে। একমাত্র ওই লোকটির কাছে গেলেই শান্তি পাওয়া যায়, মনে হয় অনেকক্ষণ রোদে হেঁটে যেন গাছের ছায়া পাওয়া গেল। বেশ দ্রুতপদে চলতে লাগল সে। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল, কি বলবে তাঁকে গিয়ে। এই তো কিছুক্ষণ আগে আম দেওয়ার ছুতোয় গিয়েছিল তাঁর কাছে, এখন কোন্ ছুতোয় যাচ্ছে? যাওয়ার একটা সঙ্গত কারণ দিতে হবে তো। কি বলবে গিয়ে? নারীর সান্নিধ্য যিনি পছন্দ করেন না, তাঁর কাছে এমনভাবে যাওয়ার অর্থই বা কি। নিজের উপরই রাগ হ'ল, মনে মনে নিজেকেই সে বলতে লাগল—নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান ক'রে নাও না, পরের কাছে সাহায্য চাইতে যাচ্ছ কেন? উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ওঁকে বিব্রত করার মানে হয় না। তবু কিন্তু সে থামল না, চলতে লাগল। সন্ন্যাসীর বাসার কাছে এসেই চোখে পড়ল, উনি সেই শাবলটা একটা পাথরে ঘ'ষে ঘ'ষে শান দিচ্ছেন। ডানার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন, তারপর একটু মুচকি হেসে শাবলটা সরিয়ে রেখে দিলেন।

"আবার কি মনে ক'রে ?"

ডানার মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধরনের উত্তর বেরিয়ে পড়ল একটা।

"একটা কথা জানতে এলাম। প্রকৃতি বলতে কি বোঝায় ? ইংরেজীতে যাকে নেচার বলে, তাই কি প্রকৃতি ?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর আবার হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

বললেন, "হঠাৎ এ আগ্রহ হ'ল কেন ?"

"আগ্রহ ঠিক নয়, কৌতূহল হয়েছে। নানা রকম পাখী গান করছে, সঙ্গিনীকে ডাকছে, ফুল ফুটছে, ভ্রমর আসছে, আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যেও অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ। একা একা ব'সে প্রকৃতির কত লীলা দেখি রোজ। নিজের মধ্যেও প্রকৃতির নিগূঢ় ষড়যন্ত্র টের পাই। তাই মনে হ'ল, প্রকৃতির রহস্যটা কি জেনে আসি একটু আপনার কাছে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি যা বর্ণনা করলে তা প্রকৃতির প্রকাশ। প্রকৃতি অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব এই সাম্যভাব বিচলিত হ'লেই সক্রিয় হয়, তখনই সৃষ্টি-লীল আমাদের ইন্দ্রিয়লোকে ফুটে ওঠে। অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ও আমাদের নেই।"

"তা হ'লে তার অস্তিত্ব আছে তা বোঝেন কি ক'রে ?"

"অনুমান ক'রে, ধ্যান ক'রে।"

ডানা চুপ ক'রে রইল। সন্ন্যাসী একটু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ বেরুলেন না। ডানা ব'সেই রইল চুপ ক'রে। সন্ন্যাসীর কাছে এসে সে যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সাংখ্যের প্রকৃতির স্বরূপ জানতে সে সন্ন্যাসীর কাছে আসে নি সে এসেছিল তার মনের মধ্যে যে অস্বস্তি জাগছে, বৈশাখের উন্মত্ত প্রকৃতি যে অস্বস্তিকে নানাভাবে বাড়িয়ে তুলছে, সেই অস্বস্তির

প্রতিকার-কামনায়। সে ভেবেছিল, সন্ন্যাসী তার মনের কথা বুঝবেন, কিন্তু তিনি একেবারে দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করলেন। আনন্দবাবু কবিতার ইঙ্গিতে ক্রমাগত যা বলতে চাইছেন তা ভাল লাগছে, কিন্তু তার তাৎপর্য কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না। আনন্দবাবু নিজেও সেটা বলতে চাইছেন না। একটু আগে যে কবিতাটা লিখেছেন তাতে স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—"কবি বলে ছুত্তোর, দেব নাকো উত্তর।" ওঁর মনের ভিতরেও সে কথাটা স্পষ্ট নেই কি? কে জানে।

সন্ন্যাসী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হঠাৎ। হেসে বললেন, "দেখ, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অশান্তি আছে। ওতে ভয় পেয়ো না। ওটা জীবনের লক্ষণ। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকলেই হ'ল, বাকি সব তুচ্ছ। কিসের অভাবে তোমার জীবন অশান্তিময় হয়েছে, তা জানলে চেষ্টা করতাম সে অভাব পূরণ করবার। বেশ তো আছ, কিসের অভাব তোমার?"

ডানা হেসে বললে, "আপনার কাছে বলতে লজ্জা করছে।"

"কিসের লজ্জা?"

"আমার অভাব টাকার। যদি অনেক টাকা পেতাম তা হ'লে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশী থাকতে পারতাম। টাকা নেই, তাই চাকরির গ্লানি বহন করতে হচ্ছে—আপনার মত লোকের কাছে এই তুচ্ছ কথাটা বলা লজ্জাকর বইকি।"

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর হেসে বললেন, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভাবনাই সিদ্ধির রূপ ধ'রে আসে। হয়তো তোমার কামনা নিষ্ফল হবে না। আমি এখন একটু বেরুচ্ছি। তুমি বসবে নাকি?"

"না, চলুন, আমিও যাই। কোন্ দিকে যাবেন আপনি?"

"চরের দিকে। স্নান করব।"

"আপনার সেই পাখীর দল আছে এখনও ?"

"আছে। তবে অনেক পাখী চ'লে গেছে।"

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। অমরবাবুর পাখীগুলোর খবর নিতে হবে।"

"অমরবাবুর পাখী পোষার শখ আছে নাকি ?"

"আছে। উনি পাখী পুষেছেন পক্ষীবিজ্ঞান চর্চা করবার জন্যে।"

"ও।"

সন্ন্যাসী চরের দিকে চ'লে গেলেন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দিকে চেয়ে, তারপর চ'লে গেল নিজের বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরে দেখলে, আনন্দবাবু ব'সে আছেন।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি ?"

"একটু বেরিয়েছিলাম।"

সত্য কথাটা ডানা চেপে গেল। আনন্দবাবুও আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন না, যে সংবাদটি এনেছিলেন তারই উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে ছিলেন তিনি।

"জান, নিখিল এসেছিল একটু আগে ?"

"নিখিল কে ?"

"ম্যাজিস্ট্রেট এখানকার। সত্যিই সে আমার ছাত্র। চমৎকার ছেলে—"

"মোকদ্দমার কথা কি বললেন ?"

বললে, "ও মোকদ্দমা ডিসমিস হয়ে যাবে। কেসটা যে সাজানো তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ও। কিন্তু আমি আর এক মুশকিলে পড়েছি যে।"

"আবার কি ?"

"অমরবাবু আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।"

"তিনি কাশ্মীর যাবেন লিখেছিলেন যে ?"

"কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আপনি এখন যাবেন কি ক'রে? আপনি জামিনে খালাস আছেন, মোকদ্দমার দিন আপনাকে তো হাজির থাকতে হবে।"

"দেখি, নিখিলের সঙ্গে দেখা করি। নিখিল চ'লে যাবার ঠিক পরেই টেলিগ্রামটা এল। নিখিলের সঙ্গে দেখা করি, কি বল?"

"তাই করুন। তা হ'লে তো এখনই বেরুতে হয় আপনাকে। আর এক ঘণ্টা পরেই ট্রেন।"

"তাই নাকি? আমি উঠি তা হ'লে।"

আনন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে চ'লে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলেন আবার।

"আমি তোমাকে আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম, বলতে ভুলে গেলাম। আমি কবিতায় আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে ফেলি—না লিখে পারি না, তাতে তুমি রাগ ক'রো না বা ভয় পেয়ো না। আমার কবি-সত্তা কল্পনালোকে তোমাকে নিয়ে যে উৎসব করে, আমার সামাজিক সত্তার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। এ কথা আগেও তোমাকে বলেছি বোধ হয়। আবার বলছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমার কবিতা তোমার মনে ঠিক—মানে—"

ইতস্তত ক'রে কবি থেমে গেলেন।

ভানা স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়িয়ে ছিল। কবি থামতেই চোখ তুলে বললে, "আপনার কবিতা খুব ভাল লাগে আমার। আর সেই জন্যেই বোধ হয় ভয় করে।"

"জ্যোৎস্না, সন্ধ্যার মেঘ, ফুল, পাখী—এদের দেখেও ভয় করে নাকি?"

"তার মানে?"

"কথাটা ভাব। পরে আলোচনা হবে। চললুম।"

কবি চ'লে গেলেন।

ভানা স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। পাখীগুলোর

তদারক করতে এখনি তাকে বেরুতে হবে। জ্বলন্ত স্টোভের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। আনন্দবাবু যা ব'লে গেলেন তার অর্থ কি। জ্যোৎস্না, ফুল, পাখী—এরাও তো এক-একটা সৃষ্টি, কবিতাও সৃষ্টি, আনন্দবাবুর কবিতা প'ড়ে কিন্তু ভয় হয়। যেমন ব্যাঘ্র নামক পশুটি সৃষ্টি হিসেবে চমৎকার হ'লেও তাকে দেখলে ভয় হয়। আনন্দবাবুর কবিতার সঙ্গে বাঘের উপমা দিয়ে নিজেই মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু এ কথাও সে অস্বীকার করতে পারলে না যে, আনন্দবাবুর কবিতার মধ্যে এমন একটা কি যেন আছে যা ভীতিজনক, অস্বস্তিকর। ভাবতে ভাবতে নূতন কথা মনে হ'ল একটা। মনে হ'ল, তার এই চিন্তার মধ্যে অহঙ্কার কি প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই। সে নিজেকে এমন মোহিনী রূপসী ব'লে কেন ভাবছে? আনন্দবাবুর মত বিজ্ঞ লোক তাকে দেখে বেসামাল হয়ে পড়বেন—এই কুৎসিত চিন্তা তার মনে আসছেই বা কেন? আনন্দবাবু কবিতায় যা-ই লিখুন, তাঁর ব্যবহারে কোন অশোভনতা তো সে লক্ষ্য করে নি। কবিতায় কবিরা একটু বাড়াবাড়ি ক'রেই থাকেন। সে বাড়াবাড়িকে সত্য মনে করা হাস্যকর নয় কি? সে কি কর্পূরলতা, না, মন্দারমালা। উচ্ছলা কলকলিতা পাহাড়ী ঝরনার সঙ্গেই বা তার মিল কোথায়। এই অসম্ভব উদ্ভট ধারণা কেন তার মনে আসছে। কেন সে ওই কবিতাগুলোকে নিজের সঙ্গে জড়াচ্ছে। কেন? হঠাৎ রূপচাঁদবাবুর কথা মনে পড়ল। ওই লোকটির আচরণে কিন্তু প্রচ্ছন্ন কিছু নেই। ধূর্ত শিকারী। একটা কথা মনে হওয়াতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। রূপচাঁদবাবুর অভদ্রতাকে সে যদিও প্রশ্রয় দেয় নি, কিন্তু তার বর্বরতাটা মনের নিভৃতে উপভোগ করেছে সে। আশ্চর্য।

চায়ের জলটা ফুটে উঠল।

৯

ট্রেন খুব ভোরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। তখনও সূর্য ওঠে নি। কবি প্রত্যাশা করেন নি যে, এত ভোরে অমরবাবু স্টেশনে আসবেন তাঁকে নিতে। তিনি গ্র্যাণ্ড হোটেলের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেই ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে ধরতে হবে—এই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন কবি। ধরতে যদি না পারেন, তা হ'লে কি অকূল পাথারে যে পড়বেন তা ভেবেও চিন্তিত ছিলেন একটু। যে লোক সিমলা থেকে হঠাৎ কলকাতা চ'লে আসতে পারে, তার পক্ষে কলকাতার হোটেল ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাওয়া অসম্ভব নয়। অমরবাবুকে সশরীরে স্টেশনে দেখে আনন্দবাবু শুধু যে আনন্দিত হলেন তা নয়, একটু অবাকও হলেন।

"জিনিসপত্র খুব বেশী আছে নাকি সঙ্গে?"

"না, সুটকেস আর বিছানাটা।"

"কবিতার খাতাখানা এনেছেন তো?"

"এনেছি।"

"এইখানেই হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে তা হ'লে সোজা এখান থেকেই যাওয়া যাক।"

"কোথা যেতে হবে?"

"সণ্ট লেক।"

কবির চোখে বিস্মিত দৃষ্টি দেখে হেসে ফেললেন অমরবাবু।

"আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে, না?"

"সিমলা থেকে হঠাৎ এখানে এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন, তার পর দুজনে মিলে সণ্ট লেকে যাচ্ছি, একটু দুর্বোধ্য বইকি।"

অমরবাবু ব্যাপারটা যেন উপভোগ করলেন মনে মনে, ছোট ছেলেরা নিজেদের জানা হেঁয়ালী অপরকে সমাধান করতে ব'লে

যেমন মজা উপভোগ করে অনেকটা তেমনি। কবির দিকে আড়-চোখে চেয়ে বললেন, "হোরেস অ্যালেকজাণ্ডারের নাম শুনেছেন ?"

"না। কে তিনি ?"

"একজন বড় পক্ষীবিজ্ঞানী। খঞ্জন-স্পেশালিস্ট। তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে। হঠাৎ সিমলায় চিঠি পেলাম, তিনি কলকাতায় আসছেন দু দিনের জন্যে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সৌভাগ্য। তাই কালবিলম্ব না ক'রে চ'লে এলাম। কাল আর পরশু—দু দিন তাঁর সঙ্গে সল্ট লেকে ঘুরেছি, নানারকম পাখী দেখলাম, অনেক পাখী এর আগে দেখিই নি। অ্যালেকজাণ্ডার কাল চ'লে গেছেন। আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম দুটো কারণে। প্রথম, আপনাকেও পাখীগুলো দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়, আপনার আর ডানার চিঠিতে খবর পেয়েছিলাম যে, আপনি কোন এক খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। আমার ভয় ছিল, আপনি হয়তো আসতেই পারবেন না। আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘামাবার মত যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা রত্না ঘামাবে। সে এতক্ষণ ডানার কাছে পৌঁছে গেছে সম্ভবত। এবার আশা করি আর কিছু দুর্বোধ্য ঠেকছে না ? চলুন, সোজা বেরিয়ে পড়া যাক এখান থেকে। আগে কিছু খেয়ে নিন।"

কবি প্রশ্ন করিলেন, "সল্ট লেকটা কোথা ?"

"বেঙ্গল কেমিক্যালের পিছনে। সল্ট লেকের বাংলা নাম হচ্ছে ভাওড়। প্রচুর পাখী আছে মশাই, স্বদেশী বিদেশী দুইই। আপনি গেছেন কখনও ?"

"না। কখনও দরকার পড়ে নি তো।"

"চমৎকার জায়গা। জলের মধ্যে আল-বাঁধা জমি, তা ছাড়া জলা, ডোবা, ঝিল, হ্রদ সব একসঙ্গে পাবেন। আবার ওর ভিতর

বাবলা গাছও আছে, ছোট বড় ঝোপঝাড়ও আছে, নলবন, নানাজাতের শর, হোগলা, শ্যাওলা, দেশী পানা, কচুরি পানা— হরেক রকম জিনিস দেখবেন সেখানে। আজ বিশেষ ক'রে গ্রেট মার্শ ওয়ার্বলার (Great Marsh Warbler) দেখাতে চাই আপনাকে। দেখতে বোধ হয় পাবেন না, ডাক শুনেই ফিরে আসতে হবে। নল বনের ভিতরে ঢুকে থাকে ওরা। চলুন, যাওয়া যাক।"

স্টেশনের হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে সল্ট লেকের উদ্দেশে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। খাল পেরিয়ে তবে সল্ট লেকে পৌঁছতে হবে। পারাপার করবার জন্য খেয়া আছে। কবি আর বিজ্ঞানী খেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"দেখুন, দেখুন—"

"কই, কি ?"

"উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক।"

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলেন।

কবি বললেন, "শালিক অনেক দেখেছি।"

"কিন্তু এমন দল বেঁধে এত উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন ? সাধারণত সকালবেলায় ওরা এমন ক'রে উড়ে বেড়ায়। এক্সারসাইজ করে সম্ভবত। আগেও লক্ষ্য করেছি।"

কবি চুপ ক'রে রইলেন।

অমরবাবু বলতে লাগলেন, "পাখীদের নানাভাবে লক্ষ্য করলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ধরুন, এই শালিকরাই সমস্ত দিন কখন কি ভাবে চলাফেরা করে তার একটা রেকর্ড যদি রাখা যায়, অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। সেদিন আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। একটা বাগানে রোজ বেড়াতাম। যখনই ভোরে

গেছি তখনই দেখেছি, 'ফটিক জল' পাখীরা এ-গাছ থেকে ও-গাছে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একদিন যেতে একটু বেলা হ'ল, দেখি, ফটিক-জল একটিও নেই, ঘুঘুর দল এসেছে। মনে হ'ল, প্রত্যেক পাখীর বোধ হয় খেলা করবার নির্দিষ্ট সময় আছে এক-একটা। কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য না করলে অবশ্য ঠিক বলা যায় না। আপনাকে আইডিয়াটা দিয়ে দিলুম, ফিরে গিয়ে লক্ষ্য করবেন তো যদি সময় পান। জমিদারির ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিব্রত হতে হচ্ছে না তো? ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবেন না। আমলা-গোমস্তারা যা পারে করুক, আপনি শুধু একটু নজর রাখবেন। বাস্। বেশী গোলমাল দেখেন তো রত্নাকে খবর দিয়ে দেবেন। ও এসব ব্যাপার আমাদের চেয়ে ভাল বোঝে। চলুন এবার।"

খেয়াটা এসে ভিড়ল। যাত্রীর দল নেবে গেল। ঝুড়ি-মাথায় স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি। গ্রাম থেকে তরি-তরকারি মাছ নিয়ে যাচ্ছে শহরের বাজারে। একজনের সঙ্গে একটি ছাগ-শিশুও ছিল। কবি আর বিজ্ঞানীর সঙ্গে একজন মৎস্য-শিকারীও উঠলেন। ওপারে পৌঁছে বেশ কিছুদূর হাঁটতে হ'ল আল ধ'রে।

"দেখুন, দেখুন, কি বলুন তো ওগুলো? বাইনকুলারটা নিয়ে ভাল ক'রে দেখুন।"

বাইনকুলারটা নিয়ে কবি দেখতে লাগলেন।

"বক মনে হচ্ছে।"

"গ্রে হেরন (Grey Heron)। ওরা খেয়ে ফিরছে সম্ভবত। ওরা খুব ভোরে একবার খায়, আর একবার খায় সন্ধ্যার দিকে। সমস্ত দিন কোনও গাছে নিঝঝুম হয়ে ব'সে থাকে।"

কবি যতক্ষণ দেখা গেল হেরনগুলিকে দেখলেন।

তারপর বললেন, "এখানে কোথাও যদি বসবার জায়গা পাওয়া যেত একটু, বেশ হ'ত।"

"হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না কি? অনেক হাঁটতে হবে এখন।"

"হাঁটতে পারব, বসবার জায়গা খুঁজছি কবিতা লিখব ব'লে।"

"গুড। আছে জায়গা,—ওই দেখুন।"

দূরে একটি কুটির ছিল। অমরবাবু সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

"ও তো বেশ ভাল জায়গা। চেনা-শোনা আছে না কি আপনার সঙ্গে?"

"না, তবে চেনা-শোনা ক'রে দিতে কতক্ষণ! এটা ভারতবর্ষ—সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন মশাই? তা ছাড়া কবি-গুরুর সেই কবিতাটাই বা ভুলছেন কেন—কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই? আসুন।"

অমরবাবু হনহন ক'রে, প্রায় ছুটে, চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে ঘুরে বললেন, "বাইনকুটা গলায় ঝুলিয়ে রাখুন।"

কবির মনে যে কবিতার ভাব জেগেছিল, সেইটেতে তা দিতে দিতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন তিনি। আলের উপর দিয়ে বেশী জোরে চলা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। কুটিরের কাছাকাছি এসে কবি দেখলেন, কুটিরের মালিক অমরবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ গদগদ হয়ে পড়েছেন। মনে হ'ল, লোকটি দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে সের পাঁচেক দুধ ছিল, অমরবাবু সমস্তটা কিনে নিয়েছেন। কবি শুনলেন, অমরবাবু বলছেন—"দুধটা একটু গরম ক'রে দিতে হবে কিন্তু। আর গোটা দুই গেলাস, আর একটু জল চাই।"

ঝোলা-গোঁফ দুগ্ধ-ব্যবসায়ী সবিনয়ে বললেন, "সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে বাবু। আপনারা ততক্ষণ পাখী দেখুন, আমি পীতুকে ডেকে আনি। সে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে আপনাদের। এক শিকারী বাবু বন্দুক নিয়ে এসেছেন, তার পিছু পিছু ঘুরছে শালা।"

"পীতু তোমার চাকর বুঝি ?"

"আমার ছেলে বাবু। চাকর রাখবার মত পয়সা আছে কি বাবু ? নিজেদের কাজ নিজেরাই ক'রে নিই। দুধ কেনা-বেচা ক'রে কায়ক্লেশে সংসার চালাই কোন রকমে। আপনারা এই চৌকিটাতে বসুন। আমি যাব আর আসব।"

"তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয় নি।"

অমরবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

"আমার নাম নীলাম্বর। 'নীলু' ব'লেই ডাকবেন আমাকে। আমার ছেলের নাম পীতাম্বর, ডাকনাম পীতু।"

"ও—"

"পীতুকে ডেকে নিয়ে আসছি এক্ষুনি। আপনারা বসুন।"

নীলাম্বর চ'লে যেতেই অমরবাবুর চোখে শিশুসুলভ দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল।

"আপনি ওই চৌকিটাতে ব'সে ততক্ষণ যা মনে এসেছে লিখে ফেলুন। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ওই যে ওই গাছের ডগায় ব'সে আছে ওটা কি ? ঠিক চিল ব'লে মনে হচ্ছে না। আর একটু এগিয়ে না গেলে ফোকাস করতে পারব না। আপনি কি বিষয়ে লিখবেন এখন ? খুব গ্র্যাণ্ড ভাব এসে গেছে নিশ্চয় ?"

"ওই বকগুলোর কথা শুনে দু-চার লাইন মনে এসেছে, তাই লিখে রাখব।"

"হেরনদের সম্বন্ধে লিখবেন ? তা হ'লে হেরনদের কোর্টশিপের ব্যাপারটা শুনে নিন। আর্মস্ট্রং সাহেবের লেখা একটা বইয়ে পড়েছিলাম। হেরন-যুবা প্রিয়ার সন্ধান করবার আগে ঠিক করে, কোথায় বাসা বাঁধবে। সেটা ঠিক হয়ে গেলে হেরন-যুবা সেই নির্বাচিত বৃক্ষের একটি শাখায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ ক'রে শব্দ করে 'হু' (hoo), তারপর মাথাটি নাবিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে শব্দ করে 'উ উ উ উ'। যতক্ষণ না প্রিয়ার দেখা পায়, ততক্ষণ

ক্রমাগত এই রকম শব্দ ক'রে যায় সে।...আমি চললুম, এক্ষুনি আসছি।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, হেরনের বাংলা কি হবে? বক?"

"হেরন বড় বক। কঙ্ক বা বলাকা বলতে পারেন। আমি চললুম। দেখে আসি, ওটা কি। আপনি চটপট লিখে ফেলুন, অনেক ঘুরতে হবে।"

অমরবাবু বাইনকুলারটা গলায় ঝুলিয়ে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন।

কবি চারিদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা প্রণিধান করলেন। কবিতা লেখবার উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই। কিন্তু চৌকিতে ব'সে হাঁটুর উপর খাতা রেখে লেখা যাবে না। পাশেই একটা চট প'ড়ে ছিল। সেইটে মাটিতে পেতে বসলেন, আর চৌকিটাকে করলেন টেবিল। ব্যবস্থাটা বেশ মনোমত হ'ল। বাগিয়ে বসলেন। পকেট থেকে খাতা আর কলম বেরুল। মুখ ছুঁচলো ক'রে হাঁটু ঝুলিয়ে ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর লিখতে শুরু করলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

বিজ্ঞানী কষে শুধু তথ্যের অঙ্ক
কবি বলে—পাখী নয়, মহর্ষি কঙ্ক।
কবি খোঁজে কবিতা, বিজ্ঞানী তথ্য,
কঙ্কই জানে শুধু কোথা সার সত্য।
সকালেই খাওয়া সেরে চ'লে যায় বাসাতে
সন্ধ্যায় খাবে ব'লে ব'সে থাকে আশাতে।
চিত্তে তোলে না সুর কবিতার মাধুরী
তার ধ্যান চুনোপুঁটি মৎস্য বা দাদুরী।
'ছু' 'উ' ডাকে উড়ে আসে প্রিয়া নভোচারিণী
সু-অণ্ড-প্রসবিনী অতি মনোহারিণী।

বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বেড়ে যায় বংশ
ছানা নয়, আহা, যেন কুল-অবতংস।
এই সত্যের নীড়ে বাস করে কঙ্ক
এই কাব্যের তালে বাজে তার ডঙ্ক।
বাজিতেছে চিরকাল যুগে ও যুগান্তে
হারাইয়া গেল কত ডারবিন্ দাস্তে।

কবিতাটা লিখে কবি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর খাতার পাতা ওলটালেন। উলটেই আর একটা কবিতা চোখে পড়ল। নিজেরই ছেলের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল যেন। অদ্ভুত লাগল। ভাবটাও অদ্ভুত।

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুরগী
চড়াই শকুনি আর কাকেরা
বিহঙ্গ-সমাজের এই নব-শাকেরা,
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ ঝাণ্ডা
অভিজাত পাখীদের ক'রে দেবে ঠাণ্ডা।
ময়ূর, ফটিক-জল, দোয়েল হলদে পাখী
আমেরিকা যাবে ব'লে খুঁজিতেছে 'ভিসা' নাকি।
চুধরাজ-দম্পতি
কম্পিত চিত্ত অতি,
নীলকণ্ঠের নীল হইতেছে গাঢ়তর
তিতির বটের হুপো ভয়ে কাঁপে থরথর,
খঞ্জন, টিট্টিভ
ভয়ে বুক ঢিপঢিপ।
থিরথিরা ছোটপাখী
কাঁপিতেছে থাকি থাকি।

কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া,
চোখ গেল চোখ গেল—ফুকারিছে পাপিয়া।
টুনটুনি বুলবুল
ঘামিতেছে কুলকুল।
শুধু কাঠঠোক্‌রার শোনা যায় ঝঙ্কার—
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও,
চুপি চুপি ডাকে—বউ কথা কও।
দরজি বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসে শুনিয়া।

কবিতাটা নিজেরই ভাল লাগে নি ব'লে ডানাকে শোনানো হয় নি আর। আর একটা অদ্ভুত কবিতাও চোখে পড়ল। লাল কালিতে লেখা। পড়তে পড়তে মুচকি হাসি ফুটল—কেন লিখেছিলেন এসব। রাবিশ যত।

বল্‌ দেখি ভাই—ডাব,
বলত যদি সে,
অমনি হেসে জবাব দিতাম
তোমার সঙ্গে ভাব।
ছেলেবেলায় সহজ ছিল সব
এখন সবাই 'স্নব'।
শিকড়সুদ্ধ নারকেল গাছটাও এখন যদি আসে
ফিরবে হতাশ্বাসে,
জমবে না ঘটকালি
ঘটবে না তা 'ডাব' বললেই ঘটত যাহা খালি।

কাটাকুটির ভিতর আর একটা কবিতা চোখে প'ড়েও মজা লাগল খুব।

কবি। [উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যের প্রতি] ওরে ভুতো—
পাখীগুলো তাড়া তাড়া, মার্ জুতো।
[চড়ুই পাখীর প্রতি, ভদ্রতা সহকারে]
চড়ুই পাখী, চড়ুই পাখী,
তোমার না হয় নাই শরম।
কিন্তু তোমার বোঝা উচিত
আমি একটা ভদ্রলোক
আমার দুটো আছেও চোখ
আমার সামনে না-ই করলে
এমনধারা কাণ্ড চরম।
[ঈষৎ ভাবিয়া এবং ইতস্তত করিয়া]
একটা কথা হচ্ছে মনে, বলছি সেটা,
আমার ঘরের আল্‌সে জুড়ে করছ যেটা
সেটাই হবে শিল্প-সৃষ্টি
সংস্কৃতি কিংবা কৃষ্টি
সভ্য ভাষা যদি একটা শিখতে পার
করছ যা তা গল্পে যদি লিখতে পার
করতে পার বাজার গরম
পটাং ক'রে পক্ষী-কবি হতেও পার
কেউ তোমাকে বলবে—লরেন্স,
কেউ বা হয়তো বলবে—মম্।

কবি তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা উলটে চলেছিলেন। অমরবাবু যে 'এক্ষুনি আসছি' ব'লে অনেকক্ষণ দেরি করছেন—এ

খেয়ালই ছিল না তাঁর। তিনি পুরনো কবিতাগুলোই আবার কাটাকুটি করছিলেন। হঠাৎ অমরবাবু এসে হাজির হলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত কলেবর, সঙ্গে চার-পাঁচটা ছোঁড়া।

"লেখা হ'ল আপনার?"

"হয়েছে।"

"উঠুন তা হ'লে। অনেক জিনিস দেখাব আপনাকে আজ। গাছের ওপর ওটা কি ব'সে আছে জানেন? চিল নয়, কোড়াল—হোয়াইট টেল্‌ড্ ফিশিং ঈগল্ (White Tailed Fishing Eagle), সংস্কৃত ভাষায় বললে বলতে হয়—মৎস্য-গরুড়। ভাওড়ের জলচারী পাখীদের রাজা। প্রায় তেত্রিশ ইঞ্চি লম্বা। চলুন, আর দেরি করবেন না।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "এ ছেলেগুলি কে?"

"এদের ডেকে নিয়ে এলাম ওদিকের গাঁ থেকে। দুধ খাওয়াব এদের। পাঁচ সের দুধ না হ'লে হবে কি? এদের সাহায্যও দরকার আমাদের। নলবনের ভেতর যে সব ওয়ার্বলার ঢুকে আছে তাদের তাড়া না দিলে বেরুবে না, তাড়া দিলেও বেরুবে কিনা সন্দেহ। এরা ঢিল মারবে। চলুন, বেরুনো যাক। চড়্‌চড় ক'রে রোদ উঠছে।"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। পিছনে পিছনে ছোঁড়ার দল চলল। আলের ওপর দিয়ে কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে অমরবাবু বললেন, "কি কি দেখাব আপনাকে তার মোটামুটি একটা ফর্দ ক'রে ফেলেছি—এই দেখুন। মানে, এই পাখীগুলো এখনও এখানে আছে। খঞ্জন কয়েক রকমই আছে। বিদেশ থেকে এ দেশে যারা শীতকালে এসেছিল, তাদের এবার নিজের দেশে ফেরবার সময় হয়েছে। সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে এবার ওরা ডিম পাড়বে। সেই জন্যে ওরা সবাই এবার ব্রিডিং প্লুমেজে (Breeding Plumage) অর্থাৎ বর-বেশে সেজেছে। এদের মধ্যে এক রকম হচ্ছে হলদে খঞ্জন।

এদের মধ্যে আবার তিনটি উপজাতি আছে। নীল মাথা, ফিকে ধূসর মাথা, গাঢ় ধূসর মাথা। এ ছাড়া আর এক রকম হলদে খঞ্জন আছে যাদের মাথাটাও হলদে। এরা ভিন্ন জাত। পঞ্চম হচ্ছে, গ্রে ওয়াগটেল (Grey Wagtail)—এও ভিন্ন জাত। সব দেখতে পাবেন আজ। খঞ্জন ছাড়া আর এক রকম নূতন পাখী দেখাব, যা আপনি দেখেন নি কখনও—ওয়ার্বলার (Warbler)। এদের বাংলা নাম দিয়েছি কলকলানি। ক্রমাগত কলকল করে। পাঁচ রকম আছে দেখলাম—স্ট্রায়েটেড মার্শ ওয়ার্বলার (Striated Marsh Warbler), গ্রেট্ রীড্ ওয়ার্বলার (Great Reed Warbler), জাংগ্‌ল্ রেন্ ওয়ার্বলার (Jungle Wren Warbler), ইণ্ডিয়ান রেন ওয়ার্বলার (Indian Wren Warbler), প্যাডি ফিল্ড্ ওয়ার্বলার (Paddy field Warbler)—"

অমরবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

"আমার নোট-বুকের কয়েকটা পাতা খুলে প'ড়ে গেছে দেখছি।"

"এই যে আমি কুড়িয়ে রেখেছি।"—একটি ছেলে খান কয়েক পাতা ছেঁড়া কামিজের পকেট থেকে বার করলে।

"বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে। চল, খাওয়াব তোমাদের।"

অমরবাবু তার হাত থেকে পাতাগুলি নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বলতে লাগলেন, "এ সব ছাড়া আর যা আছে তা আপনি দেখেছেন সম্ভবত। টিট্টিভ, গাংচিল, বাজ, জলপিপি, ফেজাণ্ট টেল্‌ড্ জ্যাকানা আছে দেখলাম একটা, ওর দিশী নাম পিউয়া। পিউয়া এখন বর-বেশে সেজেছে, একটা তৃতীয়ও দেখেছি। চলুন, অনেকক্ষণ ঘুরতে হবে।"

গতিরোধ করতে হ'ল আবার। দেখা গেল, নীলাম্বর পাতাস্বরকে নিয়ে ফিরছে। নীলাম্বর অবাক হয়ে গেল, একটু অপ্রস্তুতও হ'ল যেন।

"আপনারা সব চ'লে যাচ্ছেন যে ?"

"আসছি এখুনি, তুমি ততক্ষণ হুধটা গরম কর না।"

"কতক্ষণে ফিরবেন ? হুধ জুড়িয়ে যাবে যে।"

"আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। একটু পরে না হয় গরম ক'রো।"

অমরবাবু নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন একবার।

"চলুন, যাওয়া যাক।"

আবার তিনি তাঁর নোট-বুক থেকে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। বাইনকুলারটা তুলে ফোকাস করলেন আকাশের দিকে, ক'রেই নাবালেন সেটা চোখ থেকে। চোখ হুটো জ্বলজ্বল করছিল উত্তেজনায়।

"ওটা দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না ?"

কবি বাইনকুলার লাগালেন চোখে। তারপর বললেন, "চিলের মত মনে হচ্ছে—"

"চিলের মত, কিন্তু চিল নয়। ওর পেটের তলাটা দেখুন ভাল ক'রে, আর গলার পাশটা দেখুন। পেটের তলাটা দেখেছেন ?"

"দেখেছি, সাদা। গলার পাশে কালো মত একটা দাগ রয়েছে।"

"হ্বাট'স ইট। চিলের ও-রকম থাকে কি ? বরং হোয়াইট আইড বাজার্ড ঈগলের (White Eyed Buzzard Eagle) সঙ্গে কিছু মিল আছে। কিন্তু বাজার্ড অনেক ছোট ওর চেয়ে। অস্‌প্রে (Osprey) মশাই। উৎক্রোশ, কবি কালিদাস যাকে কুররী ব'লে বর্ণনা করেছেন। সেবার শীতকালে আপনাকে দেখিয়েছিলাম, মনে নেই ? এরা সব শীতের অতিথি। গ্রীষ্মকালে ওরা ইউরোপে চ'লে যায়। ইউরোপে গিয়ে এতদিন ওর বাসা বাঁধা উচিত ছিল। ভাওড়ের মাছের লোভ ছাড়তে পারছে না বোধ হয়।"

অমরবাবু আরও বোধ হয় কিছু বলতেন, কিন্তু নীলাম্বর-পুত্র পীতাম্বর ছুটে এসে বাধা দিলে।

"দুধটা আপনারা খেয়েই যান। বাবা বললেন, তা না হ'লে দুধ হয়তো খারাপ হয়ে যেতে পারে। রাত্রের বাসি দুধ তো।"

"চলুন, ঝামেলা মিটিয়েই ফেলা যাক।"

অমরবাবু আবার সদলবলে ফিরলেন কুটিরের দিকে। ঘুঁটে আর কাঠ জ্বালিয়ে দুধটা গরম ক'রে ফেললে নীলাম্বর। অমরবাবু প্রত্যেকটি ছেলেকে দু-তিন গ্লাস ক'রে দুধ খাওয়ালেন।

কবি বললেন, "আমার মশাই খিদে নেই এখন।"

"যা পারেন খেয়ে নিন। সমস্ত দিন ঘুরতে হবে তো। মিল্‌ক্‌ ইজ এ গুড ফুড। একটু খান।"

এক গ্লাস খেতে হ'ল কবিকে। অমরবাবু উবু হয়ে ব'সে ঢকঢক ক'রে প্রায় এক ঘটি দুধ খেলেন।

নীলাম্বর বললে, "আরও খানিকটা দুধ প'ড়ে রইল যে?"

রুমালে মুখ মুছে অমরবাবু হেসে বললেন, "ওটুকু তোমরা দুজনে শেষ ক'রে ফেল। চলুন এবার। আহার-সমস্যার সমাধান হ'ল, নিশ্চিন্ত চিত্তে এবার পাখী দেখা যাক।"

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পরিশ্রান্ত কবি একটা গাছের ছায়ায় এসে বসেছেন। অমরবাবু তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘন নলখাগড়া ঝোপের পাশে। ছেলেগুলো তখনও ঝোপের ভিতর ইট ফেলছে মাঝে মাঝে। একটিও কলকলানি পাখী দেখা যায় নি তখনও। নলখাগড়ার ভিতর থেকে কিন্তু অবিরাম শব্দ হচ্ছে, গোড়া থেকেই হচ্ছিল। চক্‌ চক্‌ চক্‌ চক্‌—কেরে কেরে ক্রেৎ ক্রেৎ—চক্‌ চক্‌—পৃৎ পৃৎ পৃতিক—ক্রেৎ ক্রেৎ ক্রেৎ। হঠাৎ মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে। সারা দুপুর এই শব্দ শুনে কবি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে একটা কবিতার কয়েকটা ছত্র ঘুরে-ফিরে আসা-যাওয়া করছিল অনেকক্ষণ থেকে। পকেট থেকে খাতা কলম বার ক'রে হাঁটুর উপর খাতাটা

রেখে কবিতাটা লিখে রাখলেন। এখনি না লিখে ফেললে ভুলে যাবেন পরে—

জয় জয় জীবনের জয় জয়
নলখাগড়ার বন বাঙ্ময়।
বাঙ্ময় আকাশের শূন্য
ক্ষিতি অপ্ মরুৎ যে পূর্ণ
রোদে জ্ব'লে বাণী কার পুণ্য
নলখাগড়ার বন কিবা কয়।
জয় জয় জীবনের জয় জয়।

"দেখুন, দেখুন, দেখুন—একটা বেরিয়েছে—"

অমরবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন হঠাৎ।

ফুড়ুৎ ক'রে একটা পাখী বেরিয়েই আবার ঝোপে ঢুকে পড়ল। অমরবাবু সাগ্রহে ছুটে এলেন।

"দেখেছেন পাখীটা? অলিভব্রাউন রঙ, ঠোঁটটা কালচে বাদামী?"

কবি দেখতে পান নি। কিন্তু বিজ্ঞানীকে সে কথা বললে তিনি বড়ই মর্মাহত হবেন, তাই বললেন, "দেখেছি, তবে ভাল ক'রে দেখি নি।"

"ওর চেয়ে ভাল ক'রে দেখা শক্ত। মার্শ ওয়ার্বলারটা দেখেছেন ভাল ক'রে আশা করি। অনেকটা ভরত পাখীর মত উড়ল, না? গানটিও সুন্দর, হুইট্—হুইট্—টু—টু—হুইট্—হুইট্—"

ছেলেগুলো নলখাগড়ার ঝোপে আবার ঢিল ছুঁড়ছিল। দুধ খাইয়ে অমরবাবু তাদের কেনা গোলাম ক'রে ফেলেছিলেন একেবারে। অমরবাবু বললেন, "ওই ঝোপটার ওপর আসুন আমরা বাইনকুলার ফোকাস ক'রে ব'সে থাকি। কখন ফট ক'রে বেরুবে বলা যায় না তো।"

দুজনে চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ব'সে রইলেন। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, গ্রীষ্মের এই দুপুরে কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে আমরা কি খুঁজছি ? পাখী, না, আর কিছু ?

৬০

ডানা আবার সন্ন্যাসীর কাছেই গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না, কারণ আনন্দমোহনবাবুর চ'লে যাওয়ার ঠিক পরেই রূপচাঁদ এসে হাজির হয়েছিলেন আবার। রূপচাঁদের ব্যবহারে কোনরকম অশোভনতা ছিল না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে শাণিত ছুরিকার ঝলক চকমক ক'রে উঠছিল যেন মাঝে মাঝে। যাওয়ার আগে তিনি ব'লে গিয়েছিলেন, "এখন আমি চললুম। কিন্তু আবার আসব। একবার নয়, বার বার। ওই নীলকণ্ঠ পাখীটা তার সঙ্গিনীকে ঘিরে যে উৎসব করছে, একবার উড়ে চ'লে যাচ্ছে দূরে আবার ফিরে আসছে দ্বিগুণিত উৎসাহে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত ক'রে, তা কি দেখতে পাও না তুমি ? বাইনকুলার চোখে দিয়ে কি দেখ তা হ'লে ? ওইটেই তো দেখবার মত একমাত্র সত্য। শুধু পক্ষী-জগতে নয়—সর্বত্র। আর একটা জিনিসও এতদিন তোমার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত ছিল, চোখে পড়া উচিত ছিল অন্তত। পাখীদের মধ্যে এটা কি তুমি লক্ষ্য কর নি যে, যে পুরুষপাখীটা বেশী শক্তিমান, সে-ই অবশেষে প্রণয়-দ্বন্দ্বে জয়ী হয় ? শক্তিরই জয় সর্বত্র। বিদেশের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক—সবাই এই কথাই বলছেন। ডারবিনের 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' আর নীট্‌শের 'সুপারম্যান' একই তথ্যের দুটো দিক। আমাকে তুমি কি অক্ষম মনে কর ? শক্তির পরিচয় যেদিন চাইবে, যেমন ভাবে চাইবে, পাবে। এমনও হতে পারে যে, না

চাইলেও পাবে। এখন চললুম, কিন্তু আবার আসব। হয়তো অসময়ে অতর্কিতে আসব—”

ডানার দিকে চেয়ে একটু হেসে চ'লে গিয়েছিলেন তিনি। ডানা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ব'সে ছিল খানিকক্ষণ, তারপর সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল।

সমস্ত শুনে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “ইতিহাস পড়েছ তুমি?”

“পড়েছি কিছু কিছু।”

“তা হ'লে তোমার জানা উচিত, ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা অসভ্যতার লক্ষণ। মানুষ যখন খুব অসভ্য ছিল, তখন তার পশু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। কিন্তু চারিদিকে যে অদৃশ্য শক্তির প্রতাপ সে অনুভব করত, যার প্রভাব সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারত না, যার প্রকাশ সে দেখত ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, বজ্রে-বিদ্যুতে, দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে, হিংস্র জন্তুতে, তার রূপ ভয়ঙ্কর ছিল তার কাছে। সেই ভয়ঙ্কর কল্পনা যখন দেবতারূপে মূর্ত হ'ল তাদের সমাজ-জীবনে, তখন সে দেবতাও হ'ল ভয়ঙ্কর। তার রূপ হ'ল রক্তপায়ী পিশাচের রূপ। যে সব সভ্যতা অতি প্রাচীন, যেমন ধর—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, উর, তাতে তুমি কোনও সুন্দর দেবতার সাক্ষাৎ পাবে না। সবই বীভৎস। পশু আর মানুষে মিলিয়ে, দু রকম পশুর সংমিশ্রণ ক'রে যে সব দেবতার মূর্তি তারা নির্মাণ করেছিল তা ছিল তাদের ভয়েরই প্রতীক। মানুষ আরও যখন সভ্য হ'ল, তখন ভয় কমতে লাগল। ও-দেশে বোধ হয় গ্রীসেই প্রথম মানুষের রূপে ভগবানকে কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে বোধ হয় তারও আগে। আমাদের দেশে চিন্তাধারা আরও নানাভাবে এগিয়েছে। ভগবানকে আমরা নিজেদের মধ্যেই পেয়েছি, আমরাই বলেছি—সোহং, আমরাই জেনেছি—প্রেমই ভগবান, আমরাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি।

যদিও নানাভাবে নানা সাধক নানা পথে এগিয়েছেন, প্রত্যেকের পথ আলাদা আলাদা হয়েছে, হয়তো বিপরীতমুখী হয়েছে, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই একমত—ভয়কে কেউ আমল দেন নি, ভয়ের স্থান কোথাও নেই। আমাদের দেশে আত্মার অপর নামই অভয়। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? রূপচাঁদবাবু কি করবেন তোমার?”

“যদি অপমান করেন?”

“সম্মান মানেই আত্মসম্মান। তুমি ছাড়া তোমার সম্মান আর কেউ তো ক্ষুণ্ণ করতে পারে না—”

“যদি জোর ক'রে গায়ে হাত দেন?”

“দিলেনই বা। তোমার যদি খারাপ লাগে, বাধা দেবে। তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই প্রতিবাদ করবে—”

“তা তো করবই। কিন্তু আমার শক্তি আর কতটুকু বলুন?”

“যতটুকু আছে প্রতিবাদ করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তোমার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ও-লোকটা যদি তোমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে, তা হ'লে তোমার আত্মসম্মান নষ্ট হবে না। তা ছাড়া, তোমার যে আসল ‘তুমি’ তার গায়ে কেউ হাত দিতেই পারে না। তোমার দেহটা তুমি নও। তুমি ভয় ত্যাগ কর। তা ছাড়া, তোমার কাছে চাকর থাকে তো একজন?”

“তা থাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ, চাকরটাও ওঁর দলে। উনিই যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন লোকটাকে। সেদিন দেখলাম, একটা রঙিন জামা আর জুতো কিনে দিয়েছেন। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না।”

সন্ন্যাসী আবার কিছুক্ষণ হাসিমুখে থেকে বললেন, “আত্মবিশ্বাস ছাড়া আর কোনও বিশ্বাসই টেকে না শেষ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে আস্থাবান হও, ভয় পেয়ো না। ভয়টা মিথ্যা, একমাত্র সত্যই

"আপনি আমার কাছে গিয়ে থাকবেন চলুন। আমি বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি।"

"পরিষ্কার আমি নিজের হাতেই ক'রে নিতে পারি। কিন্তু তোমার ওখানে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বাধা আছে।"

"কিসের বাধা?"

"তা ঠিক তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না।"

ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। লজ্জায় নয়, রাগে। রাগটা হ'ল তার নিজেরই ওপর। ঠিক এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর একবার আলোচনা হয়েছিল, ঠিক এই একই অনুরোধ করেছিল সে সন্ন্যাসীকে—তখনও তিনি ঠিক এমনই ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আরও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নারীসঙ্গ বিষবৎ আমার পক্ষে। তবু সে কোন্ লজ্জায় ওই একই প্রসঙ্গ তুলেছে আবার! কিন্তু এ অবস্থায় সে করবেই বা কি? হঠাৎ কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

"চিনতে পারছ?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং রত্নপ্রভা দাঁড়িয়ে। গোলগাল কালো মুখটি হাসির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। হাতে একটি বেঁটে ছাতা, বগলে ফাইল। ডানা কি যে বলবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল শুধু। তারপর বললে, "আপনি আসবেন কোন খবর পাই নি তো?"

"খবর দেওয়ার সময় ছিল না। একাই এসেছি। আনন্দবাবুর বিপদের খবর পেয়ে মনে হ'ল, নিজে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। আমি এসেছি সকালে। এসেই সদরে গিয়েছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে।"

তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে তিনি নমস্কার করলেন। হাসিমুখে বললেন, "আপনি এখনও আছেন এখানে?"

"এইবার যাব।"—সন্ন্যাসীও হাসিমুখে উত্তর দিলেন।

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে এসেছেন কতক্ষণ আগে?"

"এখুনি। সোজা স্টেশন থেকেই তো আসছি। তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। চাকরটার কাছে শুনলাম—তুমি এখানে আছ, তাই এখানেই চ'লে এলাম।"

স্মিতমুখে ডানার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অকারণে ডানার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, সে যেন একটা দুষ্কার্য করছিল, হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, "চলুন, আপনার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করি তা হ'লে।"

"সে সব সেরে এসেছি আমি সদরে। চা খাব একটু।"

"চলুন।"

কিছুদূর এসে রত্নপ্রভা প্রশ্ন করলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ভাব হ'ল কি সূত্রে?"

"সূত্র কিছু নেই, এমনি আলাপ করেছিলাম একদিন নিজেই গিয়ে। অদ্ভুত চরিত্রের লোক, নিজেকে নিয়েই থাকেন ওই ভাঙা ঘরে। নদীর চরে একা একা ঘুরে বেড়ান। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গল্প করি।"

"আমাদের পাখীগুলোর খবর কি?"

"মাঝে মাঝে ম'রে যাচ্ছে দু-একটা।"

"তা তো যাবেই। চা খেয়ে যাব একবার দেখতে। তারপর হেসে বললেন, দেখবার মত বিদ্যে নেই অবশ্য আমার। আমার দৌড় লাহা মশায়ের 'পেট বার্ডস অব বেঙ্গল' (Pet Birds of Bengal) পর্যন্ত। ওঁর সঙ্গে এতদিন থেকেও বিদ্যে বিশেষ বাড়ে নি। তোমার কেমন লাগছে?"

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না, অর্থাৎ ঠিক কি বললে যে সত্য কথা বলা হবে তা মাথায় এল না। অমরবাবু তাকে যে নূতন জগতের সন্ধান দিয়ে গেছেন তা যে খারাপ

লাগছিল—এ কথা সত্য নয়; কিন্তু যে অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে থেকে তাকে সে জগতের পরিচয় নিতে হচ্ছিল, সেই পরিবেশটাই ক্রমশ এমন নিদারুণ হয়ে উঠছিল যে কিছুই তার ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, দাঁতের ব্যথা নিয়ে তাকে যেন বাধ্য হয়ে ব'সে কোনও ভাল ওস্তাদের গান শুনতে হচ্ছে। গানের কিছুটা সে বুঝতে পারছে, কিছুটা তাকে মুগ্ধও করছে, কিন্তু দাঁতের ব্যথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিন্তু এত কথা সে রত্নপ্রভাকে বুঝিয়ে বলবে কি ক'রে? তাই চুপ ক'রেই রইল। রত্নপ্রভা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন।

বললেন, "তোমার ভাল লাগছে না বোধ হয়। কিন্তু পাখীর পালক নিয়ে যে প্রবন্ধটা তুমি ওঁকে লিখে পাঠিয়েছিলে তা প'ড়ে মনে হয়েছিল যে, পাখীদের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি।"

"ও-প্রবন্ধে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। পাঁচটা বই দেখে লিখেছিলাম। পাখীদের কথা আগে তো কিছুই জানতাম না, এখন যত দেখছি তত ভাল লাগছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—"

"মুশকিল আবার কি?"

"চলুন, সব বলছি।"

ডানা অবশ্য অকপটে সব কথা রত্নপ্রভাকে বলতে পারে নি। বলা সম্ভবই ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু যতটুকু সে বলেছিল, তাতেই রত্নপ্রভা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর নিটোল ভারী মুখখানা যদিও গম্ভীর হয়েই ছিল, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়ছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, "ওতে ভয় পেয়ো না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়। ও কিছু নয়। আমাকে তো রূপসী বলা চলে না, সাঁওতালনীর মত চেহারা আমার, আমাকেও ও ভোগ ভুগতে হয়েছে। ও কিছু নয়। দু দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে সব।

আমাদের দেউড়ির সিপাহী সুখন পাঁড়েকে ব'লে যাব, সে তোমার কাছে না হয় থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। আর এক কাজ করলেও তো হয়। এখানে থাকবার দরকার কি? আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটা কি ছুটো ঘর নিয়ে থাকলেই তো পার।"

"নদীর ধারে এই জায়গাটা কিন্তু ভারি চমৎকার। গোড়া থেকেই এখানে আছি, মন ব'সে গেছে এখানে। তবে আপনি যদি বলেন—"

শেষের কথাগুলো উচ্চারণ ক'রেই সে থেমে গেল, নিজের কানেই অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। তার যে নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সে যে একজন বেতনভোগিনী দাসী মাত্র, কর্ত্রীর আদেশ অনুসারেই তাকে চলতে হবে, গত্যন্তর নেই—এই ভাবটা যেন কদর্য মূর্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষের কটা কথায়।

রত্নপ্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। তাঁর গাম্ভীর্য অটুট রইল।

বললেন, "বেশ, এখানেই থাক তা হ'লে। সুখন থাকবে তোমার কাছে—তাকে ব'লে যাব।"

"না, তাকে কিছু বলবার দরকার নেই এখন। ও যেমন দেউড়িতে আছে থাকুক। যদি তেমন দরকার বুঝি আনিয়ে নেব ওকে।"

"বেশ। চল, এবার পাখীগুলো দেখে আসা যাক।"

"চলুন।"

আনন্দবাবুর ব্যাপারটা কি হ'ল তা রত্নপ্রভা কিছু বলেন নি এতক্ষণ। রাস্তায় যেতে যেতে বললেন, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। আনন্দমোহনবাবুর ছাত্র উনি, আমার সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন।"

"আনন্দমোহনবাবুর মকদ্দমার আবার দিন পড়েছে?"

"পড়েছে বোধ হয়। কিন্তু আনন্দমোহনবাবুকে ওঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। আসল খুনী যারা পড়েছে, দোষও স্বীকার করেছে।"

"ও! তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আনন্দমোহনবাবুকে এর জন্যে আর ঝামেলা পোয়াতে হবে না, তবে—। আচ্ছা, এখানকার এস. পি. মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?"

"না, তেমন আলাপ হয় নি।"

"আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় উনি। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। কোথায় বেরিয়েছেন শুনলাম। আজই ফেরার কথা। আমি চিঠি লিখে এসেছি একটা। হয়তো দেখা হয়েও যেতে পারে।"

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর জাল-ঘেরা পক্ষী-নিবাসে এসে হাজির হলেন তাঁরা। একজন চাকর পাখীদের জন্যে নানারকম খাবার নিয়ে আগে থাকতেই ব'সে ছিল। রত্নপ্রভাই সদরে যাবার আগে এ ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন।

দানা আর ফল ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের মধ্যে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল যেন, বিশেষ ক'রে টিয়া শালিক আর ছাতারেদের মধ্যে। আলাদা আলাদা খাঁচায় শামা, হরবোলা, দামা, দোয়েল, পাহাড়ী ময়না, হলদে পাখী প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাখা ছিল। তারা বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না কিন্তু। খাবারের দিকে চেয়েও দেখলে না।

"হুতোম প্যাঁচাটা ম'রে গেছে?"

"হ্যাঁ। ফিঙে দুটোও বাঁচল না। ওই পাহাড়ী ময়নাটাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। গায়ে পোকা হয়েছে বোধ হয়। হলুদ-জলে একদিন স্নান করিয়েছিলাম। কিন্তু বিশেষ কোনও উপকার হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না। কি করা যায় বলুন তো?"

"বেশী অসুস্থ হ'লে ছেড়ে দিও। হরবোলাটা কেমন আছে? ছেলেবেলায় আমি একটা হরবোলা পুষেছিলাম, কত রকম ডাকই যে ডাকত!"

হরবোলার খাঁচার কাছে গিয়ে রত্নপ্রভা অপ্রত্যাশিতভাবে শিস

দিলেন একটি। ডানা অবাক হয়ে গেল; হরবোলা পাখীটাও। খাঁচার ভিতরই সে তুড়ুক ক'রে এগিয়ে এল, ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে দেখলে একবার রত্নপ্রভার মুখের দিকে, তারপর সেও মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে জবাব দিলে। মনে হ'ল, রত্নপ্রভাকে যেন বললে— তুমি যে আমার আত্মীয় তা তোমার শিস শুনেই বুঝেছি। তারপর খাঁচার দাঁড়ে পা দুটো আটকে ডিগবাজি খেয়ে নিজের আর একটা কৃতিত্ব দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ওর প্রতি আর বেশী মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাওয়া গেল না, আর একজনের ডাক শোনা গেল। ফটি—ক জল, ফটি—ক জল।

"ফটিক-জলগুলো বেঁচে আছে না কি?"

"না, তিনটে ম'রে যাবার পর বাকিগুলোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বন্দী অবস্থায় কেমন যেন মন-মরা হয়ে থাকে।"

"বেশ করেছ। কিন্তু ডাকটা এল কোথা থেকে?"

"ওই বড় গাছটায় ওরা বাসা বাঁধছে বোধ হয়। প্রায়ই ডাক শুনি। বাইনকুলার দিয়ে দেখতেও পেয়েছি দু-একবার।"

"চমৎকার দেখতে, নয়?"

"সুন্দর।"

পক্ষী-প্রসঙ্গ কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পেল না। মোটরের হর্ন শোনা গেল একটা। চাকরটা এসে খবর দিলে—পুলিস সাহেব এসেছেন, মালকাইনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

পক্ষী-নিবাসের গেটেই দেখা হ'ল মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে। রত্নপ্রভাকে দেখেই মিস্টার গুপ্ত স্টিয়ারিং ছেড়ে নেবে এলেন এবং পারধানে সাহেবী পোশাক থাকা সত্ত্বেও হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে।

"মাসীমা, আপনি যে এখানে আসতে পারেন তা কল্পনাই করি নি আমি। এখানে হঠাৎ কি সূত্রে এসেছেন?"

"এখানে আমার একটা বাড়ি আছে, কিছু সম্পত্তিও আছে। তাই মাঝে মাঝে আসি। তুমি কতদিন হ'ল এসেছ এখানে ?"

"বেশী দিন নয়। মাস দুয়েক।"

"এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শ্রীমতী ডানা, আমাদের পক্ষী-নিবাসের কর্ত্রী। এখানেই থাকেন উনি। রিটায়ার্ড প্রোফেসার আনন্দমোহনবাবু আমাদের জমিদারির ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গেও আলাপ ক'রো, চমৎকার লোক, চমৎকার কবিতা লেখেন। এখন এখানে নেই, কলকাতা গেছেন, দু-একদিনেই ফিরবেন।"

"আচ্ছা, ইনিই কি খুনের মোকদ্দমায় পড়েছিলেন না কি ?"

"হ্যাঁ। কোনও দুষ্ট লোক ফাঁসিয়ে দিয়েছিল বেচারীকে তোমাদের আইনের জালে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ওঁকে রেহাই দিয়ে দিয়েছ তোমরা।"

মিস্টার গুপ্ত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নিজের বাটার-ফ্লাই গোঁফে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করতে করতে রত্নপ্রভার কথা শুনছিলেন। রত্নপ্রভা থামতেই বললেন, "সে দুষ্টু লোকটিকে চিনি আমি। এ যে আপনাদের জমিদারি, আপনাদের ব্যাপার—কিছুই জানতাম না আমি। আই সি। আপনি যাবেন কখন ?"

"আজই রাত দশটার ট্রেনে আমি ফিরতে চাই। তোমার মা কোথায় আজকাল ?"

"ডেরাডুনেই আছেন। মেসোমশায়ের পাখী-বাতিক এখনও আছে ?"

"বেড়েছে। পক্ষী-নিবাস দেখে বুঝছ না ? তুমি সন্ধ্যেবেলা আজ খাও না আমার কাছে। সুনীরা এখানেই আছে ?"

"না, সে বাপের বাড়ি গেছে, তার বোনের বিয়ে। আসবে দিন সাতেক পরে। আচ্ছা, আমি আসব আজ সন্ধ্যের পর। সাড়ে সাতটা নাগাদ—"

"ডানা, তুমিও এস, আমার ওখানেই খাবে আজ।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। খাকি-পোশাক-পরা গোঁফ-ছাঁটা ঘাড়-কামানো এই বলিষ্ঠ লোকটার সামনে ব'সে খেতে হবে। কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। চুপ ক'রে রইল।

মিস্টার গুপ্ত বললেন, "আপনারা কোথা যাচ্ছেন, আসুন না, পৌঁছে দি।"

"আমরা বেশী দূর যাব না। এই কাছে-পিঠেই ঘোরা-ফেরা করব। তুমি যাও।"

"আচ্ছা, সাড়ে সাতটা নাগাদ আপনাদের কাছারিতে পৌঁছব, কাছারিটা চিনি। পাশেই দোতলা বাড়িটাই নিশ্চয় আপনার?"

"হ্যাঁ।"

মিস্টার গুপ্ত চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা পক্ষী-নিবাসটাই ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন নীরবে। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে জিজ্ঞেস করলেন, "এ পাখীটা কি—বেশ সুন্দর দেখতে তো! এটাকে আগে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।"

"আপনারা চ'লে যাওয়ার পর একটা পাখীওলা দিয়ে গিয়েছিল।"

"নাম কি?"

"বলেছিল, দামা। দামাই লিখে রেখেছি, ইংরেজী নাম খুঁজে পাই নি।"

"লাহা মশায়ের বইয়ে দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব অরেঞ্জ-হেডেড গ্রাউণ্ড থ্রাশ (Orange-headed Ground Thrush)।"

আরও কিছুক্ষণ নীরবে পাখী দেখে বেড়ালেন। তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখ, আমাদের ছেলেমেয়ে হয় নি। এরাই আমাদের ছেলেমেয়ে। এদের একটু যত্ন ক'রো। তুমি যত্ন করছ নিশ্চয়ই, তবু বললাম কথাটা। এদের নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। আচ্ছা, কটা পাখী ম'রে গেছে? লিস্ট ক'রে রেখেছ কি?"

"রেখেছি। বাসায় আছে।"

"মরতে দিও না কাউকে। যদি দেখ খাচ্ছে না বা বিমর্ষ হয়ে আছে, ছেড়ে দিও।"

"আচ্ছা।"

ডানার বাসার দিকেই ফিরছিলেন রত্নপ্রভা। হঠাৎ রত্নপ্রভার কানের কাছ দিয়ে সোঁ ক'রে একটা তীর বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

"এ কি ব্যাপার, তীর ছুঁড়ছে কে?"

পর-মুহূর্তেই তীরন্দাজদের দেখা গেল। বকুলবালা গাছ-কোমর বেঁধে হাঁটু গেড়ে ব'সে তৃতীয়বার শর-সন্ধান করছিলেন, পাশে এক গোছা শর নিয়ে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল, তারও আর এক হাতে ধনুক।

ডানা হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললে, "বকুলদি, কখন এলেন আপনি?"

"এখুনি এসেছি। এসেই দেখি একটা বাজ না চিল তোমার ওই পাখীর বাসার উপর ব'সে আছে। আর একটু হ'লে বাচ্চাগুলোকে শেষ ক'রে ফেলত। ভাগ্যে আমি আর চণ্ডী এসে পড়েছিলাম—"

উৎসাহভরে তিনি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রত্নপ্রভাকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গায়ে দিয়ে মাথায় আধঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

ডানা পরিচয় করিয়ে দিলে, "ইনি অমরেশবাবুর স্ত্রী। আসুন, আলাপ করুন।"

বকুলবালার কিন্তু আলাপ করবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ লজ্জিত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, আর বার বার আঁচল দিয়ে নিজের স্থূল বপুটি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে এলেন তিনি।

ডানা বললে, "ইনি রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী। এঁরও পাখী পোষার খুব শখ। তালগাছে ওই যে বাক্সটা আমরা বেঁধে দিয়েছি, তাতে শালিক বাসা বেঁধেছে। বাচ্চাও হয়েছে তাদের। উনি কিছুদিন আগে এসে ডিমগুলো দেখে গিয়েছিলেন—"

"নমস্কার।"—হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন রত্নপ্রভা।

বকুলবালা আর একটু ঘাড় হেঁট ক'রে আঁচলটা গায়ে আর একটু টেনে দিলেন।

"আসুন। আপনার যখন পাখী পোষার এত শখ, তখন আপনি তো আমাদের ঘরের লোক। এতদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া উচিত ছিল। আসুন।"

একটু দূরে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। শুধু দেখছিল নয়, উপভোগ করছিল। তার চোখ-মুখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, এই অপূর্ব মিলনের কৃতিত্বটা যেন তারই।

বকুলবালা নিম্নকণ্ঠে তাকে বললেন, "আমার ধনুকটা তুলে রাখ ভাল ক'রে। এখনি বাড়ি ফিরব আমরা। তুই পালাস নি যেন

"না।"

এই আদেশ দিয়ে গায়ের কাপড়-চোপড় আবার সামলে-সুমলে বকুলবালা রত্নপ্রভাকে অনুসরণ ক'রে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন।

রত্নপ্রভা চণ্ডীকে দেখিয়ে বললেন, "ওটি কে? ছেলে বুঝি?"

"না। আমার ছেলে হয় নি।"

হঠাৎ একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল। তিনটি নিঃসন্তান রমণীকে কেন্দ্র ক'রে একটা বিরাট শূন্যতা মূর্ত হয়ে উঠল যেন।

রত্নপ্রভাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

বললেন, "কি পাখী ভালবাসেন আপনি?"

"অনেক রকম ভাল পাখী পুষেছি আমি। টিয়া, চন্দনা, ময়না,

মুনিয়া। একটা হলদে পাখী পোষবার শখ, কিন্তু পাচ্ছি না যোগাড় করতে। একবার একটা পেয়েছিলাম, না খেয়ে ম'রে গেল। ইনি একটা যোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন, তাই এসেছিলাম খোঁজ করতে।"

"চেষ্টা করছি। বাচ্চা পেলেই আপনাকে খবর পাঠাব। আপনার চণ্ডী-গণশাও তো খোঁজে আছে।"—ডানা হেসে উত্তর দিলে।

গণশার নাম শোনামাত্র কিন্তু বকুলবালা ক্ষেপে গেলেন। রত্নপ্রভার খাতিরে যে ভব্যতাটুকু এতক্ষণ তিনি বজায় রেখেছিলেন তা আর টিকল না, চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল। ঘাড়ের ঝাঁকানিতে আঁচল স'রে গেল মাথা থেকে।

"গণশা মুখপোড়ার কাণ্ড শুনবেন? বলে কিনা—আমাকে একটা ভ ল ডিশ্ কনারি না কিনে দিলে হলদে পাখীর বাচ্চা পেলেও উড়িয়ে দেবে'তি আমি। মুখপোড়া আমাকে আবার মাসীমা ব'লে সোহাগ জানা তে আসে। অমন বোনপোকে ঝাঁটা মারি আমি।"

রত্নপ্রদিদি গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল আবার। এক নজরেই তিনি বকুলবালার স্বরূপ অনেকটা টের পেয়েছিলেন। গণশাকে ও তিনি চেনেন। গণশার মেশোমশাই এস্টেটের কর্মচারী ছিলে না।" দিন আগে মারা গেছেন, রত্নপ্রভাই পেনশন বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন তাঁর বিধবার জন্যে, জমিও দিয়েছেন কিছু। গণশা যে পয়সাশোনায় ভাল তাও তিনি জানেন। বকুলবালার কাছে গণেশের নূতন পরিচয় পেয়ে খুব মজা লাগল তাঁর।

ছদ্ম বিস্ময়ে বললেন, "এই কথা বলেছে গণশা?"

"আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চণ্ডীকে জিজ্ঞেস করুন। এই চণ্ডী দিকে আয়। গণশা তোকে কি বলেছিল বল্ তো এঁদের।"

কা থেমে থেমে ঢোক গিলে গিলে বকুলবালার কথা সমর্থন করতে না ক'রে উপায়ও ছিল না। কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর নাম এ

ভাবে কালিমালিপ্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল সে। তার ভয়ও করছিল। কথাটা গণশার কানে গেলে সে যে কি করবে, তা কল্পনা ক'রে হৃৎকম্প হচ্ছিল তার। হয়তো আচমকা নাকে একটা ঘুষিই বসিয়ে দেবে কোন্‌দিন।

বকুলবালা বললেন, "এরা ছুটোতে কম জ্বালায় আমাকে! ইনি জেদ ধ'রে ব'সে আছেন একটা এয়ার-গান্‌ কিনে দিতে হবে, উনি বলছেন ভাল ডিশ্‌কনারি চাই। আমি অত টাকা পাব কোথা? বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরিয়ে কতই বা জমানো যায়? ডিশ্‌কনারি জিনিসটা কি? কুড়ুল-টুড়ুল না কি—সাতজন্মে ও-কথা শুনি নি কখনও।"

ডানা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল। রত্নপ্রভা কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, "আপ এমন ভাবে জ্বালাতন করা খুব অন্যায় হয়েছে ওদের ' আমি ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি, আপনি হলদে পাখী এবার।"

"ধাড়ি পাখী চাই না কিন্তু, বাচ্চা দিতে হবে।"

"বেশ, তাই পাবেন—"

বকুলবালার চোখের দৃষ্টি ঝলমল ক'রে উঠল আনে চণ্ডীর দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলি তো। ' তোয়াক্কা করব না আমি।"

কথাবার্তা আরও হয়তো কিছুদূর অগ্রসর হ'ত, কি মল্লিকের আকস্মিক আবির্ভাবে তা চাপা প'ড়ে গেল। ব তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে দ্রুতপদে স'রে পড়লেন চণ্ডীকে সনাতন মল্লিক যা করলেন, তা আরও নাটকীয়। তিনি রত্ন পদপ্রান্তে দড়াম্‌ ক'রে শুয়ে প'ড়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন রত্নপ্রভা। উঠে স'রে [illegible]। কাপড়টা টেনে দিলেন একটু। মল্লিক সাশ্রুনেত্রে করজোড়ে

লাগলেন, "আপনি আমার মা, বাঁচান আমাকে, ছাপোষা মানুষ আমি, দয়া করুন আমার ওপর।"

"কি হয়েছে ?"

মল্লিক তখন জামার পকেট থেকে একটি ছোট চিঠি বার ক'রে রত্নপ্রভার হাতে দিলেন। পেন্সিলে লেখা ছোট চিঠি। এস. পি. লিখেছেন—

"মাসীমা, এই লোকটিই সেই দুষ্ট লোক, যার কথা আপনি আন্দাজ করেছিলেন একটু আগে। ইনিই আনন্দমোহনবাবুর নামে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন পুলিসকে। এঁর লেখা একখানা চিঠি আছে আমাদের কাছে। আনন্দমোহনবাবুর মত নিরীহ ভদ্রলোককে বিব্রত করার জন্যে এঁর শাস্তি হওয়া উচিত। আপনারা যদি এঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন, আমরা সাহায্য করতে পারি। তবে যদি ক্ষমা করেন, সে কথা স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার পর যাব। ইতি—অনিল"

রত্নপ্রভা চিঠিখানা প'ড়ে ডানাকে দিলেন সেটা। মল্লিক মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, "আনন্দমোহনবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না ক'রে কিছুই বলতে পারছি না আপনাকে এখন। তিনি যদি মামলা করতে চান মামলা হবে, যদি না করতে চান হবে না।"

"আপনি দয়া করলে—"

রত্নপ্রভা আর কোনও জবাব দিলেন না, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। ডানা তাঁর পিছু পিছু গেল।



কবি দিনের গাড়িতে ফিরছিলেন কলকাতা থেকে। অমরবাবু ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন পাখীদের

মাইগ্রেশন (Migration) সম্বন্ধে একটা নূতন বই। কবি অভিভূত হয়ে ব'সে ছিলেন। তাঁর অভিভূত ভাবটা একরঙা ছিল না অবশ্য, রঙ বদলাচ্ছিল। প্রথমে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন অমরবাবুর ব্যবহারে। কিছুতেই ছাড়লেন না ভদ্রলোক, জোর ক'রে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে দিলেন। বললেন, "কিছু বলা যায় না, একটু আরামে গেলে হয়তো আরও দু-চারটে ভাল ভাল কবিতা পাব আমরা। তার দাম এই টাকা কটার চেয়ে অনেক বেশী। একটু শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, একটু নির্জনতা না থাকলে ভাল ভাব আসতে পারে না। ভাল ভাবও পাখীর মত, গোলমাল দেখলেই স'রে পড়ে।"

কবি সত্যিই খুব আরাম বোধ করছিলেন। গাড়িতে নির্জনতাও ছিল, কিন্তু কোনও কবিতার ভাব মনে আসছিল না। তিনি তন্ময় হয়ে জানলা দিয়ে দেখছিলেন কেবল—দৃশ্যের পর দৃশ্য আসছে আর চ'লে যাচ্ছে, থামছে না কেউ। এ সব দৃশ্য আগে অনেকবার দেখেছেন, নূতন কিছু নয়, সবই চেনা; তবু মনে হচ্ছে ঠিক যেন চেনা নয়, ওদের মধ্যেই অচেনার রহস্য যেন মাখানো রয়েছে। টেলিগ্রাফের তারে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ফিঙেকে, নীলকণ্ঠকে, বাঁশপাতিকে, কাজলা পাখীকে (যার ইংরেজী নাম শ্রাইক—Shrike), বুলবুলিও দু-একটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—সবই চেনা; কিন্তু তবু মনে হচ্ছে একটু যেন অচেনার আমেজ আছে প্রত্যেকটির মধ্যে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তাঁর। মনে হ'ল, যা চেনা তা ফুরিয়ে যায়, তা ক্ষণভঙ্গুর, নিজের পরিচয়ের পসরা সে যখন উজাড় ক'রে দেয়, যখন নূতন-কিছু দেবার আর থাকে না, তখনই সে ম'রে যায়, অনেক সময় সে বুঝতেও পারে না যে তার মৃত্যু হয়েছে। অচেনার মধ্যে কিন্তু অসীম সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তা আমাদের প্রত্যাশার নব নব দাবি মিটিয়ে চলেছে চিরকাল, মেটাবার পরই আবার মৃত্যু হচ্ছে তারও, আসছে নূতন অচেনা নূতন সম্ভাবনা

নিয়ে, শুধু তাই নয়, আসছে ওই চেনাকে অবলম্বন ক'রেই। ভাবটা কবির মনে নানাভাবে প্রসারিত হতে লাগল মেঘের মত। তার পর ক্রমশ কবিতায় রূপান্তরিত হ'ল তা। খাতা কলম বার ক'রে অনেক ভেবে ভেবে তিনি লিখলেন—

হে অচেনা, কতবার চেনা তুমি হ'লে
কত রূপে এ জীবনে ; কত প্রসাধনে
দেখা দিলে রঙ্গমঞ্চে—শূন্যে জলে স্থলে,
জীবে-জড়ে, অন্ধকার অরণ্য-গহনে,
জনাকীর্ণ সমাজের হাসি-অশ্রু-জলে,
নিত্য-নবান্বিত করি জীর্ণ পুরাতনে
চিরকাল এ কি লীলা তব পলে পলে!

অচেনার অনন্যতা অবলুপ্ত হয়
পরিচয়-ঘর্ষণেতে, অপূর্ব পরশে
তারই মাঝে সঞ্চারিয়া নবীন বিস্ময়
সঞ্জীবিত কর তারে নব প্রাণ-রসে,
মৃত্যুর মুখেতে শুনি জীবনের জয়
ভীত প্রাণ উল্লসিয়া ওঠে যে হরষে,
মৃত্যু যেন এসে বলে—আমি মৃত্যুঞ্জয়।

কবিতাটা বার দুই পড়লেন, কেমন যেন তৃপ্তি হ'ল না। মনে হ'ল, যে ভাবটি মনে এসেছিল ঠিক সেটি ফোটাতে পারেন নি তিনি। ভাষা আর ছন্দকে বাঁচাতে গিয়ে ভাব মারা পড়েছে। বচনের ভিড়ে হারিয়ে গেছে অনির্বচনীয়। নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় ক্ষুণ্ণ হলেন। চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। একটা পুলের উপর গাড়ি উঠেছিল, শুভ্র সৈকতের মাঝখান দিয়ে শীর্ণস্রোতা

নদীটি বইছে। এখন গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে শুকিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ম'রে যায় নি। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে রেখেছে, দু কূল প্লাবিত ক'রে একদিন তা আত্মপ্রকাশ করবে। পুকুর হ'লে ম'রে যেত। এই চিন্তার সূত্র অনুসরণ ক'রে একটা দার্শনিক-লোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য। মনে হ'ল, নদীর উৎস উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে, তাই সে বেঁচে থাকে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপও তার জীবনধারাকে সম্পূর্ণ শুষ্ক করতে পারে না। মানুষের জীবনও একটা অদৃশ্য স্রোতের মত, তারও কি কোনও উৎস আছে কোনও উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে? ভগবানের কথা মনে হ'ল, অনেক-দিন-আগে-পড়া উপনিষদের কথা মনে পড়ল, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কোল থেকে বার্ড মাইগ্রেশনের বইটা প'ড়ে গেল, মর্ত্যলোকে নেবে এলেন আবার। বইটারই পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারপর পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে নূতন ভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন আবার। গ্রন্থকার লিখছেন* যে, কেবল যে পাখীরাই এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায় তা নয়। অনেক প্রাণীও যায়। জলচর, স্থলচর, উভচর, মাছ, কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি, এমন কি কাঁকড়ারা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে স্থান পরিবর্তন করে। আদিম মানবজাতিদের মধ্যে যারা নিজেদের আদিম স্বভাব এখনও রক্ষা করতে পেরেছে তারাও স্থাণু নয়, পরিভ্রমণশীল। এক স্থানে বেশীদিন থাকে না তারা, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে খাদ্যের সন্ধানে, শিকারের সন্ধানে, পালিত পশুদের জন্য মাছের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা। কালাহারি মরুভূমির বুশম্যানরা, সাইবেরিয়ার বল্গাহরিণ-শিকারীরা, মধ্য-এশিয়ার পশুপালকেরা নিয়মিতভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। আরব দেশে ভ্রাম্যমাণ রুওয়ালা (Ruwala) জাতির অস্তিত্ব এখনও আছে। সভ্য মানুষেরাও মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাতে না পারলে হাঁপিয়ে ওঠে।...পড়তে

* *Bird Migrants* by Eric Simms.

পড়তে কবির মনে হ'ল, 'মুক্তি' ব'লে যে অবস্থাটা আমরা কল্পনা করি, যার স্বপ্ন সাধুরা দেখেন, প্রতি জীবের মধ্যে এই স্থান-পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা কি সেই মুক্তি-আকাঙ্ক্ষারই আদিম রূপ না কি? যে কোনও পরিবেশেই আমরা বাস করি না কেন, কিছুদিন পরে সেই পরিবেশ যেন কারাগার মনে হয়। একঘেয়েমির কারাগার। তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণ ছটফট করে। তাই উত্তরমেরুর পাখী চ'লে আসে ভারতবর্ষের নদী-তীরে, আফ্রিকার হাতী গভীর অরণ্য ত্যাগ ক'রে অগভীর বনে বেড়াতে আসে, উরাল পর্বত বা কামস্কাট্‌কা থেকে চ'লে আসে হলদে খঞ্জনের দল ভারতবর্ষের মাঠে। কলকাতার সল্ট লেকে যে খঞ্জনগুলোকে দেখে এসেছেন, তাদের দোদুল্যমান পুচ্ছভঙ্গীর ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে, নূতন দেশে এসে তারা যেন আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। এই আনন্দই কি মুক্তির আনন্দের আভাস? সত্যিই কি এমন কোন পরিবেশ আছে যা কিছুদিন পরে কারাগার হয়ে ওঠে না, যেখানে নিত্য-নূতনের আবির্ভাব মনকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচাতে পারে? চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লম্বা হয়ে শুলেন। শুয়ে শুয়ে আবার পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে ঘুম এসে গেল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন এল। অদ্ভুত স্বপ্ন। ছেলেবেলার একটা দুপুর হঠাৎ যেন ফিরে এল স্বপ্নে। অতীতের একটা টুকরো সহসা মূর্ত হ'ল চৈতন্যলোকে। স্কুলের সঙ্গী ভূতোকে দেখতে পেলেন। হরিবাবুর বাগানের বেড়ার ধারে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা পেয়ারা। আনন্দবাবু তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ভূতো, তুই বেঁচে আছিস? আমি খবর পেয়েছিলাম তুই মারা গেছিস কলেরায়। ভূতো কোনও উত্তর দিলে না। মুচকি হেসে পেয়ারাটা দেখালে শুধু। বালক আনন্দমোহন যেন তাকে ধরতে গেলেন। সে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখিয়ে পেয়ারাটার

কামড় দিলে একটা। এই দেখে আনন্দমোহন ছোটার বেগ বাড়িয়ে দিলেন এবং হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলেন। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, ঘেমে গেছেন, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। সত্যিই যেন ছুটছিলেন। উঠে ব'সে ভাবতে লাগলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ ভূতোকে স্বপ্ন-দেখার মানে কি? ভূতোর কথা তিনি তো ভাবছিলেন না, তাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। ছেলেবেলার কথাও ভাবছিলেন না, তা হ'লে এ রকম স্বপ্ন দেখলেন কেন? হঠাৎ মনে হ'ল, এও এক রকম ভ্রমণ না কি? আমাদের মনও বোধ হয় ভ্রমণ করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে— কখনও স্বপ্নে, কখনও কল্পনায়। পাখীরা নূতন দেশে কিছুদিন থেকে যেমন পুরাতন জায়গায় ফিরে আসে, তাঁর মনও বোধ হয় বর্তমানের নূতন পরিবেশ থেকে ফিরে গিয়েছিল অতীতের পরিবেশে, হরিবাবুর বাগানের ধারে ভূতোর কাছে। বিজ্ঞান এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয়তো অন্য রকম করবে, কিন্তু কবি নিজের ব্যাখ্যাতে নিজেই তুষ্ট হলেন। অন্যমনস্ক হয়ে ভূতোর কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। ভূতো সত্যিই ইহলোকে নেই, কিন্তু সে বেঁচে আছে। অতীত নিগূঢ়ভাবে বেঁচে থাকে। সহসা আর একটা কথাও তাঁর মনে হ'ল, বর্তমানটা প্রবাস, অতীতই যেন স্বদেশ। এ চিন্তা কিন্তু আর বেশী দূর প্রসারিত হ'ল না তাঁর মনে, ট্রেন এসে একটা বড় জংশনে ঢুকল। কলকাতার পর এইটেই প্রথম বড় জংশন, অর্থাৎ বর্ধমান। ভিড় চীৎকার কোলাহল কলরব। একটা নূতন জগতে এসে হাজির হলেন যেন, একটা এঞ্জিন খুব জোরে হুইস্‌ল্‌ দিয়ে উঠল, মনে হ'ল যেন স্পর্ধিত হুঙ্কার ছাড়ছে কোনও অদৃশ্য আততায়ীকে উদ্দেশ ক'রে। কবি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন একবার, মনে হতে লাগল সহসা যেন কোন অপরিচিত বিদেশে এসে পড়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অপ্রত্যাশিত আর একটা ঘটনাও ঘটল একটু পরে। স্টেশনের হোটেলের এক

পোশাক-পরা চাপরাসী এসে জিজ্ঞাসা করলে, তিনিই আনন্দমোহন তরফদার কি না, কারণ হাওড়া থেকে তারে খবর এসেছে যে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী মিঃ তরফদারকে যেন খাবার দেওয়া হয়। অমরবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক এ জন্য হাওড়ায় টাকা জমা ক'রে দিয়েছেন। কবি অবাক হলেন, তাঁর খাওয়ার দরকার ছিল না তত। কিন্তু দাম যখন দেওয়া হয়ে গেছে, তখন না খেলে লোকসান। কথাটা অমরবাবুর কানে গেলে হয়তো···

···সাড়ম্বরে খাচ্ছিলেন তিনি। মাংসের ঝোলটা বেশ ভালই লাগছিল। ট্রেনে চ'ড়ে ঝড়ের বেগে যে নূতন পরিবেশে হঠাৎ তিনি হাজির হয়েছিলেন, সে পরিবেশের সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিছু আর বিসদৃশ লাগছিল না, মাংসের ঝোলটা খুব ভাল লাগছিল। আপন মনে নিবিষ্টচিত্তে তিনি খেয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা ঘটনা ঘটল।

"এ কি, তুমি এখানে ?"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, মন্দাকিনী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে তাঁর মামাতো শালা যজ্ঞেশ্বর। কবি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সহসা তাঁর মনে পড়ল, এই বর্ধমানের কাছেই তো তাঁর শ্বশুরবাড়ি। এই স্টেশনে নেবে গরুর গাড়ি ক'রে যেতে হয়। মন্দাকিনী এবং তাঁর মামাতো ভাই উঠে প্রণাম করলেন কবিকে।

কবি বললেন, "একটু দরকারে কলকাতা যেতে হয়েছিল। ফিরছি।" তারপর একটু থেমে একবার ঢোঁক গিলে বললেন, "তুমি আসছ তা তো জানাও নি, জানালে আমি—"

"আমি যে আসব তা কি নিজেই জানতাম ? রূপচাঁদবাবুর চিঠি পেয়ে আসতে হ'ল।"

মন্দাকিনীর চোখের দৃষ্টিতে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। কবি ভয় পেয়ে গেলেন একটু।

"ব্যাপার কি? কি লিখেছে রূপচাঁদ?"

"বলছি।"

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা শোনা গেল। মন্দাকিনী তাঁর মামাতো ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তোর তা হ'লে আর কষ্ট ক'রে যাওয়ার দরকার কি? টিকিট কিন্তু কাটা হয়ে গেছে, নয়?"

"টিকিট ফেরত নেবে।"

"তা হ'লে তোকে আর কষ্ট ক'রে যেতে হবে না। আমার টিকিট দিয়ে তুই না হয় ফিরে যা। আমার জিনিসপত্তরগুলো কোথা?"

"এনে দিচ্ছি—"

যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি নেবে গেল এবং পুঁটলি, ঝোলা, ঝুড়ি, তোরঙ্গ, বিছানার বাণ্ডিল প্রভৃতি নিয়ে এল। গুছিয়ে রেখে দিলে সব নিপুণভাবে। জামাইবাবু যে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন, এতে যেন সে বিশেষ একটা গৌরব বোধ করছিল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল তা।

গার্ডের হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল।

যজ্ঞেশ্বর একখানি ইণ্টার ক্লাস টিকিট সসম্ভ্রমে কবির হাতে দিয়ে বললে, "এই দিদির টিকিট। আমি 'ক্রু'কে ব'লে দিচ্ছি, চেঞ্জ ক'রে দেবে—"

হোটেলের খানসামা এসে প্লেট প্রভৃতি নিয়ে নেবে গেল। যজ্ঞেশ্বরও প্রণাম ক'রে নেবে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

কবি ও মন্দাকিনী পরস্পরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন।

বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে যা অহরহ ঘটছে কিন্তু যার সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই—ক্ষুদ্র পরিবেশে সেই ঘটনাটা কবির মনে

কৌতুক সঞ্চার করলে একটু। পৃথিবী যে সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটে চলেছে এবং যে কোনও মুহূর্তে যে সেটা চুরমার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনা জেনেও আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করছি—ঠিক এ কথাটা কবির মনে হ'ল না, কিন্তু দ্রুতবেগে ধাবমান ট্রেনের কামরায় সহসা জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়াতে এ কথাটা তাঁর মনে হ'ল যে, আমাদের প্রত্যাশাটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব'লে অপ্রত্যাশিতকে আমরা ভাল ক'রে সম্বর্ধনা করি না, মনে মনে তার জন্যে প্রস্তুত থাকি না। সে যখন আসে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পায়। মন্দাকিনী না এসে যদি একটা শ্যাওলা-ধরা কলসী জানলার ভিতর দিয়ে এসে হাজির হ'ত আর সেই কলসীর ভিতর থেকে দৈত্য না বেরিয়ে যদি মন্দাকিনী বেরিয়ে আসতেন এবং এসে বলতেন যে যাদুকর পি. সি. সরকারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি আমার গাড়িভাড়াটা বাঁচিয়ে দিলেন—তা হ'লেও কি এর চেয়ে বেশী বিস্ময়কর হ'ত কিছু? কবি লক্ষ্য করলেন মন্দাকিনীর গালে কপালে কালো কালো দাগ হয়েছে কিসের। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন মনে করলেন না। চুপ ক'রে চেয়েই রইলেন তাঁর মুখের দিকে। মন্দাকিনীও কোনও কথা বললেন না কয়েক মুহূর্ত। তিনি স্বামীর মুখের দিকে এক নজর চেয়েই সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। রূপচাঁদবাবু চিঠিতে যে সব ইঙ্গিত করেছিলেন তা যে মিথ্যা তা কবির মুখভাবের সূক্ষ্ম শুচিতা দেখেই বুঝেছিলেন তিনি। এই সূক্ষ্ম শুচিতার স্বরূপ আর কারও চোখে হয়তো ধরা পড়ত না, কিন্তু মন্দাকিনীর চোখে পড়ল, কারণ এই শুচিতাটুকুর ভিত্তির উপরই তাঁর সমগ্র দাম্পত্য জীবন গ'ড়ে উঠেছিল, সে ভিত্তির স্বরূপ তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না, তাতে এতটুকু চিড় খেলে আর কেউ না জানুক তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারতেন তা কোনও প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখেই। তবে একটা

কাণ্ড যে কিছু ঘটেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, আর খুব সম্ভবত ঘটেছে কবিরই নির্বুদ্ধিতার জন্য বা কোনও কিছু নিয়ে বাহাদুরি করতে গিয়ে—এ রকম ধরনের কাণ্ড তো একবার নয়, অনেকবার উনি করেছেন। একবার তো চাকরিটাই যেত আর একটু হ'লে। ছেলেরা করেছে স্ট্রাইক, ওঁর সর্দারি ক'রে তাদের দলে ভিড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু উনি ভিড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকাটা ক্রমশ যেন একটা সেতুর মত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সেতুর উপর দিয়ে মন্দাকিনী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে, কবির মনে হ'ল।

মন্দাকিনী এর পর যা বললেন, তা কিন্তু কবি প্রত্যাশা করেন নি।

"বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হয়েছে নিশ্চয়। ঠাকুরটা রাঁধে কেমন ?"

কবি তবু চুপ ক'রে রইলেন। অভিভূত হয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগলেন।

"রূপচাঁদের চিঠি পেয়ে আসছ তুমি। কি লিখেছে রূপচাঁদ ? আমাকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে চিঠি লেখবার মানে কি তা তো বুঝতে পারছি না।"

মন্দাকিনী যে প্রশ্ন করেছিলেন এটা ঠিক তার জবাব নয়। নিজেও তিনি বুঝতে পারছিলেন তা, কিন্তু যত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হোক সব চেয়ে দরকারী কথাটা তিনি যে ব্যক্ত করেছেন, করতে পেরেছেন, এইতেই তিনি যেন আরাম পেলেন একটু, সাহসও পেলেন।

মন্দাকিনীর উত্তর কিন্তু একটুও অপ্রাসঙ্গিক হ'ল না।

তিনি বললেন, "তিনি তোমার বন্ধু ব'লেই লিখেছিলেন। এসব কথা তোমারই উচিত ছিল আমাকে জানানো। তুমি দিনরাত ব'সে

ব'সে কবিতা লিখতে পার, কিন্তু আমাকে দু লাইন চিঠি লিখতে পার না! শঙ্করীকে চিঠি লিখেছিলে? না, তাও লেখ নি?"

মন্দাকিনীর কথার ধাঁচে সেই সাবেক সুর বেজে ওঠাতে আনন্দমোহন আর একটু সাহস পেলেন। সাহস পাবার আর একটা কারণও ছিল। যে সব অস্ত্র চালনা ক'রে মন্দাকিনী তাঁকে কাবু করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর মনে হ'ল, সে সব অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবার মত একটা অস্ত্র অন্তত তাঁর তূণে আছে। ব্যবহার করলেন সেটি।

"অতবড় জমিদারির ম্যানেজারি করতে করতে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাই না, চিঠি লিখব কখন? তার ওপর খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম একটা—"

এইবার মন্দাকিনী আকাশ থেকে পড়লেন এবং প'ড়েই নির্বাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। জমিদারির ম্যানেজারি? খুনের মামলা? এসব কি আবার! এসবের বিন্দুবিসর্গ তো তিনি জানেন না! রূপচাঁদবাবুও তো লেখেন নি কিছু! তিনি কেবল লিখেছেন—'আপনি চ'লে আসুন, আনন্দমোহন কাছা-খোলা লোক, আপনি না থাকাতে নানা ভাবে ও নানা রকম কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াচ্ছে, ওকে একদিন থানায় পর্যন্ত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, অনেক তদ্বির ক'রে জেল থেকে উদ্ধার করেছি আমরা; একটা মেয়েমানুষের নামের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে যা-তা রটাচ্ছে লোকে।' জমিদারির কথা তো লেখেন নি কিছু!

তাঁর বাক্‌শক্তি যখন ফিরে পেলেন তখন প্রশ্ন করলেন, "কার জমিদারির ম্যানেজারি করছ তুমি?"

"অমরেশবাবুর। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি গেছে। আমিই এখন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার।"

"কি রকম?"

মন্দাকিনীর মুখভাব দেখে কবি খুশী হলেন। এই সংবাদ-

বোমাটি যে মন্দাকিনীর সমস্ত বিরুদ্ধতাকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবে এ তিনি জানতেন। কিছুদিন পূর্বে মল্লিক-গৃহিণী মন্দাকিনীকে তাচ্ছিল্যভরে কি একটা বলেছিলেন যার থেকে মন্দাকিনীর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, উনি ম্যানেজারের বউ ব'লেই এ ধরনের কথা বলতে সাহস করেছেন। কিন্তু এ ধারণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, চাকা ঘুরে যেতে পারে এবং তিনিই একদিন ম্যানেজারের বউ হয়ে যেতে পারেন। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—এ কথা স্বকর্ণে শুনেও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কবিকে নানা রকম প্রশ্ন ক'রে নানা ভাবে কুরে-কুরে সম্পূর্ণ খবরটি তিনি যখন জানলেন, বিশেষত যখন টের পেলেন যে এর জন্যে বেশ মোটা মাইনেও পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যে হাজার টাকা পাওয়াও গেছে, তখন তিনি উথলে উঠলেন। তাঁর এই উথলে-ওঠা অবস্থা দেখেও কবি কিন্তু আর একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন মনে মনে। শঙ্করীকে, মানে তাঁর মেয়েকে সত্যিই এখনও চিঠি লেখা হয় নি। সেই প্রসঙ্গটা যদি হঠাৎ উঠে পড়ে তা হ'লে কি জবাব দেবেন তিনি! মরীয়া হয়ে ঠিক করলেন, নিজেই প্রসঙ্গটা তুলবেন। বললেন, "ফিরে গিয়েই তোমাকে খবরটা দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতা ছুটতে হয়েছিল। শঙ্করীকে পর্যন্ত চিঠি লিখতে পারি নি এখনও। ওই খুনের মকদ্দমাটায় এমন জড়িয়ে ফেলেছিল আমাকে—আমার বিশ্বাস মল্লিক আছে এর ভেতরে।"

দেখা গেল মন্দাকিনীর প্রত্যয় আরও দৃঢ়।

তিনি বললেন, "নিশ্চয় আছে।"

একটা বড় স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

মন্দাকিনী একটা ফেরিওলাকে দেখে বললেন, "আমার জন্যে কিছু ফল কেনো তো, আজ আমার ষষ্ঠীর উপোস।"

কবি তাড়াতাড়ি ফল কিনতে লাগলেন।

১২

কবি যথাসময় এসে পৌঁছেছিলেন ঠিক, কিন্তু ডানার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। কবি ব্যস্ত ছিলেন মন্দাকিনীকে নিয়ে—ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ডানাকেও ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমত, চিড়িয়াখানার পাখীগুলোকে নিয়ে, আবার দু-চারটে পাখী ম'রে গিয়েছিল, সে জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। দ্বিতীয়ত, রূপচাঁদবাবু আবার বিব্রত করছিলেন তাকে। আগ্নেয়গিরিশিখর থেকে আবার ধূমোদ্‌গিরণ শুরু হয়েছিল। কবি টেলিগ্রাম পেয়ে যেদিন কলকাতা চ'লে গেলেন, সেই দিন রাত্রেই রূপচাঁদবাবু এসেছিলেন। অনেক রাত্রে। ডানা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোয় নি, বই পড়ছিল। রূপচাঁদবাবুর ডাকাডাকিতে উঠে আসতে হ'ল। তাকে দেখেই রূপচাঁদবাবু হাত দুটি জোড় ক'রে বললেন, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তুমি না ডাকলে আর আসব না। কিন্তু আসতে হ'ল, তোমার জন্যেই আসতে হ'ল। একটু আগে তোমার চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসছিলাম—মনে হ'ল, তোমার চিড়িয়াখানায় সাপ ঢুকেছে। পাখীগুলো খুব চেঁচামেচি করছে। ফোঁস ফোঁস শব্দও পেলাম দু-একবার। মালীটার কি রাত্রে ওখানে শোবার কথা? ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পেলাম না কারও, তাই ভাবলাম তোমাকে অন্তত খবরটা দিয়ে যাই।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সপ্রতিভভাবে বললে, "ও। কি করা যায় তা হ'লে বলুন তো? মুন্সীর ওখানে শোবার কথা। ঘর রয়েছে তার—"

"আমি তো ডেকে সাড়া পেলাম না কারও। তুমি যদি যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি—ও, বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে না তা মনে ছিল না।"

"আমি গিয়েই বা কি করব? সাপ মারা তো আমার সাধ্যে কুলবে না। আচ্ছা, আমি দেউড়িতে খবর পাঠাচ্ছি, সুখন পাঁড়ে যা পারে করুক।"

"বেশ, আমি চললাম তা হ'লে।"

রূপচাঁদ চ'লে গেলেন কিছুদূর। তারপর ফিরে এলেন আবার। এসে যা বললেন, তা অপ্রত্যাশিত নয়, ওই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিল ডানা।

"সেদিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যে কাজটা ক'রে ফেলেছি, তার জন্যে এখনও কি ক্ষমা কর নি আমাকে? ভগবানও শুনেছি পাপীকে ক্ষমা করেন, তুমি কি তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর?"

প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলা চলত, কিন্তু ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর তিনিও ভিতরে উঠে গেলেন।

বললেন, "ডানা, এমন অবুঝের মত ব্যবহার তোমার কাছে আশা করি নি। তুমি সত্যিই যদি আমার নিতান্ত স্বাভাবিক আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাক, স্পষ্ট ভাষায় সেটা জানিয়ে দিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। তোমার এই সঙ্কোচ দেখে আমার আশা হচ্ছে যে, আমার সেদিনকার ব্যবহারে সত্যিই হয়তো তুমি তত রাগ কর নি।"

এর উত্তরে ডানা যে কথা যে সুরে বললে, তা তার নিজের কানেই অত্যন্ত নরম শোনাল। সে বলতে চাইছিল, 'এই মুহূর্তে আপনি বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে' বা ওই ধরনের একটা রূঢ় কিছু। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনুনয়ের সুর—"কেন আপনি আমাকে এ ভাবে জ্বালাতন করছেন রূপচাঁদবাবু?"

"এটাকে জ্বালাতন মনে করছ কেন তুমি? অভিনন্দন এটা, পুরুষের অকৃত্রিম অভিনন্দন প্রকৃতির উদ্দেশে। আচ্ছা, সত্যিই তুমি বিরক্ত হয়েছ?"

"আমার সেদিনের আচরণ থেকে তা কি স্পষ্ট হয় নি ?"

"না। সেদিন তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়াটা অনেক সময় আমন্ত্রণেরই নামান্তর। পুরুষের শক্তি বা আগ্রহকে মাপবার মাপকাঠি ওটা অনেক সময়ে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তোমরা অনেক সময় ব্যবহার কর ওটা—বড় বড় প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেন।"

"আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের বিচার প্রাণীদের নিয়ম দিয়ে হয় না। প্রাণীরা প্রকৃতির কারাগারে বদ্ধ জীব। মানুষ সে কারাগার ভেঙেই মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে। কামনার দাসত্ব করা প্রাণীদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, মানুষের পক্ষে নয়। অন্তত আমার পক্ষে নয়।"

"আমাকে কি তা হ'লে তুমি অমানুষ ব'লে মনে কর ?"

"আপনার স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা আমি কোনদিন করি নি। করবার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। এইটুকু শুধু বুঝেছি, আপনি যে পথে চলতে চান সে পথে আমি চলতে চাই না। সম্ভবত আপনার স্ত্রীও চান না।"

কথাটা ব'লেই ডানার মনে পড়ল, বকুলবালা মানা ক'রে দিয়েছিল রূপচাঁদবাবুকে তার কথা বলতে।

"আমার স্ত্রীর কথা জানলে কি ক'রে তুমি ?

"শুনেছি।"

"কি শুনেছ ?"

"শুনেছি তিনি সতী।"

"কে বললে তোমাকে ?"

"ঠিক মনে নেই। আশা করি সংবাদটা মিথ্যে নয়।"

"কিন্তু তিনি আমার পথে চলতে চান না—এ খবরটা তো তাঁর কাছ থেকে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এ খবরটা পেলে কোথা ?"

"ওটা আমার অনুমান। আর খুব সম্ভবত সত্য অনুমান। তিনি সত্যই যদি সতী হন, তা হ'লে আপনার পথে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।"

রূপচাঁদ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"এ দেশের সতী স্ত্রীরা স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্যে সব কিছু করতে পারে। সতী স্ত্রী পঙ্গু স্বামীর লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে তাকে কাঁধে ক'রে বেশ্যা-বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে এসেছে—এ গল্পও প্রচলিত আছে এ দেশে।"

"হয়তো আছে। কিন্তু ও-গল্পের মূলে আর একটা জিনিস আছে, সেটাকে উপেক্ষা করবেন না। ওতে স্বামীর অকপটতাও প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর লালসার কথা স্ত্রীর কাছে, শিশু যেমন মায়ের কাছে অকপটে ব্যক্ত করে তার সন্দেশলোলুপতা। লুব্ধ অসহায় পঙ্গু স্বামীর তুচ্ছ সাধ মেটাবার জন্যে হয়তো করুণাময়ী সতী স্ত্রী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ্যালয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার আচরণের মিল কোথায়? আপনি কি আপনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন আপনার স্ত্রীর কাছে? আমার বিশ্বাস, করেন নি। আপনি যা করেছেন, তা চোরের মত করছেন। আপনার লোলুপতায় শিশুর সারল্য নেই, আছে অতি জঘন্য ভণ্ডামি। যান, বাড়ি যান। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

রূপচাঁদ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো শ্বাপদের চোখের মত জ্বলতে লাগল। নাসারন্ধ্রযুগল বিস্ফারিত হ'ল একটু। কিন্তু যে কথাগুলি তিনি বললেন, তাতে উষ্মার আভাস পাওয়া গেল না।

"তুমি আমার নিখুঁত ছবি এঁকেছ; তোমার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করছি। কিন্তু একটু খটকা লাগছে। তুমি আমাকে এতটাই যদি

বুঝেছ তা হ'লে আমাকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছ কেন, আর প্রশ্রয়ই যদি দিয়েছ তা হ'লে মাঝপথে থামছই বা কেন ?"

"আমি আপনার কথার উত্তর দেব না। আপনি বাড়ি যান।"

ঠিক এই সময়ে চাকরটা না এসে পড়লে কি হ'ত বলা শক্ত। চাকরটার আগমনে রূপচাঁদ বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু, সে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

"মাইজী, মুন্সী এসেছে।"

"এতক্ষণে তা হ'লে ঘুম ভেঙেছে যাদুর। আচ্ছা, আমি চললাম। আবার আসব পরে—"

রূপচাঁদ বেরিয়ে গেলেন।

মুন্সী এগিয়ে এসে সেলাম ক'রে প্রশ্ন করলে, মাইজী কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

"আমি তো ডেকে পাঠাই নি।"

"রূপচাঁদবাবুই তো একটু আগে ডাকছিলেন আমাকে। আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম তিনি এই দিকেই আসছেন, তাই মনে হ'ল আপনিই বোধ হয় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"না, আমি ডাকি নি। রূপচাঁদবাবু চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসতে আসতে শুনেছিলেন যে, পাখীগুলো চীৎকার করছে, সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজও পেয়েছিলেন তিনি, তাই তোমাকে ডাকছিলেন। চিড়িয়াখানার সব ঠিক আছে তো ?"

"ঠিক আছে। অনেক পাখী তো রাত বারোটার সময় রোজই ডেকে ওঠে। সাপের আওয়াজ তো পাই নি। অমন ঘন জালের বেড়ার মধ্যে সাপ ঢুকবেই বা কি ক'রে ?"

"তুমি চিড়িয়াখানার চারিদিকে ফিনাইল ব্লিচিং পাউডার দাও তো ?"

"রোজ দু বেলা দি মাইজী।"

"নতুন যে প্যাঁচাটাকে আজ এনেছ, সেটা খেয়েছে কিছু ?"

"একটা ইঁদুর খেয়েছে।"

"আচ্ছা, যাও তুমি। আমি কাল সকালে যাব।"

মুন্সী চ'লে গেল, চাকরটাও শুতে গেল নিজের ঘরে।

ডানা বিছানায় শুয়ে আবার আগের মতন পড়তে শুরু করল।

ভাবতে চেষ্টা করল, যেন কিছু হয় নি। রত্নপ্রভার কথাগুলো মনে পড়ল—ও কিছু নয়, সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়, ওতে ভয় পেয়ো না। ডানা ভয় পায় নি। কিন্তু এটা সে ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছিল যে, রূপচাঁদ-সমস্যার একটা ভদ্র সমাধান করতে না পারলে তাকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ক'রে যাবে কোথায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে? খুঁজলে হয়তো আশ্রয় কোথাও মিলবে, কিন্তু তার জন্যে যে প্রাথমিক প্রয়াস প্রয়োজন তা করবার শক্তি তার আছে কি? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেকগুলো দরখাস্ত সে করেছিল। সন্তোষজনক কোনও জবাব আসে নি। দু-এক জায়গা থেকে ইণ্টারভিউ করবার জন্যে ডেকেছিল, কিন্তু ডানা যায় নি। তার মনে হয়েছিল, চাকরিই যদি করতে হয় তা হ'লে এর চেয়ে ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না আপাতত। অমরেশবাবু বা রত্নাপ্রভাকে মনিব ব'লে মনে হয় না কখনও, তাঁরা যেন আত্মীয়। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গেল ডানা একটু। নিজের ভবিষ্যতের কথা এমন ভাবে কেন ভাবছে সে? এ ভাবনার কোনও কূল-কিনারা তো নেই। সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন—"কাজ কর, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রো না। নির্বিকার হয়ে যদি কাজ করতে পার, তা হ'লে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে। আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি, এ কাজটা ভাল, ও কাজটা মন্দ, কাজ করবার বদলে আমি এ চাই ও চাই—এই সব অহংচিন্তাকে যদি প্রশ্রয় দাও, তা হ'লে দুঃখের শেষ থাকবে না। এ কথা নূতন নয়, চির পুরাতন। কিন্তু পুরাতন ব'লেই পরিত্যাজ্য নয়, দুঃখ থেকে মুক্তি

পাবার ওটা একটা পরীক্ষিত পথ।”...ডানা ভাবতে লাগল, নির্বিকার হয়ে কাজ করা কি সম্ভব? আমি কাজ করব অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা করব না—এই বা কেমন ধারা কথা? ভাল কাজ, মন্দ কাজ—দুইই সমান ব'লে মনে করা যায় কি। তা হ'লে ওই কামুক রূপচাঁদের বাহুপাশে ধরা দেওয়া আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করায় কোন তফাত নেই? ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর যুক্তি হয়তো ঠিক অনুসরণ করতে পারে নি সে। কাল গিয়ে পুরাতন প্রসঙ্গটা আবার একবার তুলতে হবে। সন্ন্যাসীকে ধরাই কিন্তু শক্ত। প্রায়ই তো বাসায় থাকেন না। ডানা বইটাতে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলে আবার। বিলেতের এক স্কুলের হেডমাস্টার মিস্টার প্যাট্রিজ (E. H. Patridge) লিখেছেন বইখানা। এ বইটাতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, ভারতবাসীর পক্ষে তা খুব নূতন কথা নয়। বর্তমান যুগের যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব ও-দেশের মানুষকে প্রকৃতির কাছ থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন করেছে, আমাদের দেশে এখনও ততটা করে নি, কারণ আমাদের দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব এখনও তেমন প্রবল হয় নি, যদিও আমরা কামনা করছি—প্রবল হোক। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর। প্যাট্রিজ সাহেব বলছেন যে, যদিও বর্তমান যুগের টেকনিক্যাল শিক্ষাকে উপহাস করা বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তা করতে যাওয়া যুক্তিযুক্তও নয়; কিন্তু তবু এ কথা ভুললে চলবে না, টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে অতি-প্রবণতা আমাদের ক্রমশ অমানুষ ক'রে ফেলেছে—আমাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল করছে, আমরা আদর্শ পিতা-মাতা হতে পারছি না, আদর্শ ভাই-বোন হতে পারছি না, আদর্শ বন্ধু-আত্মীয় হতে পারছি না, আদর্শ দেশসেবকও হতে পারছি না। ওসব হতে হ'লে বুদ্ধিবলের চেয়ে চরিত্রবল থাকা বেশী দরকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা আমাদের স্বার্থ-বুদ্ধিতেই শান দিচ্ছে

কেবল, স্বার্থপর ক'রে তুলছে আমাদের। আমরা এর ফলে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছি, জীবনটাকে ভাল ক'রে ভোগও করতে পারছি না। টাকা রোজগার করছি কিন্তু সুখী হচ্ছি না, জীবনটাই ক্রমশ যেন বিস্বাদ হয়ে আসছে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ-রস থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা। এমন অবস্থা হয়েছে, যাঁরা বয়স্ক তাঁরা জীবনের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে চান না, ভয় পান। যারা শিশু বা কিশোর-কিশোরী তারা এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। সুতরাং প্যাট্রিজ সাহেবের অভিমত, নানা ছুতোয় প্রকৃতির সংস্পর্শ লাভ কর। আমরা এই যে একপেশে জীবন যাপন করছি, এ জীবন অসম্পূর্ণ, তাই আমরা অসুখী। ডানার মনে হ'ল, প্যাট্রিজ সাহেবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ জীবনের যে শিক্ষা আমাদের দেবে, তাও কি আমাদের কাম্য? প্রকৃতিলালিত বর্বর মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে, তারা প্রকৃতিকে চেনে, প্রকৃতির ভাষা বোঝে, তার প্রতিটি ইঙ্গিতের অর্থ তাদের নখদর্পণে, আমরা কি তাই হতে চাই? প্যাট্রিজ সাহেব তা চান না, কিন্তু তিনি প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চান। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ডানা। ভারতবর্ষের দর্শনেও প্রকৃতির উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসী সেদিন বলেছিলেন, প্রকৃতি অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়, সত্ত্ব রজ তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। ঠিক বুঝতে পারে নি কথাটা। আর একদিন গিয়ে বুঝে নিতে হবে। বইটা আবার পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু আর ভাল লাগল না। আলো নিবিয়ে পাশ ফিরে শুল। সন্ন্যাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল কেবল। স্বপ্নেও দেখা দিলেন সন্ন্যাসী।

খুব ভোরেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল ডানার। তখনও অন্ধকার কাটে নি। উঠে বসল সে বিছানার উপর। ব'সেই মনে হ'ল, শরীরের ক্লান্তি একটুও দূর হয় নি। সমস্ত রাত সে কেবল চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে ছিল, সত্যিকার ঘুম আসে নি। একটা

অস্বস্তি সারা মন জুড়ে রয়েছে। ঘরের ভিতর সাপ ঢুকেছে খবর পেলে যে ধরনের অস্বস্তি হয় অনেকটা তেমনি। রূপচাঁদই কি এর একমাত্র কারণ? না, অন্য কিছু? চিড়িয়াখানার বন্দী পাখীগুলো? তাদের অসহায় অবস্থা গোড়া থেকেই পীড়া দিচ্ছে তাকে। পাখীগুলোকে দেখে মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের কথা মনে পড়ে, যাদের বিরুদ্ধে কোনও দোষ প্রমাণ করা যায় নি, এমন কি যাদের বিচারালয়ে বিচার পর্যন্ত হয় নি, তাদের চেয়েও নিরপরাধ এই পাখীগুলো। একটা বড়লোকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে আর তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার পাহারাদার। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাকে এই নিষ্ঠুর কর্ম বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে ব'লেই কি এই অস্বস্তি? আবার তার মনে হ'ল, তার নিজের টাকা যদি থাকত কিছু, তা হ'লে সে বোধ হয় এমন অশান্তি ভোগ করত না। নির্ভরযোগ্য কোন নিজের লোকও যদি থাকত কেউ!...হঠাৎ একযোগে সমস্ত পাখীগুলো ডেকে উঠল। ফরসা হয়ে এল বোধ হয়। ঘোর গ্রীষ্মেও সে সাহস ক'রে জানলা খুলে শুতে পারত না। দু-একদিন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। শুধু রূপচাঁদের ভয় নয়, সে ভয়ও অবশ্য ছিল খুব, কিন্তু অন্য ভয়ও ছিল—বিশেষ ক'রে সাপের ভয়। গঙ্গার ধারে প্রায়ই বড় বড় সাপ বের হয়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল সে। চাকরটাকে উঠিয়ে দিলে চা করবার জন্য। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখলে যে, অত ভোরেও একটা দোয়েল এসে নদীর ধারে পোঁতা উঁচু বাঁশের ডগাটার উপর ব'সে পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে গান শুরু ক'রে দিয়েছে। পূর্বাকাশ উষারাগরঞ্জিত। মনে হ'ল, ও যেন পাখী নয়, বৈদিক যুগের কোনও ঋষি, উষাদেবীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছে স্বতঃ-উৎসারিত সঙ্গীতের মন্ত্র দিয়ে। বহু উষাকে অনুসরণ ক'রে যে নূতন উষা আজ এসেছে, অনন্তের যাত্রাপথে চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্য যে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর

পূর্বতোরণে, তার সম্বন্ধে আর সবাই উদাসীন, কিন্তু ওই দোয়েল নয়। অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। সমস্ত পৃথিবীর হয়ে ওই ক্ষুদ্র পাখীটি যে কর্তব্য পালন করছে, তার জন্য তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু একটু পরেই তাকে চমকে উঠতে হ'ল আর একটা পাখীর ডাকে, যেন সুরের ছোট্ট তুবড়ি ছুটিয়ে উড়ে চ'লে গেল একটা টুনটুনি পাখী। তার পরই পাশের পুটুস ফুলের ঝোপটাতে টিক-টিক-টিক শব্দ ক'রে খুব ছোট একটা পাখী তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। দরজি পাখী কি? বেশীক্ষণ ভাববার অবসর কিন্তু পেলে না, এক জোড়া ঘুঘু তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে। পাশাপাশি এসে বসল তারা অশ্বত্থগাছের কাঠের বাক্সটার উপর। এই বাক্সটা অমরেশবাবু টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যদি কোনও পাখী ওতে বাসা বাঁধে এই আশায়। কোনও পাখী এখনও পর্যন্ত বাঁধে নি। ঘুঘু পাখী দুটোকে বসতে দেখে ডানার একটু আশা হ'ল, বাসা বাঁধবে কি ওরা? পর-মুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল পাখী দুটো। উড়ে অনেক দূর চ'লে গেল। অনেক গাছে অনেক বাক্স টাঙিয়ে দিয়ে গেছেন অমরেশবাবু—অনেক রকম আকারের বাক্স, কিন্তু এক ওই তালগাছে-টাঙানো বাক্সটায় ছাড়া অন্য কোনও বাক্সে কোনও পাখী বাসা বাঁধে নি। মানুষকে পাখীরা এখনও তত বিশ্বাস করে না। ওই বাক্সগুলোকে তারা ফাঁদ ভাবছে। বাক্সগুলোর অভিনবত্ব যখন লোপ পাবে, পুরনো হয়ে যাবে ওগুলো যখন, প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যাবে, তখন হয়তো ওগুলোতে বাসা বাঁধবে পাখীরা। অভিনবত্বকে ওরা ভয় করে, অভিজ্ঞতার ধোপে না টিকলে ওরা কোনও জিনিসকে গ্রহণ করে না। মানুষের মত দ্রুত আধুনিক হওয়ার দিকে ওদের প্রবণতা কম। অনেক বিদেশী বিজ্ঞানী পাখীদের আধুনিক ক'রে তোলবার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য বৈঠকখানা বাসা প্রভৃতি বানিয়ে দিচ্ছেন, এক ভদ্রমহিলার

টাইপ-রাইটারের উপর ছোট্ট একটি পাখীর ছবিও সে একবার দেখেছিল অমরেশবাবুর একখানা বইয়ে ; কিন্তু ওই বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন যে, পাখীদের বিশ্বাস উৎপাদন করানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ডানার এ চিন্তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পেল না একদল শালিকের চীৎকারে। একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে হ'ল, শালিকগুলো চেঁচাচ্ছে কেন। দেখল, একটা নেউল বেরিয়েছে। তাকে দেখেই নেউলটা ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে। তার পরই চোখে পড়ল, সন্ন্যাসী চর থেকে ফিরছেন। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মনটা অস্বস্তিতে ভ'রে উঠল আবার। যতক্ষণ পাখীদের নিয়ে মন নিযুক্ত ছিল ততক্ষণ নিজেকে সে ভুলে ছিল, সন্ন্যাসীকে দেখেই নিজের কথা মনে হ'ল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল সন্ন্যাসীর উপর একটু অভিমান তার মনের প্রত্যন্তলোকে সঞ্চিত হয়েছে। আবিষ্কার ক'রে সে একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল নিজের কাছেই। সন্ন্যাসী তো তার সঙ্গে কোনদিন কোনও অভদ্র ব্যবহার করেন নি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু, কোনও দাবিই তো নেই, তবে অভিমান কেন? অভিমানকে প্রশ্রয় দেবার জন্য সামান্য একটু প্রেমের সম্পর্ক থাকা দরকার—তা সে সম্পর্ক যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেটুকু সম্পর্কও তো তার হয় নি। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে হয়তো হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী সে ইচ্ছা করেন নি। বরং বিপরীত ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন তিনি, নারীসঙ্গ তিনি পরিহার করতে চান। ডানার মনে হ'ল, এই জন্যই অভিমান হয়েছে তার। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মনে মনে সে কি যেন একটা প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক যে কি সে সম্বন্ধে যদিও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার, কিন্তু প্রত্যাশা একটা ছিল মনে মনে, এখনও আছে। সে যেন মনে মনে নির্ভর ক'রে আছে ওই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটির উপর, তার নিভৃত অন্তরবাসী সত্তাটির দৃঢ় প্রত্যয়—ওই লোকটিই সত্য পথের সন্ধান পেয়েছেন, ইচ্ছে করলে

তারও সমস্যার সমাধান করতে পারেন, কিন্তু করছেন না। এই জন্যই অভিমান হয়েছে বোধ হয়। আর একটা কারণও সম্ভবত আছে, যদিও সেটা নিজের কাছে এতদিন স্বীকার করতে বেধেছে তার। কিন্তু প্রশান্ত প্রভাত-আলোকে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। সে বুঝতে পারল যে, তার অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লেই রাগ হয়েছে; এও সে বুঝতে পারল সন্ন্যাসীর দুর্দমনীয় সংযমকেও তার নারী-প্রকৃতি সুচক্ষে দেখছে না, মনে হচ্ছে ওটা একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বা পরিখা যা তাকে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। মনে পড়ল আর একটা ভোরের কথা। সে দিন সে রূপচাঁদের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সন্ন্যাসীর ওই ভাঙা ঘরটাতে। সন্ন্যাসী ঘরে ছিলেন না, একটু পরে ফিরে এসে যা যা বলেছিলেন তা এখনও মনে আছে তার। একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে—"পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ব নেই। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হ'ল।" সে তো সবার কাছ থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এমন কি ওই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেও। কে কি বলবে, পাছে সন্ন্যাসী কিছু মনে করেন, এই সব ভেবে সে সন্ন্যাসীর সঙ্গ এড়িয়ে এসেছে, ইচ্ছে থাকলেও যায় নি তাঁর কাছে। ইচ্ছে করলে সে কি ঘনিষ্ঠ হতে পারত না? তার ঘনিষ্ঠতা কি উপেক্ষা করতে পারতেন উনি? তার যে আকর্ষণী শক্তি আছে এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে সে জীবনে। অমরেশবাবু, আনন্দবাবুর মত লোকও আকৃষ্ট হয়েছেন তার প্রতি। রূপচাঁদ তো হয়েইছেন।...হঠাৎ অনেক দিন পরে আবার মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরী আর ভাস্কর বসুর কথা। এরা দুজনেও আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুকে তার নিজেরও ভাল লেগেছিল। জাপানীরা বোমা ফেলে যদি রেঙ্গুন বিধ্বস্ত ক'রে না দিত, তা হ'লে হয়তো ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত। কথাবার্তা তো প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে। সৌম্যদর্শন ভাস্কর বসুর মুখটা মনের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। কোথায় আছে এখন সে? বেঁচে আছে কি? তার মন কিন্তু ভাস্কর বসুকে নিয়ে, অতীতকে নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে চাইল না, সন্ন্যাসীই এসে মনটা জুড়ে বসলেন আবার। সন্ন্যাসী ক্রমশ এগিয়ে আসছিলেন তার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল ভূমিতে। তাঁর ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি ডানার অহঙ্কারকে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল যেন। ডানা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিল, উনি চোখ তুলে চাইবেন এবং তাকে দেখে মৃদু হেসে বলবেন কিছু। কিন্তু উনি সে সব কিছুই করলেন না, ওঁর বাইরে যে একটা জগৎ আছে সে জগতের সম্বন্ধে উনি যেন সচেতনই নন মনে হ'ল। নিজের ভাঙা ঘরের মধ্যে যখন তিনি ঢুকে পড়লেন, তখনও ডানা দাঁড়িয়ে রইল। তারও চোখে বাইরের পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, সমস্ত অন্তর সন্ন্যাসীময় হয়ে গিয়েছিল। চাকরটার ডাকে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল।

"চা ভিজিয়ে দিয়েছি মা, আপনি আসুন।"

"ভিজিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি ভেজাতে গেলে কেন? আমাকে ডাকলেই পারতে। ভেজাবার আগে টী-পট্‌টা গরম জলে ধুয়ে নিয়েছিলে তো?"

"নিয়েছিলাম। ভরতি ভরতি দু চামচ চা দিয়েছি।"

"দুধটা গরম করেছ?"

"করেছি।"

নিরর্থক জেনেও চাকরের সঙ্গে উপরোক্ত আলাপ সে করল নিজেকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকবার বাসনায়। কিছুতেই সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না, কি করলে সে আর পাঁচজনের মত বেশ সহজ হতে পারবে। ত্রিশঙ্কুর মত

কতদিন আর সে কাটাবে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে? চা খেতে খেতে সে ঠিক করলে, ওই সন্ন্যাসীর কাছেই সে পরামর্শ চাইবে আর একবার গিয়ে। তাঁকে গিয়ে বলবে, আপনি দয়া ক'রে আমাকে একটা সহজ পথ ব'লে দিন। আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশ অত্যন্ত ধোঁয়াটে মনে হয়, ঠিক বুঝতে পারি না। যতটুকু পারি ততটুকুও অনুসরণ করতে পারি না। কখনও মনে হয় হাস্যকর, কখনও মনে হয় অসম্ভব। সেদিন উঞ্ছবৃত্তির কথা বলছিলেন, এ যুগে ব্যাপারটা কি বেমানান নয়? মনে মনে সন্ন্যাসীকে সামনে বসিয়ে মনে মনেই কথাগুলো বললে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। কি ছুতোয় সে যাবে তাঁর কাছে? তাঁর দিক থেকে আমন্ত্রণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও তো সে পায় নি কোনদিন। এমন ভাবে যাওয়াটা কি শোভন? কথাটা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে না গিয়ে পারে নি। এর কারণ সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, তাঁর সান্নিধ্যে এমন একটা কি জিনিস আছে যা অনির্বচনীয়, যার অপরূপত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সন্ন্যাসীর কাছে নিজের সমস্যার কথা সে তো পেড়েছিল কয়েক দিন আগে, সন্ন্যাসী বিরক্ত হন নি। বলেছিলেন, যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে ভাবনাকে একটা বিশেষ পথ অনুসরণ করতে হবে। সেই পথের কথাই জিজ্ঞাসা করবে এবার গিয়ে। একটা নির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হয়ে তার মন যেন একটু শান্ত হ'ল।

পর-মুহূর্তেই চাকরটা এসে বললে, "কাল দুপুরে যখন আপনি বাইরে গিয়েছিলেন, তখন পিয়ন এসে ওই পার্সেলটা দিয়ে গেছে। আপনি রসিদ সই ক'রে দিন, পিওন এসে আজ নিয়ে যাবে।"

খুব ছোট একটা পার্সেল রত্নপ্রভা পাঠিয়েছেন। ডানা খুলে দেখলে, তার মধ্যে একটা চাবি রয়েছে আর একটা চিঠি।—

ডানা,

আমাদের লাইব্রেরি-ঘরের চাবিটা তোমাকে পাঠালাম। মাঝে মাঝে গিয়ে বইয়ের শেল্‌ফ্‌গুলোর একটু তদারক ক'রো। অনেক সময় উই লাগে। কোনও বই যদি পড়তে ইচ্ছে কর, প'ড়ো। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকাই স্থির কর, সুখন পাঁড়েকে বললেই সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। তাকে ব'লে এসেছি। তুমি যে সব ভয় করছ তা অলীক। আমি যতটা করবার ক'রে এসেছি। কোনও ভয় নেই। পাখীগুলোর খবর দিও মাঝে মাঝে। কাল আমরা সিমলা যাচ্ছি। সেখানকার ঠিকানা গিয়ে পাঠাব। বকুলবালার জন্যে একটা এ-বছরের হলদে পাখী কিনেছি টেরেটি বাজার থেকে। কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। আগে থাকতে তাকে ব'লো না যেন কিছু। পেঁ ীছলে তারপর খবর দিও। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা নিও। ইতি রত্নপ্রভা

মুক্তোর মত গোটা গোটা অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল। নূতন ধরনের একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেল যেন সে। ঠিক করলে, আগে লাইব্রেরিতে যাবে, তারপর চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানা যাবার পথে খোঁজ নিয়ে যাবে সন্ন্যাসীর। একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার মনের অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল।

লাইব্রেরিতে গিয়ে নূতন একটা জগৎ আবিষ্কার করলে সে। তাদের বাড়িতেও বেশ বড় লাইব্রেরি ছিল, কিন্তু তাতে ছিল প্রধানত আইনের বই। যখন কলেজে পড়ত, তখন কলেজ-লাইব্রেরির বই সে নিত মাঝে মাঝে। প্রায়ই কাজের বই নিত, পড়ার বই বা যে সব বই পড়লে পরীক্ষা পাস করবার সুবিধা হয় সেই সব বই। তার সঙ্গে আনন্দের বিশেষ কোনও যোগ ছিল না, কলেজ-লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে তা নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামায় নি সে।

অমরেশবাবুর ছোট্ট লাইব্রেরিটি কিন্তু তাকে অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দের সন্ধান দিলে। তার অবলম্বনহীন ক্ষুধিত মন যেন একসঙ্গে অবলম্বন এবং খাবার পেয়ে গেল নানা রকম। কত রকম বই। পাখীর বই-ই যদিও বেশী; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরেজী বাংলা নানা রকম মাসিক পত্র, গ্রীক নাটকের একটা পুরো সেট, ইংরেজী নভেল, বাংলা নভেল, নক্ষত্রের বই, পাকপ্রণালী, ইতিহাসের বই দু-চারখানা, কয়েকটা অভিধান—নানা রকম বই রয়েছে। ডানা একটা চাকরকে দিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে ফেললে। পরিষ্কার করাবার সময় একটা খাতা বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। সাধারণ একসারসাইজ বুক। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'পক্ষীপর্যবেক্ষণ বাই গণেশ'। খাতা খুলে আরও অবাক হয়ে গেল ডানা। চণ্ডীর বন্ধু গণশার খাতা, গত বছরের ডায়েরির মত, সম্ভবত অমরেশবাবুর উৎসাহে পাখী দেখতে উৎসাহিত হয়েছিল গণেশ। যা যেমন দেখেছিল, লিখে রেখেছে।

১লা কার্তিক, ১৩৫৬ঃ বেনেবউ পাখীর ডাক শোনা গেল, সকাল প্রায় আটটা নটার সময়। প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি পাখীগুলোকে। একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছিল। একটা ফিঙে ডাকছিল, চমৎকার মিষ্টি ডাক, প্রায় নটা দশটার সময়।

২রা কার্তিকঃ আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম কোকিলেরা ডেকে উঠল। তার একটু পরে—প্রায় ছটার সময়—একটা দোয়েলের শিস শুনতে পেলাম। বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেলাম কয়েকটা গোশালিককে। দোয়েলটাকে দেখা গেল না। আর একটা ছোট্ট পাখী দেখলাম—টোইট্ টোইট্ টোইট্ এইরকম ডাকছে। ওই কি দরজি পাখী। অনেক রকম পাখী দেখলাম আজ। টিয়া এক ঝাক, একটা বেনেবউ, কয়েকটা গেছো-ভরত—অমরেশবাবু এদের ইংরেজী নাম বলেছিলেন ট্রি-পিপিট,

হলদে খঞ্জন একটা, চিল, বুক-সাদা মাছরাঙা; বসন্তবউরির ডাকও শুনলাম; স্যাকরা পাখীও (ছোট বসন্তবউরি) ডাকছিল—টংক, টংক, টংক।

৩রা কার্তিক: একটা ঘুঘু ঠিক আমাদের চালের উপর ব'সে ডাকছিল আজ ভোরে।

৪ঠা কার্তিক: কোকিল, ঘুঘু।

৫ই কার্তিক: তেমন কিছু দেখি নি। ঘুঘুর ডাক শোনা গেছে।

৬ই কার্তিক: অমরেশবাবু যে নূতন পাখীটা চিনিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে আবার আজ দেখলাম—রেডস্টার্ট। দেশী নাম থিরথিরা। আতাগাছে ব'সে ছিল।

পাতার পর পাতা লিখে গেছে গণেশ। খাতাটার শেষ পাতায় অমরেশবাবু লিখেছেন—"খুব খুশী হলাম; ছেলেটির পড়ার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে; রত্নাকে দেখাতে হবে খাতাখানা।" অমরেশবাবুর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। খাতাখানা রেখে দিয়ে আর একটা শেল্‌ফের দিকে এগিয়ে গেল ডানা। চোখে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রয়েছে। একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল 'কর্মযোগ'। তাতেই মগ্ন হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতটা পড়া সম্ভব ততটা প'ড়ে শেষকালে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়তে লাগল সে। মনে হ'ল, তার প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন বহুকাল আগে। উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহের আর একটা হেতুও ছিল। এই প্রবন্ধটা পড়বার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করাটা সহজ হবে মনে হ'ল। উনিও আলাপের সূত্র পাবেন কিছু। 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে সন্ন্যাসীর কথাটাই ঘুরে

ফিরে মনে হতে লাগল। উনি নিশ্চয় পড়েছেন এসব, ওঁর নাম কি, বাড়ি কোথা? বাধা পড়ল একটু পরে। আনন্দবাবুর চাকর একটি চিঠি নিয়ে হাজির হ'ল। চিঠির গোড়াতেই কবিতা একটা।—

'আমি আছি,' 'আমি নেই' এ দুটোই সত্য,
'ছিলাম,' 'ছিলাম না' তা-ও নয় মিথ্যে,
'থাকব না,' 'থাকব' দুইই খাঁটি তথ্য—
সব জানি তবু হায় সুখ নেই চিত্তে।
কোথায় যে আছে সুখ কিসে যে ভরিবে বুক
তারই লাগি অহরহ হয়ে আছি উন্মুখ,
চিরে তর্কের চুল গাছে কি ফুটেছে ফুল,
প্ল্যান ক'রে হয়েছে কি মহাসাগরের কূল,
মোদের জীবন তবে অপূর্ণ কেন রবে
দর্শন-মন্থনে সুখ কে পেয়েছে কবে!
যাহাতে ভরিবে বুক কোথায় সে চিরসুখ
যেখানেই থাক্ না সে নিত্যে অনিত্যে
তাহারই ঠিকানা চাই সুখ নেই চিত্তে।

উল্লিখিত কবিতাটি প'ড়ে তোমার যদি মনে হয়, আমি দর্শন-শাস্ত্রকে বিদ্রূপ করেছি, তা হ'লে মারাত্মক ভুল হবে তোমার। দর্শন নয়, অদর্শনই আমার ক্ষোভের কারণ। যিনি আমার আসল মনিব তিনি এসেছেন, সুতরাং আপিস কামাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাবছি, ছুটির ক্ষেত্রটাকে কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়? অর্থাৎ গৃহিণীর সঙ্গে তোমার যদি আলাপ করিয়ে দিই, তা হ'লে সমস্যার সমাধান হবে কি? এ বিষয়ে তোমার যদি অমত না থাকে, তা হ'লে আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যেয়ো। যদি অমত থাকে, জানিয়ে দিও সেটা। অমরেশবাবুর কাছারির অনেক পুরনো

?লিলের পঙ্কোদ্ধার করেছি। অর্থাৎ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র করছি একটা। তুমি যদি একটু সাহায্য কর, প্রয়োজনীয় কর্তব্যটা মনোরমও হয়ে উঠবে। সন্ধ্যার সময় আসবে কি না এক লাইন লিখে জানিও। ইতি

আনন্দমোহন

ডানা ভুরু কুঁচকে ভাবলে একটু স্মিতমুখে, তারপর এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে—"যাব নিশ্চয়ই; আমি নিরামিষ খাই সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"

বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে ডানা নূতন জগতে নীত হ'ল। সন্ন্যাসী তাকে যে জগতের আভাস দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তাকে সেই জগতেই নিয়ে গেলেন। সে জগতে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। সকলেই সেখানে স্ব-স্ব মর্যাদায় সমান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সে জগতে রাজায় মেথরে, সন্ন্যাসী গৃহস্থে সম্মানের কোন তারতম্য নেই। সকলেই সেখানে ভগবানের কাজ করছেন, নিজের নয়। কর্মই সে জগতের একমাত্র অবলম্বন—কর্মফল নয়, আকাঙ্ক্ষা নয়, অহঙ্কারও নয়। সে জগতে সামান্য পক্ষী-পরিবারও তাই অতিথিসেবার জন্য আত্মবিসর্জন করতে ইতস্তত করে না, সন্ন্যাসী হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে রাজ্যেশ্বরী রূপসী রাজকন্যাকে। সে জগতে কর্তব্যই সব চেয়ে বড়—আত্মসুখ নয়, পরার্থপরতাই সেখানকার মন্ত্র—স্বার্থপরতা নয়। এই নূতন জগতে নীত হয়ে ডানা খানিকক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হ'ল, সে কি আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করতে পারবে? এমন পুরুষ কি এ দেশে আছে, পরের মঙ্গলের জন্য যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবে? সে রকম পুরুষ না পেলে তো আদর্শ গৃহস্থালী স্থাপনই করা যাবে না। সে নিজেও কি পারবে? ?ইটা বন্ধ ক'রে উঠে পড়ল সে। কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করলে

নিজেকে। শেলুফ্‌ গোছাতে গোছাতেও কিন্তু ওই একই কথা ভাবতে লাগল—আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করবার উপায় আছে কি এ যুগে? সকলেই যে যুগে স্বার্থপর, যে যুগে পরার্থপরতার অর্থ বোকামি বা পাগলামি, সে যুগে এ সব কথা ভাবাও কি সঙ্গত? কোথায় আছে সে রকম পুরুষ, যে সংসার পাতবে নিজের জন্য নয়—পরের জন্য? যদি সে রকম পুরুষ দুর্লভ হয়—হবেই—তা হ'লেই বা তার কর্তব্য কি? সন্ন্যাসীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুললে তিনি এর কি উত্তর দেবেন, শোনবার জন্য তার মন আগে থাকতেই উৎসুক হয়ে উঠল। একটু পুলকিতও হ'ল সে। কল্পনায় সে সন্ন্যাসীর বিব্রত ভাবটা উপভোগ করতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। 'কর্মযোগ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসীর কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি সুন্দরী রাজকন্যাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান ক'রে বনের মধ্যে পালিয়ে গেলেন, এ সন্ন্যাসীরও কি তেমনি মনের জোর আছে? বেগতিক দেখলে ইনিও কি অমনি অন্তর্ধান করবেন? করতে পারবেন? হঠাৎ তার কল্পনা বিস্মিত হ'ল। চিড়িয়াখানার চাকর মুন্সী এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল।

"মাইজী, পাখীদের দানা ফুরিয়েছে। গোটা দশেক টাকা দিন, কিনে আনি। হরেওয়াদের জন্যে কিছু ঝাড়-জঙ্গলও আনাতে হবে। মিহিপুরার একটা বাগানে আছে খবর পেয়েছি। আমাকে যদি এক বেলা ছুটি দেন, আমিই গিয়ে কেটে আনতে পারি, তা না হ'লে একটা মজুর পাঠাতে হবে—তার আবার মজুরি লাগবে।"

ডানা সহসা যেন আর এক জগতে এসে হাজির হ'ল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে নীরবে চেয়ে রইল সে মুন্সীর দিকে। তারপর তার মনে পড়ল, হরবোলা পাখীরা লোরেনথাস্‌ (Loranthus) ফুল খেতে ভালবাসে। এগুলো একরকম পরগাছার ফুল, সাধারণত আমগাছের উঁচু ডালে হয়। অমরবাবু একবার তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন মনে পড়ল। তারপর তার মনে হ'ল, মুন্সী যে প্রস্তাবটি

এনেছে তার অন্তরালে মুন্সীর চতুর একটা মতলবও যেন লুকিয়ে আছে। যে টাকাটা সে দানা কেনবার জন্যে চাইছে তার সবটা হয়তো সে দানা কেনবার জন্যে খরচ করবে না। কিছু বাঁচাবে নিশ্চয়ই। আর যে মিহিপুরার বাগানে সে লোরেনথাস্ ফুল আনতে যাচ্ছে সেই মিহিপুরা গ্রামেই তার শ্বশুর বাড়ি, তার যুবতী বধূ সেখানে আছে। ডানা ইচ্ছে করলে একজন গোমস্তাকে দিয়ে পাখীর দানা আনিয়ে নিতে পারে, একবার হুকুম করলেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। এ বাড়ির কোনও চাকরকে ফরমাশ করলে লোরেনথাস্ ফুলও অনায়াসে এসে যাবে। অমরেশবাবুর আস্তাবলে ঘোড়া নেই কিন্তু সহিস আছে, তাকে রত্নপ্রভা বরখাস্ত করেন নি, পেন্‌শন দিয়েছেন। সে ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে উৎসুকও, তাকে বললেই সে সানন্দে লোরেনথাস্ ফুলগুলি এনে দেবে। ডানা আর একবার মুন্সীর মুখের দিকে চাইল, দেখল তার চোখ দুটো মিটমিট করছে। মায়া হ'ল। মনে হ'ল, বেচারার আশা ভঙ্গ ক'রে তার কোন লাভ হবে না, হয়তো তার অনুচ্চারিত অভিশাপ তার অনিশ্চিত জীবনকে আরও অনিশ্চিত ক'রে তুলবে। অদেখা বধূটির প্রত্যাশাভরা পথ চাওয়াটাও সে যেন দেখতে পেল কল্পনায়। তার নিজের মনের ভিতরই কে একজন যেন বধূটির হয়ে সুপারিশ করতে লাগল। ডানা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে দশ টাকার নোট বার করলে একটি।

"পাখীর দানা কিনে আন। ভাল জিনিস কিনো, আর ওজন ঠিক ঠিক দেখে নিও। দানা কিনে নিয়ে চল তুমি চিড়িয়াখানায়। সেখানে পাখীদের খাইয়ে তারপর মিহিপুরা যেয়ো। আমিও যাচ্ছি এখুনি।

মুন্সী সানন্দে চ'লে গেল।

চিড়িয়াখানায় অনেক রকম পাখী ছিল। একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরকে প্রথমে দেওয়াল দিয়ে এবং পরে তার দিয়ে ঘিরে

অমরেশবাবু নিজের যে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন—এখনও যদিও তা সম্পূর্ণ হতে অনেক দেরি, কিন্তু যতটুকু হয়েছে ততটুকুই ডানাকে হিমসিম খাওয়াবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশীর ভাগ পাখী পাখীওলারাই দিয়েছে। মুনিয়া, তিতির, বটের, দামা, দোয়েল, হরবোলা, বুলবুলি, চাতক, শামা, বেনেবউ, নীলকণ্ঠ, বুনোচড়াই, গাংশালিক, পাহাড়ী ময়না, রেডস্টার্ট (কবি যার নামকরণ করেছেন ফুলকি), ভিংরাজ, টিয়া, চন্দনা, ফিঙে প্রভৃতি পাখীকে বড় বড় খাঁচায় রাখা হয়েছে, একটা পুকুরে কিছু পানকৌড়ি এবং এক জোড়া ডাহুককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হুতোমপ্যাঁচাও রাখা হয়েছে খাঁচার ভিতরে, কতকগুলো ভরদ্বাজ পাখীও ছাড়া আছে ঘাসের জঙ্গলে, দরজিপাখী, টুনটুনি, সাধারণ চড়াই, ছাতারে, এ সব তো আছেই। কিছুদিন আগে রেডস্টার্টগুলোকে ডানা ছেড়ে দিয়েছিল। একটা প্যাঁচা মারা গেছে, আর একটাও মরমর। এইটের জন্যেই ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, ভাবছে এটাকেও ছেড়ে দেবে কি না।

মুন্সী দানা নিয়ে আসতেই ডানা জিজ্ঞেস করলে, "প্যাঁচাটা কিছু খেয়েছে?"

"একটা গোটা মাছ খেয়েছে হুজুর।"

"ভালই আছে তা হ'লে।"

"চোখ খোলে নি কিন্তু হুজুর। পিছু ফিরে ব'সে মাছটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলে, তারপর থেকে চোখ বুজে ব'সে আছে।"

ডানা প্যাঁচাটার খাঁচার সামনে এগিয়ে গেল। সত্যিই রোগা হয়ে গেছে বেচারা।

"কত বড় মাছ দিয়েছিলি?"

"বেশ বড় পুঁটি একটা। তা আধপোয়াটাক হবে।"

ডানা কেটুপা প্যাঁচার প্রধান বৈশিষ্ট্যটা আবার ভাল ক'রে লক্ষ্য করছিল, পায়ে মোটে পালক নেই। হঠাৎ প্যাঁচাটা চোখ খুলে

একবার চাইলে, বড় বড় গোল গোল চোখ ছুটোর দৃষ্টি ডানার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর পিঠ ঘুরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, তোমাদের মতো পাষণ্ডদের মুখদর্শন করাও পাপ। ডানা মুচকি হেসে এগিয়ে গেল মুন্নীর দিকে। মুন্নী শামা পাখীটার খাঁচায় কিছু মাংসের কিমা আর কিছু মরা ফড়িং দিচ্ছিল। ডানা কাছে আসতেই সে বললে, "এগুলো আরশোলা খুব ভালবাসে। পুরনো গুদোম ঘরটায় অনেক আছে, কিন্তু নায়েব মশাই সেখানে ঢুকতেই দেন না আমাকে। আপনি যদি একটু ব'লে দেন—"

"আচ্ছা, বলব। গুদোম ঘরে অনেক জিনিসপত্তর আছে কি না, তাই সে ঘরের চাবি কাউকে দিতে চান না তিনি। আমি কাল চাবি চেয়ে রাখব, তুমি আমার সামনে কিছু আরশোলা ধ'রে এনো—"

প্রস্তাবটা মুন্নীর খুব মনঃপুত হ'ল না। সে গম্ভীর মুখে নীলকণ্ঠ, ভিংরাজ, দোয়েল প্রভৃতি মাংসাশী পাখীদের কিমা আর ফড়িং দিতে লাগল। হঠাৎ শামা পাখীটা খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল আর লাফালাফি করতে লাগল খাঁচার ভিতরে।

"ওর পেট ভরে নি বোধ হয়। ওকে আর একটু কিমা দাও মুন্নী।"

মুন্নী আদেশ পালন করলে, কিন্তু মন্তব্য করলে, "ওর পেট কি ভরাতে পারবেন আপনি মা, রাক্ষস একটা। দশটা ফড়িং ওকে দিয়েছি।"

নীলকণ্ঠটাও চীৎকার শুরু করল। ভিংরাজ দোয়েলেরও আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। ডানার মনে হ'ল, কোন বড়লোকের বাড়িতে যেন কাঙালীবিদায় হচ্ছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বটের পাখীটা ব'লে উঠল—ঠিক, ঠিক তো।

"আমি চললুম। তুই এদের খাইয়ে মিহিপুরায় চ'লে যাস। আজই ফিরবি তো ?"

"নিশ্চয়। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব।"

ডানা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বন্দী পাখীগুলোর দুর্দশা অতিষ্ঠ ক'রে তুলল তাকে।

সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ডানা একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখলে। সন্ন্যাসী পান খাচ্ছেন। কাছেই খান দুই শালপাতা দেখে সন্দেহ হ'ল, হয়তো বাজার থেকে খাবার কিনেও খেয়েছেন। ডানাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন একটু, কোন কথা বললেন না। কিন্তু ওই মৃদু হাসির মধ্যেই এমন একটি সূক্ষ্ম অভ্যর্থনা ছিল যা ডানার মর্ম স্পর্শ করল।

"রোজই ভাবি আপনার কাছে আসব, কিন্তু সাহস পাই না। আজ জোর ক'রে চ'লে এলাম। যদি এটাকে অন্যায় মনে করেন বকুন আমাকে, আমি তৈরি হয়েই এসেছি।"

"বকতে যাব কেন শুধু শুধু। তুমি এলে তো ভালই লাগে।"

"আপনি যে পথের পথিক সে পথে তো আমরা বাধা, নিজেই তো বলেছেন এ কথা।"

"কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু পথের বাধাকে অতিক্রম করবার শৌর্য যে আমার আছে তা যাচাই করব কি ক'রে যদি বাধা না থাকে ? তাই বাধাটা অনাবশ্যক নয়, ওরও প্রয়োজন আছে তা ছাড়া যা অনিবার্য তাকে কি নিবারণ করা যায়। বাধা হিসাবে তুমি দুস্তরও নও, ভয়ঙ্করও নও।"

কথাগুলি ব'লে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ডানার দিকে।

"পান পেলেন কোথা ? উঞ্ছবৃত্তিধারীরা পানও কুড়িয়ে পায় না কি।"

"না। কিনেছি। শুধু পান নয়, কচুরি এবং রসগোল্লাও।"

"পয়সা পেলেন কোথা ?"

"আমি তো নিঃস্ব নই। পোস্টাফিসে আমার টাকা আছে কিছু।"

"এখানকার পোস্টাফিসে ?"

"হ্যাঁ।"

ডানা যুগপৎ বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে উকিলের মেয়ে, তার বাবা নামজাদা উকিল ছিলেন বর্মায়, জেরা করবার সহজ শক্তি তার অন্তরের মধ্যেই ছিল সম্ভবত। সে জেরা করতে লাগল।

"এখানে এসে পোস্টাফিসে টাকা জমা করেছিলেন ?"

"না। টাকা অনেক আগে থাকতেই ছিল।"

"আগে তা হ'লে আপনি আর একবার এসেছিলেন এখানে ?"

সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন হাসিমুখে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "আমার সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন তোমার ?"

"বাঃ, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জানতে চাইব না!"

"আমার পরিচয় তো জেনেছ, আমি সন্ন্যাসী। সংসারী লোকের কাছে এর বেশী পরিচয় দেওয়া নিরর্থক।"

"আমি কিন্তু ঠিক সংসারী লোক নই। আপনাকে তো সব কথা বলেছিলুম একদিন। আমার নিজের লোক বলতে কেউ নেই। ঘটনাচক্রে আমিও সংসার থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। তাই বোধ হয় আপনার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করি। আপনি আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক, নারীর সান্নিধ্য আপনি পছন্দ করেন না। এসব জেনেও তবু আপনার কাছে আসি। আপনার পরিচয়ও জানতে তাই আগ্রহ হয়।"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটা মাটির সরা আর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে ক'রে বেরিয়ে এলেন

আবার। ডানার সামনে সেগুলো নামিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও তা হ'লে—"

"কি?"

"আমার পরিচয়। এককালে খুব খাইয়ে ছিলাম। কদিন থেকে রসগোল্লা, গরম কচুরি আর মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিছুতেই একাগ্র হতে পারি না, ভগবৎচিন্তার ফাঁকে ফাঁকেও লোভটা এসে উঁকি মারে দুষ্টু ছেলের মত। আজ সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাই ওটাকে শান্ত করলুম আগে। কিছুদিন বিরক্ত করবে না আর।"

অকৃত্রিম সরল হাস্যে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর। ডানাকে বললেন, "নাও, তুমিও খাও।"

"এখন তো আমি গিয়ে ভাত খাব। এখন খেলে দুপুরের খাওয়াটা নষ্ট হবে।"

"সঙ্গে নিয়ে যাও তা হ'লে।"

"আপনিই রেখে দিন না, বিকেলে খাবেন।"

"আমি আর খাব না। লোভকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়াও ভাল নয়। ওগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"আমি না এলে কি করতেন?"

"কাককে কুকুরকে খাইয়ে দিতাম। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমার নেই।"

"পোস্টাফিসে টাকা তো সঞ্চয় করেছেন।"

"আমি করি নি। আমার পূর্বপুরুষরা করেছেন।"

কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না সন্ন্যাসীর, কথার পিঠে বেরিয়ে পড়ল। জেরার মুখে আরও অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল।

"আপনার পূর্বপুরুষরা? তাঁরা এখানকার পোস্টাফিসে টাকা জমালেন কি ক'রে?"

"তারা এই অঞ্চলেই ছিলেন এককালে। আমারও ছেলেবেলাটা এখানেই কেটেছে।"

এইবার ডানা আকাশ থেকে পড়ল।

"অমরবাবু আনন্দবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল আপনার?"

"এঁরা অনেক পরে এসেছেন। আমরা এখানে ত্রিশ বছরেরও আগে ছিলাম। আমি যখন এখান থেকে চ'লে যাই, তখন আমার বয়স পাঁচ বছরেরও কম।"

"আর আসেন নি?"

"এসেছিলাম একবার পোস্টাফিসের খাতাটা ঠিক করিয়ে নেবার জন্যে। চার-পাঁচ দিন ছিলাম মাত্র।"

"পোস্টাফিসের খাতা আপনার নামেই ছিল?"

"আমার নামেই ছিল। এখনও আছে।"

"এখানে আপনার পূর্বপরিচিত লোক আছেন নিশ্চয় তা হ'লে?"

"বেশী নেই। দু-একজন আছেন। না থাকলে টাকা বার করা যেত না। কারণ এখন যিনি পোস্টমাস্টার, তিনি আমাকে চেনেন না। তাঁদের একজনকে ডেকে আনলাম গিয়ে, তার পর টাকা পেলাম।"

ডানার ভারি মজা লাগল—রসগোল্লা, লুচি আর মিঠে পান খাওয়ার জন্য ভদ্রলোক এত কাণ্ড করেছেন! লোকটির চরিত্রের আর একটা দিক দেখতে পাওয়ার পর লোকটাই যেন বদলে গেল তার চোখে। এতদিন সে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, এই অপ্রত্যাশিত নূতন আলোতে একটা পথের রেখা সে যেন দেখতে পেল। যদিও অস্পষ্ট আভাস মাত্র, তবু আশাপ্রদ।

অনুযোগভরা কণ্ঠে ডানা বললে, "এতক্ষণে বুঝতে পারছি, সত্যিই আপনি আমাকে পর মনে করেন। আমাকে একটু যদি খবর দিতেন তা হ'লে আপনাকে কচুরি আর রসগোল্লার জন্যে এত কাণ্ড করতে হ'ত না, আমি অনায়াসে সব ব্যবস্থা ক'রে দিতাম।"

"তা দিতে জানি। কিন্তু তোমার যুক্তিটা ঠিক হ'ল না। পরের কাছেই অসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়া যায়, কিন্তু নিজের লোকের কাছে সঙ্কোচ হয়। তা ছাড়া তোমার কথা মনেও হয় নি। জীবন্ত কারো কাছে ভিক্ষা না ক'রে মৃতের দ্বারস্থ হচ্ছি এর অভিনবত্বেই মশগুল হয়ে ছিলাম আমি।"

"মৃতের মানে?"

"পূর্বপুরুষদের।"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল ডানার মুখের দিকে সহাস্যদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রেখে আবার বললেন, "পূর্বপুরুষদের কাছে যে আমরা সর্বদাই ঋণী সে কথা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। স্মৃতিশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন ক'রে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। আমি স্মৃতিশাস্ত্রের এ বিধান মানি নি, কথাটা মনেও লাগে নি খুব। পিতৃঋণ অপরিশোধ্য এই আমার বিশ্বাস। পূর্বপুরুষদের দাক্ষিণ্যের দ্বারে হাত পেতে তাই ভারি আনন্দ পেয়েছি আজ।"

ডানা মুচকি হেসে বললে, "আমি আপনার মত পণ্ডিত নই। অত চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারব না। তবে রামায়ণে পড়েছিলাম যে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে কয়েকটি শহুরে মেয়ে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে শহরে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সন্দেশ দেখে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শেষকালে তিনি রাজা লোমপাদের জামাইও হয়ে গেলেন। আপনার কথা শুনে গল্পটা মনে প'ড়ে গেল।"

সন্ন্যাসী হেসে জবাব দিলেন, "অতটা বেকুবি আমি করব না। যাক, আমার কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ওটা এখন বন্ধ থাক্। কোনও দরকারে এদিকে এসেছিলে, না, এমনি বেড়াতে এসেছ?"

"দরকার আমার একটা আছে। আগেও দু-একবার বলেছি আপনাকে, কিন্তু আপনি ব্যাপারটাকে আমল দেন নি। অথচ আমার ধারণা, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"

সন্ন্যাসী একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে একটা শঙ্কার ছায়াপাতও হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মনে করবার চেষ্টা করলেন, মেয়েটি কবে কোন্ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর কাছে এসে বিফলমনোরথ হয়েছে। কিন্তু মনে পড়ল না। তখন বললেন, "তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার দ্বারা তোমার যদি কোনও উপকার হয়, নিশ্চয় করব যথাসাধ্য। ব্যাপারটা কি ?"

"আপনাকে আগেই বলেছি, পৃথিবীতে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই। এখন যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি অতি সদাশয় লোক সন্দেহ নেই। আমার অনেক উপকার করেছেন, আরও হয়তো করবেন; কিন্তু যে কাজ তিনি আমাকে দিয়েছেন তা একেবারেই ভাল লাগছে না আমার। কতকগুলো নিরীহ পাখীকে তিনি বন্দী ক'রে রেখেছেন আর আমার ওপর ভার দিয়েছেন তাদের তদারক করবার। ওদের আর্ত-চীৎকার রোজ রোজ আর শুনতে পারি না। মাঝে মাঝে ম'রেও যাচ্ছে। ছেড়ে দিয়েছি কয়েকটাকে। ইচ্ছে করে, সবগুলোকেই ছেড়ে দিই। কিন্তু ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই যখন আমার চাকরি তখন সব ছেড়ে দিলে হয়তো আমার চাকরিই থাকবে না। নিজের স্বার্থের জন্য অতগুলো প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছি—এ কথা ভাবতেও খুব খারাপ লাগে। তার ওপর আছেন ওই রূপচাঁদবাবু, লোকটার ধরনধারণ মোটেই ভদ্র নয়। মোটের ওপর আমি বড় অস্বস্তিতে আছি। মনে হচ্ছে এ পরিবেশ থেকে স'রে না গেলে স্বস্তি পাব না। অথচ স'রে যাবই বা কি ক'রে, হাতে টাকাকড়ি কিছু নেই। এ অবস্থায় কি করি বলুন তো? আমাকে একটা পরামর্শ দিন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "সাংসারিক ব্যাপারে আমি তোমার চেয়েও আনাড়ী। অনেকদিন হ'ল সংসার থেকে চ'লে এসেছি। তোমাকে সাংসারিক পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তো আমার নেই। শুধু

এইটুকু বলতে পারি, এ পরিবেশ তোমার যদি খারাপ লাগে এখান থেকে চ'লে যাওয়াই উচিত। স্বাধীনতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সত্যের সন্ধানে যে শক্তি আমাদের একমাত্র সম্বল, স্বাধীনতা না থাকলে সে শক্তিও আমাদের থাকে না। সংসারে অনেকেই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, আমি পারি নি, তাই আমাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে। সকলের পথ অবশ্য এক নয়, কোন্ পথে গেলে তুমি সুখী হবে, তা তোমাকে ঠিক করতে হবে।"

"কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি কই!"

"তোমাকেই ঠিক করতে হবে। কোন্ খাবারের স্বাদ কি রকম, তা ভাল লাগছে, না, মন্দ লাগছে—এ যেমন নিজেকেই ঠিক করতে হয়, আনন্দের পথও তেমনি নিজেকে বার করতে হয়, কেউ সংসারের ভিতরে থেকেই তা পারে, কাউকে সংসার ছাড়তে হয় আমাকে হয়েছে। তুমি কি করবে সেটা তুমিই ঠিক কর। অনিশ্চয়তার মধ্যেই ধ্রুবকে পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তার পটভূমিকাতেই তো চেনা যায় তাকে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ পরিবেশ যদি ভাল না লাগে অন্য কোথাও চ'লে যাও।"

"আমার কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম। মুশকিল হয়েছে আমি নিঃস্ব।"

"কষ্ট ক'রে থেকে কিছু টাকা জমাও তা হ'লে মাইনে থেকে তারপর কোথাও একটা চাকরি যোগাড় ক'রে চ'লে যেয়ো। এই লক্ষ্যটা ঠিক রেখে চলা ছাড়া আর অন্য কি-ই বা উপায় আছে তা তো মাথায় আসছে না আমার। অলক্ষ্য থেকে হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যরকম হয়ে যাবে কিছু একটা, তখন আবার তদনুসারে চলতে হবে। এই তো জীবন।"

সন্ন্যাসী ডানার দিকে চেয়ে হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। মনে হতে লাগল, সে যা বলতে

এসেছিল তা বলেছে, কিন্তু তবু যেন বাকি আছে কিছু। অনেক কিছু।

১৩

ডানা কবির বাড়িতে যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে এসে সে পৌঁছেছিল—যদিও তাতে নূতনত্ব কিছু ছিল না, নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে—এ কথায় চমক-লাগানো অভিনবত্ব কিই বা থাকতে পারে, কিন্তু তবু এই আলোচনার ঘোরটা কিছুতেই যেন কাটতে চাইছিল না তার মন থেকে। ক্ষিধে পেলে খাবারটা পছন্দসই কি না তা ভাববার অবসর থাকে না অনেক সময়, যা পাওয়া যায় তাই খেতে হয়, ক্ষিধের মুখে অখাদ্যও ভাল লাগে, তাই সন্ন্যাসী বলছিলেন—যে পথ সামনে পেয়েছ সেই পথেই চল। চলতে চলতে নিজেই বুঝতে পারবে পথটা তোমার মনোমত কি না। পথই তোমাকে নূতন পথের সন্ধান দেবে, নূতন বিচারের প্রেরণা জাগাবে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কবির বাড়িতে এসে হাজির হ'ল সে। হাজির হয়েই অর্থাৎ কড়া-নাড়ার আগেই মন্দাকিনীর কথা মনে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। মনের রঙটা বদলে গেল একেবারে, কল্পনা-বীণায় বেজে উঠল নূতন সুর। বকুলবালার মত মন্দাকিনীও অপ্রত্যাশিত কিছু হবেন নাকি! হঠাৎ মনে হ'ল, মন্দাকিনী লেখাপড়া জানেন কি? আনন্দবাবুর কবিতা পড়েন কি? সহসা লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। আনন্দবাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে যে সব কবিতা লিখেছেন তা যদি ওঁর নজরে প'ড়ে থাকে…। কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সে কড়া নাড়ল। কপাট কিন্তু খুলল না। কবি দোতলায় নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে ছিলেন, কড়া নাড়ার

শব্দ তাঁর কানে গেল না। মন্দাকিনী রান্নাঘরে মৈথিল ঠাকুরটার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তিনিও কিছু শুনতে পেলেন না। চাকরটা ছিল না, তাকে মন্দাকিনী বাজারে পাঠিয়েছিলেন সা-জিরে আনবার জন্যে। ডানা নিরামিষ খায় শুনে তিনি নানারকম নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে সোৎসাহে লেগে পড়েছিলেন এবং ঠিক এই কারণেই ডানার সম্বন্ধে একটু সশ্রদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। লেখাপড়া-জানা বর্মী মেয়ে মাছ-মাংস খায় না—এটা যেন বাঘের গায়ে কালো-ডোরা-নেই জাতীয় আশ্চর্য খবর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। তা ছাড়া আর একটা বড় কথা, আনন্দবাবুও প্রশংসা করেছেন মেয়েটির। উনি যার-তার প্রশংসা বড় করেন না। মোষের মত মোটা একটা মেয়ে কিছুদিন আগে ওঁর পিছু নিয়েছিল, যখন উনি প্রফেস্যারি করতেন। এক গাদা পদ্য নিয়ে এসে প'ড়ে প'ড়ে রোজ শোনাত ওঁকে। মুখখানা কাছিমের পিঠের মত, তার উপর বড় বড় হলদে হলদে ফাঁক ফাঁক দাঁত, মুখে সর্বদা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। চুল ফাঁপিয়ে, হাত-কাটা জামা প'রে, কত ঢঙ ক'রেই যে আসত। আসতে যেতে পেল্লাম। কিন্তু তবু উনি আমোল দেন নি তাকে। এলে বিরক্তই হতেন। তাঁর দূরসম্পর্কের ছোট বোন জবাও ফষ্টি-নষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল তাঁর সঙ্গে শালী হিসেবে, কিন্তু ওঁর গাম্ভীর্যও টলাতে প্যারে নি, প্রশংসাও কুড়োতে পারে নি। আড়ালে বলতেন, মেয়েটা ডেঁপো। জবা সুন্দরী ছিল, কিন্তু উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। তাঁর মত লোক যখন বলেছেন যে—মেয়েটির রূপও আছে, গুণও আছে, তখন সে কথা মূল্যবানই মনে হয়েছিল মন্দাকিনীর। তিনি বাইরে স্বামীর যত রূঢ় সমালোচনাই করুন, মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন খুবই। এত বয়েস হয়েছে কিন্তু শিশুর মত সরল, নিজের কাপড়-চোপড়টা পর্যন্ত সামলাতে পারেন না, কখন কোথায় কোন্ কথা বললে মানাবে জানেন না, ফট ক'রে বেমানান হয়তো ব'লে বসলেন একটা

কিছু, এ সবের জন্যে অনেক বকাঝকা, অনেক অশান্তি সৃষ্টি তিনি করেছেন, কিন্তু ওই সরলতার জন্যেই ওঁকে শ্রদ্ধাও করেন। আসল কথা, মন্দাকিনীর মনটা এসে থেকেই খুব খুশী হয়ে আছে, সেই জন্যেই সব কিছু ভাল লাগছে তাঁর। তিনি এখন সামান্য মাস্টারের স্ত্রী নন, এত বড় জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজারের স্ত্রী, এই ব্যাপারটা তাঁকে খুশির সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছে। মল্লিক মশায়ের বউয়ের গুমরটা যে ভেঙেছে, এতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করেছেন। জগু মোক্তারের স্ত্রীও পরশু ঘটা ক'রে বেড়াতে এসেছিলেন—আগে কখনও আসতেন না, দেখা হ'লে কথাও কইতেন না। এখন মুখে কথার খই ফুটছে। রূপচাঁদবাবুও এসেছিলেন দুবার। আগে এত ঘন ঘন আসতেন না। স্বামীর আয় বাড়াতেই শুধু নয়, পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়াতে মন্দাকিনীর যেন নবজন্ম হয়েছে। স্বামীকে তিনি পাখী দেখতেও উৎসাহ দিচ্ছেন আজকাল। জমিদারের যখন পাখী দেখার বাতিক আছে, তখন পাখীদের খবরাখবর রাখলে তিনি খুশী হবেন নিশ্চয়, আর তিনি খুশী হ'লে চাকরির বনিয়াদ ক্রমশ পাকা হবে—এই তাঁর যুক্তি। ডানা মেয়েটিও এই পাখী-তদারকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে শুনে ডানার প্রতি একটা আত্মীয়সুলভ মনোভাব হয়েছিল তাঁর। মহা উৎসাহে তার জন্যে রান্না করছিলেন তিনি।

তৃতীয় বার একটু জোরে কড়া নাড়ার পর ফল হ'ল। মৈথিল ঠাকুরটি এসে কপাট খুলে দিয়ে আধা-বাংলা আধা-হিন্দীতে অভ্যর্থনা করলে, "আসেন মাইজী, ভিতরে আসেন—"

ব্যাপারটা কবিরও কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি নেবে এলেন। মন্দাকিনীও কড়াটা নাবিয়ে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। লণ্ঠনটা তুলে ধ'রে ডানার মুখখানি ভাল ক'রে দেখে একমুখ হেসে বললেন, "ইনিই ডানা নাকি! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। এ যে আমার শঙ্করী গো—"

ডানার মধ্যে নিজের মেয়ে শঙ্করীকে দেখে মন্দাকিনী বিগলিত হয়ে পড়লেন একেবারে। কবি কোনও কথা বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু। মন্দাকিনীর আড়ময়লা কাপড়ে হলুদের দাগ লেগেছিল একটু, মাথায় টাক পড়েছিল সামনের দিকটা, কপালে গালে কালো কালো দাগ পড়েছিল, দেহ শীর্ণ, গায়ে সেমিজ পর্যন্ত নেই; কিন্তু তবু মন্দাকিনীকে খুব ভাল লাগল ডানার। তাঁর স্নেহমাখা মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয় হ'ল যেন সে। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। প্রণাম করতে গেলে অনেকে যেমন মৌখিক লৌকিকতা ক'রে 'হাঁ-হাঁ' ক'রে ওঠেন, মন্দাকিনী সে সব কিছু করলেন না। তাঁর প্রাপ্য প্রণামটা নিয়ে তার চিবুকে হাত দিয়ে নিজের আঙুলগুলি ঠোঁটে ঠেকিয়ে আলগোছে চুম্বন করলেন। তারপর আশীর্বাদ করলেন, সতীলক্ষ্মী হয়ে দীর্ঘজীবী হও। ডানার মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা সম্পদ পেয়ে গেল সে অপ্রত্যাশিতভাবে। তাকে এমন ক'রে আশীর্বাদ কেউ কখনও করে নি। তার দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে গেল যেন।

"রান্নার এখনও একটু দেরি আছে। তোমরা ওপরে ব'সে ততক্ষণ লেখাপড়া কর। ঠাকুর, তুমি বেরিয়ে দেখ একটু, হরির মুখপোড়া ছু আনার সা-জিরে আনতে গিয়ে যুগ কাবার ক'রে দিলে। ঠিক মোড়ে বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে মুখপোড়া।"

ডানাকে নিয়ে কবি উপরে উঠে গেলেন।

"আমার কাজ প্রায় হয়ে এসেছে। তুমি ততক্ষণ আমার কবিতার খাতাটা ওলটাও। শেষের দিকে দেখ, কয়েকটা নূতন কবিতা লিখেছি।"

ডানা খাতা ওলটাতে লাগল। কয়েকটি নূতন কবিতা চোখে পড়ল।

টিয়া

ওরে টিয়া তোকে যদি বলি কলাগাছ
ঠোঁটটি তা হ'লে তোর মোচা,
কিন্তু যে কবি তোকে কলাগাছ বলবে
সে কবি নিতান্তই ওঁছা।

তুই কি রে সবুজের জয়-গান
তাই কি কোরাস্ ধরে যত বন-ময়দান
যোগ দিয়ে পান্নার সঙ্গে
এসে কি মিশল তোর অঙ্গে।

সবুজ হতে না পেরে চুনীটা
হ'ল বাঁকা টুকটুকে ঠোঁট কি
চুনীতে তৈরি ওটা আবীরের মটকি।
সে আবীর কারো কারো কণ্ঠেও লেগেছে
কারো কারো ডানাতে
এ কথা রটেছে রূপখানাতে।

সেখানের রূপসীরা তাই নাকি ঠোঁটে গালে চরণে
আলতা মাখায় নানা ধরনে।
রসিকেরা হেসে হয় সারা
টিয়ার নকল করা—এ কেমন ধারা।

ছাতারে

দিন গেল, মাস গেল, কাটিল বছর
তবু তোর থামিল না কচর-বচর

রে ছাতারে পাখী,
বল্ তোর ভাষণের আর কত বাকি।
কান প্রাণ গেল যে ছাপিয়ে
আর কত বকবি রে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ফুৎকি

ওরে ওরে ফুৎকি, মাটিতে নামবি না?
একটু থামবি না?
ডালে ডালে চিরকাল ছটফট করবি
সারাদিন ক্রমাগত কত পোকা ধরবি?
একটু নাম্ না ভাই
একটু থাম্ না ভাই।
দূরবীনে দে না ধরা ক্ষণিকের জন্য,
চট্ ক'রে দেখে নি'
কবিতায় এঁকে নি'
কোন্ গুণে হয়েছিস এতটা অনন্য।

ফটিক জল

ফটিক জল পাখীটির দেখা পেলাম সকালে
দেখা দিয়েই ঠকালে,
ফুড়ুৎ ক'রে পালিয়ে গিয়ে লুকোল
অমনি আমার কাব্য-মুকুল শুকোল,
কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ উঠল ফুটে হর্ষিত
'ফটি—ক জল' গহন থেকে হ'ল যখন বর্ষিত।

ফিঙ্গক-শারিকা-কাব্য

আমড়াগাছের শুকনো ডালে একটি ফিঙে এবং একটি শালিক পাশাপাশি ব'সে ছিল। কেন জানি না, মনে হ'ল শালিকটি স্ত্রী-শালিক এবং ফিঙেটি পুরুষ-ফিঙে। এ অবস্থায় মানব-কবির মনে যে ভাব আসা স্বাভাবিক তাই এসেছিল। কিন্তু শেষে অপ্রস্তুত হতে হ'ল।

ওহে ফিঙে চৌধুরী
করেছ কার বউ চুরি ?

শালিক-প্রিয়া তোমার পাশে
আছেন ব'সে কিসের আসে।
মিল হবে কি শালিক-ফিঙে দুজনে ?
করছ নাকি কেলেঙ্কারি
বাঙালী আর তেলেঙ্গারি
গাঁথছ নাকি মিলন-মালা দুজনে।

খাসা কাব্য ফেঁদেছিলাম
ছন্দটি বেশ গেঁথেছিলাম
এমন সময় ফিঙা গেল উড়িয়া
শালিক পাখী নির্বিকার
দেখলে নাকো ফিরেও আর
রইল একা আমড়া-শাখা জুড়িয়া।

তার পরেতে একটু পরে
উড়ল সে-ও 'পিড়িং' ক'রে
দিব্যজ্ঞান হইল পরকীয়ার কি

ডানা

বসল শিরীষ গাছে গিয়ে
তার পরেতে ঘাড় ফুলিয়ে
ঝাঁকিয়ে মাথা বললে, এ কি ইয়ার্কি।
মনে রেখো শালিক মোরা
এবং মোরা সেকেলে,
মানুষ নই, মানুষ নই
এবং নই একেলে।

শিকারী পাখী

অলঙ্কৃত কর তুমি আকাশের নীল
বহু নামে। কভু তিস্‌সা, কভু চিল,
কখনও কোড়ল; ঈগলের রূপ ধরি
কভু দৃপ্ত পক্ষীরাজ। শিকৃরে, কুররী
কভু; কখনও আবার সাপমার হয়ে
ধ্বংস করি সর্পকুল বেড়াও নির্ভয়ে।
পানডোবা-মাঠচিল-রূপে পুন দেখি
ক্ষিপ্র বেগে শত্রুমাঝে ঝম্প দিয়া, এ কি
অসঙ্কোচে অনুসরি বেদুঈন-রীতি
সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রান্তে ঝুলায়ে ঝটিতি
রক্তাক্ত শিকারটিরে, হও নিরুদ্দেশ।
কভু দেখি ধরিয়াছ অপরূপ বেশ
পাংশু মাথা লাল ডানা; কভু লাল শির
ডানায় নীলাভ পাংশু ভঙ্গী তুরমতীর।
মাঝে মাঝে মনে হয় ঋষি দুর্বাসার
তুমিই কি পক্ষীরূপ? অথবা দুর্বার
চেঙ্গিস নাদির কোন ধর পক্ষীসাজ।
পক্ষী-জগতের বজ্র, হে বিহঙ্গ বাজ,

কহ, কহ, সমুত্থত-নখ-চঞ্চুবান,
রুদ্রবীণে তুমিই কি সারঙের তান ?

কাজল গৌরী

ও রূপসী বণিকবধূ
মাথা তোমার করছে ধূ-ধূ
হঠাৎ কেন করলে এমন ক্ষৌরী,
হলদে পাখী বললে হেসে
দিলাম দেখা নূতন বেশে
নামটি আমার এখন কাজল গৌরী।
বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম
কালার দেখা পেয়েছিলাম
মাথার কালো হারিয়ে গেল সেই কালোয়,
তাহার ধটির পীতবরণ
হলদে রঙও করবে হরণ
থাকব কি আর তখন আমি এই আলোয় ?
শুনি এই নিদারুণ বাণী
আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িলাম জীর্ণ গীতাখানি।

ডানা

পাখীর ডানা আছে, তুমিও ডানা
আকাশে উড়িবার নাই তো মানা
কিন্তু জানি তুমি উড়িবে না গো,
মনে মনে তারই দরশ মাগো
যাহার বাজারেতে অনেক দাম
স্বর্ণ-পিঞ্জর যাহার নাম

হারেম বলে কেউ, কেউ বা ঘর,
সবাই চেনা-শোনা নাইক পর,
তাহারই নিরাপদ কোমল কোলে
জানি গো জানি তব হৃদয় দোলে,
অজানা আকাশেতে দেবে না হানা
যদিও নাম তব শ্রীমতী ডানা।

কবিতাটি প'ড়ে ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। কবির দিকে চেয়ে দেখলে একবার। কবি নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখে যাচ্ছিলেন, ফিরে চাইলেন না। ডানা তবু চেয়েই রইল, তার মনে যে প্রতিবাদটা জেগে উঠেছিল, সে ভাবছিল, সত্যিই কি সেটা অন্তরের কথা তার? অজানা আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাহস তার আছে কি? সহসা মনে হ'ল, আছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে অজানা পথেই তো চলছে। শুধু সে কেন, সকলেই। মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, অজানা জগতেই এসে অবতীর্ণ হয় সে। তার পর থেকে প্রতিমুহূর্তে তার অভিযান চলে অজানাকে জানবার, অনায়ত্তকে আয়ত্তে আনবার। এই চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে ডানা কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারল না। পৌঁছবার আগেই কবি বাধা দিলেন।

"একটা খবর তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। নিখিল বদলি হয়ে গেল এখান থেকে। তার জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিস্টার বোস। তিনি নাকি চেনেন তোমাকে। আসবেন তোমার কাছে একদিন।"

"মিস্টার বোস?"

"হ্যাঁ, ভাস্কর বসু।"

ডানা স্তম্ভিত হয়ে রইল।

১৪

যে ভাস্কর বসুর সঙ্গে রেঙ্গুনে আলাপ ছিল, যার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে-ই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। কথাটা বিশ্বাস করতে সাহস হ'ল না ডানার। কিন্তু আর কোনও ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার তো আলাপ নেই। তা হ'লে…। আশা-আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠল তার। বিয়ে করেছে কি ভাস্কর? যদি ক'রে থাকে, যদি না ক'রে থাকে—উভয়বিধ সম্ভাবনার জন্যেই সে নিমেষে প্রস্তুত ক'রে নিলে নিজেকে। যেন পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে। বাইরে কিন্তু কোনও বিচলিত ভাব দেখা গেল না তার। কবি ঝুঁকে কি একটা কাগজ দেখছিলেন, ডানা তাঁর দিকে শান্তমুখেই চেয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল, "ভাস্কর বসুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে নাকি?"

কবি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, "না। শুনছি লোকটা ট্যাঁস-মার্কা। আলাপ হবেই একদিন। ব্যস্ত কি! যেচে আলাপ করতে যাব কেন?"

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চেয়েই রইলেন খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে। তারপর বললেন, "একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করেছি পুরনো কাগজপত্র থেকে। অমরবাবুও বোধ হয় জানেন না ব্যাপারটা।"

"কি?"

"তুমি যে বাড়িটাতে আছ আর ওই সন্ন্যাসী যে পোড়ো বাড়িটাতে আছেন—ওই বাড়ি দুটো আর ওর সংলগ্ন বিশ বিঘে জমি অমরবাবুর নয়। ওটা সহায়রাম ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকের। সমস্ত জমিদারিটাই এককালে তাঁর ছিল। রত্না দেবীর বাবা তাঁর কাছ থেকে জমিদারিটা কেনেন। গঙ্গার ধারের ওই বাড়ি দুটো আর ওই বিশ বিঘে জমি তিনি বিক্রি করেন নি, আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল বোধ হয়, এসে বাস

করবেন। কিন্তু আর আসেন নি। ওটা ক্রমশ অমরবাবুর সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো—"

ডানার মনে পড়ল, সন্ন্যাসী বলছিলেন যে ছেলেবেলায় তিনি এখানে ছিলেন। সহায়রাম চট্টাচার্যের তাঁর সম্পর্ক নেই তো। তাঁর বাবা এখানকার পোস্ট-অফিসে টাকা জমিয়ে গেছেন···চকিতের মধ্যে অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলে গেল তার মনে। কিন্তু কোন কথা বললে না সে। শান্তমুখে ব'সে রইল চুপ ক'রে। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললে, পোস্ট-অফিসে যখন পাসবুক আছে তখন সন্ন্যাসীর সব খবর সে বার করতে পারবে। যদি পারে, তখন··· চিন্তা আর এগোল না। তখন কি করবে সে? বিশেষ কিছুই তো করবার নেই। বিশেষ কিছু করবার নেই, এই কথাটা মনে হওয়াতে বিমর্ষ হয়ে পড়ল সে। ওই উদাসীন লোকটা আজ এখানে আছে, কাল আবার অন্যত্র চ'লে যাবে, কোন ঘটনাই তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না কোথাও।

কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন।

"আমার সব রান্না হয়ে গেছে। এইবার রূপচাঁদবাবু এলেই তোমরা খেতে বসতে পার। আমি তোমার জন্যে নিরামিষ রান্না করেছি, রূপচাঁদবাবু নিজেই নিজের জন্যে মাংস রান্না ক'রে আনবেন। আমি আর আঁষের হাঙ্গামাই করি নি এ বেলা। উনি এখানে কাজ করছেন, চল তুমি ও-ঘরে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। এখানে বক বক করলে উনি রাগ করবেন এখুনি আবার। রাগটি তো কথায় কথায় কিনা। লেখাপড়ার সময় টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।"

কবি কোন কথা না ব'লে গৃহিণীর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু ক্ষণকাল। তারপর আবার কাগজপত্রে মন দিলেন। রূপচাঁদবাবু আসবেন শুনে ডানা মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কিন্তু তার বাইরের শান্তভাব ব্যাহত হ'ল না তাতে। মন্দাকিনীর কথা শুনে হাসিমুখে সে উঠে দাঁড়াল।

কবি তার দিকে চেয়ে বললেন, "আমি একটা নতুন কবিতা লিখেছি আজ সকালে। সেটা ও-খাতায় নেই। অন্য আর একটা খাতায় আছে। পরে দেখাব। খাওয়াদাওয়ার পর।"

মন্দাকিনী ঠোঁট উলটে বললেন, "আমি মুখ্যু মানুষ। ও-সবের কিছু বুঝি না। তোমার ভাল লাগে বুঝি?"

ডানা হেসে বললে, "লাগে একটু একটু।"

"তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, কত পরীক্ষা পাস করেছ, তোমার তো লাগবেই। চল ও-ঘরে।"

পাশের ঘরে গিয়ে ডানা বললে, "পরীক্ষা পাস করলেই বা, আপনার সংসারের বিষয়ে যত জ্ঞান যত বুদ্ধি আছে তার সিকির সিকিও আমার নেই। আমি কতকগুলো বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাস করেছি মাত্র।"

মন্দাকিনী মনে মনে খুশী হলেন। তাই একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, "তাই বা ক'টা মেয়ে পারে। ক'টা ছেলেই বা পারে। আমার খোকন তো এবার প্রমোশনই পেল না। কেবল ঘুড়ি, ঘুড়ি আর ঘুড়ি—"

বিছানায় দুজনে পাশাপাশি বসলেন।

মন্দাকিনী বললেন, "তোমাকে দেখে আমার শঙ্করীকে মনে পড়ছে। তোমার চিবুকের দিকের গড়নটা ঠিক শঙ্করীরই মত। তার চোখ অবশ্য তোমার চোখের মত ভাসা ভাসা নয়, ধরণ-ধারন কিন্তু তোমারই মত। মুচকি মুচকি হাসে, বেশী কথা বলে না। অনেক দিন চিঠি পাই নি মেয়েটার। তার কোলের মেয়েটা কেমন আছে কে জানে।"

এইভাবে আলাপ শুরু ক'রে মন্দাকিনী নিজের জগতে নিয়ে গেলেন ডানাকে, যে জগতে মলোটভ বা নেহরুর চেয়ে সুন্দরী গাই

বড়, বেকার-সমস্যার চেয়ে বড়ি-সমস্যার প্রাধান্য বেশী। কথায় কথায় তাঁর ভাইয়ের বিয়ের কথাও উঠে পড়ল; বিয়েতে কতরকম বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, কত জিনিস নষ্ট হয়েছিল (আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত গামলা গামলা সন্দেশ রসগোল্লা চুরি করছিল—নীচু গলায় বললেন খবরটা), পাত্রীপক্ষ অলঙ্কারে, বরাভরণে কি রকম কৃপণতার পরিচয় দিয়েছিল, এমন খেলো চেলী দিয়েছিল যে রঙ উঠে যাচ্ছিল, আংটিটা পেতলানি, দানের বাসন কংকডে, নগদ টাকা তো দেয়ই নি—যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে তারা। তবে মেয়েটি সুন্দরী। তা ছাড়া ঘরের কাজকর্মও ভাল জানে। চমৎকার মোরব্বা তৈরি করেছিল। আচারও নাকি চমৎকার করে শুনলাম। আচার-প্রসঙ্গ এসে পড়াতে মন্দাকিনীর ক্ষোভ উথলে উঠল। ঠিক সময় কুল কেনা হয় নি ব'লে এবার তিনি কুলের আচার করতে পারেন নি। উনি (আনন্দবাবু) যদি একটু হুঁশ ক'রে কিনে রাখতেন তা হ'লে হ'ত, কিন্তু ওঁকে বিধি যে কি দিয়ে নির্মাণ করেছেন তা তিনিই জানেন। এ অঞ্চলে কুল একটু দেরিতে পাকে, কুল পাকবার আগেই তাঁকে ভায়ের বিয়ের জন্যে চ'লে যেতে হ'ল, কুল কেনা হ'ল না। এবার আমের কাসুন্দি করবার ইচ্ছে আছে। হঠাৎ মন্দাকিনী ডানার ব্লাউসের হাতাটায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ছুঁচের কাজ তুমি নিজে করেছ?"

ডানা লজ্জিত হয়ে বললে, "আমিই করেছি। কিন্তু ভাল হয় নি, আমি ভাল জানি না।"

"কেন, বেশ চমৎকার হয়েছে তো। আমি এসব কিছুই পারি না। কাঁথা সেলাই করতে দাও, পারব। পাড় জুড়ে জুড়ে পরদা বা বিছানার চাদর করতে দাও, পারব। কিন্তু ছুঁচ দিয়ে ফুল পাখী লতাপাতা আঁকা—এ আমার দ্বারা হয় না। কেউ তো শেখায় নি ছেলেবেলায়। শঙ্করীটা পারে। এক মাস্টারনী শিখিয়েছিল ওকে।"

ডানা চিত্রার্পিতবৎ ব'সে ব'সে শুনে যাচ্ছিল। যে জগতে সে মানুষ হয়েছে সে জগতেও গৃহকর্ম-নিপুণা গৃহলক্ষ্মীরা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন আলাদা জাতের। বিদেশী সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগে তাঁদের স্বভাবটা একটু যেন দোআঁশলা-গোছের হয়ে গিয়েছিল। চাকরকে 'বোয়' ব'লে ডাকতেন, বাইরের কেউ এলে চট ক'রে তার সামনে বেরুতে পারতেন না। দু সেকেণ্ডের জন্যেও অন্তত আয়নার সামনে না দাঁড়িয়ে অচেনা লোকের সামনে বার হওয়া অসম্ভব ছিল তাঁদের পক্ষে। যখন বার হতেন তখন মুখে ঝুলত একটা মেকি হাসি। মন্দাকিনীর মত এ রকম বেশে বাইরের কারো সামনে ব'সে গল্প করার কল্পনাও করতে পারতেন না তাঁরা। তাঁদের গল্পও পোশাকী গল্প, খবরের কাগজের খবর, আবহাওয়া, বড় জোর মার্কেট-সংক্রান্ত দু-চারটে কথা। অন্তরের কথা নয়। তাঁরা যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তাঁদেরও অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের, মন্দাকিনীর মতো নয়। শুধু যে তাঁরা টেবিলে খেতেন বা ইংরেজী বকুনি দিয়ে কথা বলতেন ব'লেই স্বতন্ত্র জাতের তা নয়, তাঁদের মন এবং চরিত্রের গড়নই ছিল অন্য রকম। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়াতে মজা লাগল একটু। মনে পড়ল, বিপদে পড়লে এই স্বতন্ত্র সংস্কারে গঠিত চরিত্র বা মন এক নিমেষে বদলে যেতেও সে দেখেছে। জাপানীরা যখন বর্মায় বোমা ফেলল তখন তাদের এক সাহেবী-মেজাজের প্রতিবেশী মিস্টার বিশওয়াস্ বদলে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন দলবদ্ধ হয়ে পালাচ্ছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে দাড়িওলা গলায়-রুদ্রাক্ষের-মালা এক বেঁটে কালো-গোছের লোক ছিলেন। তিনি বিশওয়াস্-পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন কয়েক দিনের মধ্যে। বহু লোক একসঙ্গে পালাচ্ছিল। কয়েক দিন মিস্টার বিশওয়াস্দের খবর পাওয়া যায় নি ভিড়ের মধ্যে। সবাই তখন নিজের নিজের সামলাতে ব্যস্ত। দিন দশেক পরে হঠাৎ তাঁদের দেখা গেল

একেবারে ভিন্ন চেহারায়। মিস্টার বিশওয়াস্ হঠাৎ ভোল বদলে একেবারে বিশ্বেস মশাই হয়ে গেছেন। মাথা কামিয়ে টিকি রেখেছেন, গায়ে নামাবলী। মিসেস বিশ্বাসের ঠোঁটে রুজ নেই, কপালে তিলক। তিনি নিষ্ঠাভরে নিজেকে বিপত্তারিণী-ব্রতে নিযুক্ত করেছেন।

মন্দাকিনী বক্ বক্ ক'রে ব'কেই চলেছিলেন। ভানা যে তাঁর কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না, সে খেয়ালই তাঁর ছিল না। তিনি যেন তাঁর শঙ্করীকে পেয়ে তার কাছেই বহুদিনকার সঞ্চিত সংবাদ সব ব'লে যাচ্ছিলেন অসঙ্কোচে। পাশের ঘরে রূপচাঁদের গলা পেয়ে তাঁর একটু হুঁশ হ'ল, মাথার কাপড়টা টেনে উঠে দাঁড়ালেন।

"রূপচাঁদবাবু এসে গেছেন। এবার খাবার ঠিক করি তোমাদের। রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে তো ?"

"আছে।"

"তা হ'লে পাশের ঘরেই বসবে চল।"

বলা বাহুল্য, রূপচাঁদবাবুর সামনে ভানার যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তবু বেশ সপ্রতিভভাবেই পাশের ঘরে গেল।

ভানাকে দেখে রূপচাঁদবাবু একটু অবাক হয়ে গেলেন।

"এ কি, তুমি এখানে ? আমি তোমার বাড়ি হয়ে ঘুরে এলাম।"

"কেন, কোনও দরকার ছিল ?"

"একটা খবর দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে হঠাৎ এখান থেকে বদলি ক'রে দিয়েছে। খবর পেলাম, মিসেস সেনগুপ্তের ইঙ্গিতেই এটা নাকি হয়েছে। পুলিস সায়েব তাঁর নাকি চেনা লোক। মল্লিককেও তিনি বিপন্ন করেছিলেন। আনন্দমোহনের কল্যাণে সে বেচারা ছাড়া পেয়েছে। মল্লিকের না হয় কিছু দোষ ছিল, কিন্তু আমাকে কি অপরাধে বদলি করা হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না।

তাই তোমার কাছে জানতে গিয়েছিলাম, তুমি কিছু জান কি না। তুমি রত্নপ্রভা দেবীর পেয়ারের লোক—হয়তো জানতেও পার।”

“আমি কিছুই জানি না। আপনার বদলির খবর আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।”

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ডানার মনে হ'ল, তার দু গালে কে যেন দুটো ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে। তার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। আনত চক্ষে ব'সে রইল সে।

“যাক, এ ব্যাপারটা শেষ হ'ল মোটামুটি এখন।”

কবি সশব্দে মোটা খাতাখানা বন্ধ ক'রে দিলেন।

“কি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলে তুমি? কবিতা লিখছিলে, না, আর কিছু?”—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

“কিছুক্ষণ আগে কবিতা লিখেছি একটা। কিন্তু এই খাতাটায় সমস্ত প্রজাদের একটা বর্ণানুক্রমিক সূচী ও তাদের পরিচয় লিখে ফেললাম। আচ্ছা, সহায়রাম ভট্টাচার্যকে চেন তুমি, নাম শুনেছ কখনও তাঁর?”

“না। কোথাকার লোক?”

“এককালে তিনিই এই জমিদারির মালিক ছিলেন। রত্নপ্রভা দেবীর বাবা, মানে—অমরবাবুর শ্বশুর তাঁর কাছ থেকেই জমিদারিটা কেনেন। কিন্তু নদীর ধারের বিশ বিঘে জমি আর দুখানা বাড়ি তিনি বিক্রি করেন নি। একটা বাড়িতে ডানা থাকে আর একটাতে ওই সন্ন্যাসী থাকেন।”

এ নিয়ে আরও আলোচনা চলত, কিন্তু মন্দাকিনী এসে বললেন, “লুচি ভাজছি, তোমরা বসবে চল।”

রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, “ভাত নেই? মাংসে একটু বেশী ঝোল থেকে গেছে। চারটি গরম ভাত পেলে ভাল হ'ত।”

“ভাত আছে বইকি।”

"তবে চলুন।"

ডানা খেতে ব'সে অবাক হয়ে গেল। মন্দাকিনী এক হাতে দশ রকম নিরামিষ তরকারি, দু রকম ডাল, পায়েস, এমন কি পিঠে পর্যন্ত করেছেন। এত রকম এবং এমন সুস্বাদু নিরামিষ তরকারি সে জীবনে আর কখনও খায় নি। খেতে খেতে রূপচাঁদের বদলি নিয়েই আলোচনা হতে লাগল। পূর্ণিয়ায় বদলি করেছে তাঁকে। জায়গাটা বড় অস্বাস্থ্যকর, গেলেই নাকি ম্যালেরিয়া হয়। ডানা এ আলাপে যোগ দিল না। খাওয়া শেষ হবার পর রূপচাঁদ ডানার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? যাও তো পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।"

"আমি একটু পরে যাব। আপনি যান।"

রূপচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চ'লে গেলেন।

সকলের খাওয়ার পর মন্দাকিনী খেতে বসলেন। ডানা তাঁর কাছে বসল গিয়ে।

"এ কি, আপনি আর কিছু খাবেন না?"

মন্দাকিনী দুখানি রুটি, একটু তরকারি আর গুড় নিয়েছিলেন।

"রাত্রে বেশী খেলে হজম হয় না। ভাত লুচি কিছু না। দুখানি শুকনো রুটি খাই, তাও রাত্রে দুবার উঠে জল খেতে হয়।"

মন্দাকিনী রান্নাঘরের এক ধারেই খেতে ব'সে ছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ডানা ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্যেই একটা আসন নিয়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ব'সে আছে। বসবার ধরন দেখেই তিনি বুঝতে পারছিলেন, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ব'সে নেই সে। অসুবিধা হচ্ছে।

"তুমি ওপরে ওঁর কাছে গিয়ে ব'স না। আমার কাছে আর বসতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েও গেল।"

একটি ছোট ঘটি বাঁ হাতে তুলে আলগোছে জল খেয়ে আহার শেষ করলেন তিনি।

"তুমি ওপরে যাও। আমার সারতে-সুরতে এখনও ঢের দেরি।"

"আমি তবে চ'লেই যাই। আর একদিন আসব।"

ডানা কবির সঙ্গে যখন ওপরে দেখা করতে গেল, তখন তিনি লিখছিলেন। ডানাকে দেখে বললেন, "এ কবিতাটা নিয়ে যাও, বাড়ি গিয়ে প'ড়ো। এখানে পড়বার নয় ওটা।"—ব'লে তিনি মুচকি হাসলেন।

"এখনই লিখলেন নাকি?"

"না। আগেই লিখেছি। টুকে দিলাম এখন। অনেকদিন পরে এ ধরনের কবিতা লিখলাম। লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল, শুনলে হয়তো তোমার ভালই লাগবে।"

"কি কথা?"

"এ ধরনের কবিতা আর লিখব না।"

"কেন?"

"লিখতে পারব না। যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে।"

কবি স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, "কিন্তু সেই জোয়ারের মুখে নৌকো ভাসিয়ে যে অমরাবতীতে আমি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। যদি হাতে কোনদিন পয়সা হয় কবিতাগুলো ছাপাব, আর তুমি যদি আপত্তি না কর তোমাকে উৎসর্গ করব সেগুলো।"

এর উত্তরে ডানা কিছু না ব'লে একটু মুচকি হেসে চ'লে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে একটা কথা তার মনে হ'ল। যে রকম যোগাযোগ ঘটছে, তাতে তার জীবনে নবপর্বের সূচনা হবে বোধ হয়। এখানে যে-লোকটি দুষ্টগ্রহের মত তার জীবনের আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তিনি অস্ত যাচ্ছেন। রূপচাঁদের বদলির খবরটা

পেয়ে তার মনের একটা অংশ খুশীই হয়েছিল ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'লেও এ কথা সে না মেনে পারছিল না যে, ওই লোকটিই তার নারীসত্তাকে এমন একটি মূল্য দিয়েছিল যা আর কারও দেবার সাহস হয় নি, এবং যে মূল্য পেয়ে সে গর্বই অনুভব করেছিল মনে মনে। তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি সে নানা কারণে, কিন্তু তার বলিষ্ঠ পুরুষোচিত আকুলতাকে সে সত্যি সত্যি ঘৃণা করে নি কখনও। ভয় পেয়েছে, ঘৃণা করে নি। রূপচাঁদবাবু আর তার জীবনে ছায়াপাত করবেন না—এই সম্ভাবনাতে তাই সে একটু বেদনাও বোধ করল যেন। বেদনাটা আরও বাড়ল কবির কথা ভেবে। তাকে দেখে তাঁর মনে যে জোয়ার এসেছিল তা নেবে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে আর তিনি কবিতা লিখবেন না—এ সংবাদটাও স্বস্তিকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হ'ল না। মনে হতে লাগল, তার জীবন থেকে কি যেন একটা হারিয়ে গেল চিরকালের মত। পর-মুহূর্তেই মনে হ'ল, ভাস্কর এসেছে। মনে পড়ল তার কথা—'তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব, আর কাউকে বিয়ে করব না।' অপেক্ষা ক'রে আছে কি ? হঠাৎ তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠল খবরটা জানবার জন্যে।

"মাসীমা—"

"কে ?"

"আমি চণ্ডী। কলকাতা থেকে একটা লোক চমৎকার একটা হলদে পাখী নিয়ে এসেছে। অমরবাবুর স্ত্রী পাঠিয়েছেন। বকুল-মাসীমাকে তিনি একটা পাখী পাঠাবেন ব'লে গিয়েছিলেন। হয়তো এইটে সেই পাখী। তাই আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম—"

"ও ! আচ্ছা, চল দেখি।"

সত্যিই রত্নপ্রভা বকুলবালার জন্যে চমৎকার একটা হলদে পাখী পাঠিয়েছিলেন। চিঠিও একটা লিখেছিলেন—

ডানা,

শ্রীমতী বকুলের জন্যে হলদে পাখী পাঠালাম একটা। এই বছরেরই বাচ্চা। তাঁকে পাখীটা পাঠিয়ে দিও। তোমার সমস্যার, আশা করি, সমাধান হয়ে গেছে। অনিলের (মিস্টার গুপ্ত) চিঠি পেয়েছি। আমরা এবার কাশ্মীর পাড়ি দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে ঠিকানা জানাব। কালই আমাদের রওনা হওয়ার কথা। আশা করি, তোমরা সব কুশলে আছ। পাখীগুলোর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরেই রইল। ওদের সম্বন্ধে যা ভাল মনে কর ক'রো। যদি ইচ্ছে কর, ছেড়ে দিতেও পার। ওঁর এখন চিড়িয়াখানা করার দিকে তত ঝোঁক নেই। ঝোঁক হয়েছে বিদেশে গিয়ে (ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ও-দেশের সমুদ্রের ধারে ধারে) বিদেশী পাখীদের পরিচয় লাভ করা। টাকার যোগাড় যদি হয় চ'লে যেতে পারি। সুতরাং তুমিই ওই পক্ষী-নিবাসের সর্বেশ্বরী হয়ে থাক। ওখানকার জমিদারির আয় থেকেই তোমাদের খরচ চ'লে যাবে। আমরা ওখান থেকে আপাতত কিছু নেব না ঠিক করেছি। আনন্দমোহনবাবুকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি স্নেহ-আশীর্বাদ নিও। ইতি

রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

ডানা যতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিল চণ্ডী সোৎসুকে চেয়ে ছিল তার মুখের দিকে। পড়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করলে, "আমাদেরই পাখী, নয় ?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাও। আমার চাকরটাই গিয়ে দিয়ে আসুক। আমি চিঠিও লিখে দিচ্ছি একটা। দাঁড়াও একটু—"

চিঠিটা রূপচাঁদবাবুরও হাতে পড়বে এই সম্ভাবনাটা মনে হ'ল তার। তাই অতি সংযত ভাষায় ছোট চিঠি লিখলে একটা—

শ্রীমতী বকুলবালা,

আপনার জন্যে রত্নপ্রভা দেবী কলকাতা থেকে একটা হলদে পাখী উপহার পাঠিয়েছেন। পাঠালাম এই সঙ্গে। শুনলাম, আপনারা বদলি হয়ে গেছেন। যাব একদিন আপনাদের বাড়িতে। নমস্কার জানবেন। ইতি

ডানা

পাখী নিয়ে ওরা যখন চ'লে গেল, তখন চুপ ক'রে ব'সে রইল সে বারান্দায় একা। মনে হ'ল, সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে। চোখে পড়ল কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঠেছে বটগাছের মাথার উপরে। একটা উপমা মনে এল, সংস্কৃত কাব্যের উপমা, বটগাছটা যেন ধূর্জটির জটাজাল, সেই জটাজালে সুশোভিত হয়েছে বঙ্কিম চন্দ্র। চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—পাপিয়াটা ডেকে উঠল দূরের একটা গাছ থেকে। তার আকুল স্বরে ডানার মনের আকুলতাই ফুটে উঠল যেন। আরও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। তারপর ঘরে ঢুকে শোবার আয়োজন করতে লাগল। ব্লাউসটা খুলতে গিয়েই কবিতাটা বেরিয়ে পড়ল। সে কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল। আলোটা কমানো ছিল টেবিলের উপর। সেটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু জুৎ ক'রে ব'সে কবিতাটা পড়তে লাগল—

ঝাঁ-ঝাঁ রোদে রুক্ষ মাঠের মাঝ দিয়ে
একা চলেছিলে তুমি।
কাছাকাছি আর কেউ ছিল না, আমিও না,
তুমি নিজেও ছিলে না নিজের কাছে।
আমি যে সুদূর লোক থেকে দেখেছিলাম তোমাকে
হয়তো তারই উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিলে,
কিন্তু নিজেই তা জানতে না॥

মনে হচ্ছিল তৃষ্ণার্ত মাঠের আর্ত কামনা মূর্ত হয়েছে,
তোমার চলাটা মনে হচ্ছিল প্রবাহ ॥
স্বচ্ছতোয়া তন্বী তটিনীর উপর নেমেছে নব জলধর,
এক জোড়া খঞ্জন উড়ছে,
নীল শাড়িতে ফুটেছে আকাশের মহিমা,
চলার বেগে অকুণ্ঠিত ঔদাসীন্য ॥
রুক্ষ মাঠের তৃষ্ণার্ত কামনা যে ছবি সেদিন এঁকেছিল,
জানি তুমি তা নও,
কখনও হবে না তা-ও জানি।
কিন্তু সত্যি তুমি যা
তা নিয়ে স্বপ্নের ছবি আঁকা যায় না।
তোমার ভঙ্গুরতা তোমার ক্ষণিকের সত্যকে,
যে রূপে তুমি সকলের কাছে পরিচিত হয়েছ তাকে,
চুরমার ক'রে দেবে একদিন।
বেঁচে থাকবে শুধু এই স্বপ্নটুকু।
অলীক রঙে আঁকা এই ছবিটি, যা তুমি নও,
যা তুমি হবে না ॥

ডানা কবিতাটা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বার দুই পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অধরে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল একটি। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সে থেকে সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখলে কবিকে নয়, ভাস্কর বন্ধুকে।

৬৫

পরদিনই ভাস্কর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল ডানার। ভাস্কর বন্ধু নিজেই এসেছিলেন দেখা করতে। তিনি যখন আসছিলেন তখন

ডানা তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু চিনতে পারে নি। যে লোক সিগারেটটি পর্যন্ত খেত না, তার মুখে যে অত বড় পাইপ ঝুলবে তা প্রত্যাশা করতে পারে নি সে। পরনে খাকী রঙের হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট, হাতে ছোট একটা বেত, চোখে গাঢ় কালো রঙের গগল্‌স্‌। ডানা বারান্দায় ব'সে চিঠি লিখছিল, লিখতে লিখতে একবার চোখ তুলে দেখতে পেয়েছিল তাকে। দেখে বিরক্তই হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, কোনও বেকার ছোকরা বোধ হয় আসছে তাকে বিরক্ত করতে। অনেকে আজকাল আসে অমরবাবুর 'পক্ষী-নিবাস'টা দেখতে। অসংলগ্ন অবান্তর প্রশ্ন করে নানারকম। প্রশ্ন শুনলেই মনে হয় পাখীর সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই, কেবল খানিকটা সময় কাটাতে এসেছে।

"চিনতে পারছ আমাকে ?"

গগল্‌স্‌ খুলে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালেন ভাস্কর বসু। বজ্র প'ড়ে ডানার স্বপ্নসৌধ যেন চুরমার হয়ে গেল। এই সেই ভাস্কর ? এত পরিবর্তন হয়েছে ! চোখের কোলে কালি, রঙও ময়লা হয়ে গেছে, কেবল চোখের দৃষ্টিটাই উজ্জ্বল আছে তেমনি। আরও উজ্জ্বল হয়েছে বোধ হয়। ডানা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠল।

"ভাস্কর ! এস, এস। তুমি এমন ভাবে আসবে তা প্রত্যাশা করি নি। কাল আনন্দবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে, ভাস্কর বসু নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন এখানে, তখন—"

"আমি এসেই তোমার খবর পেলাম এস. পি. মিস্টার গুপ্তের কাছে। 'মিস্ ডানা' শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর তিনি যখন বার্মা রেফিউজি বললেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। শুনলাম, এখানে তুমি কোন পক্ষী-নিবাসের কর্ত্রী হয়েছ ? ব্যাপারটা কি ? পোল্‌ট্রি ?"

"না। চাকরি। এখানকার জমিদার অমরেশবাবু একজন

পক্ষীতত্ত্ববিৎ। তিনি অনেক রকম পাখী ধ'রে রেখেছেন এখানে। তারই তত্ত্বাবধান করি আমি।"

"আই সি। কতদিন আছ?"

"ছ মাস হয়ে গেল। নভেম্বর মাসের শেষে এসেছিলাম।"

"একাই আছ? মিস্টার গুপ্ত তাই বললেন যেন।"

ভাস্কর বসু উঠে এসে আরাম-কেদারাটায় ব'সে পাইপে টান দিয়েই বুঝলেন, পাইপ নিবে গেছে। নিবিষ্ট মনে সেইটেই ধরাতে লাগলেন।

"একাই আছি।"

"আর সবাই কোথা?"

"মারা গেছে। আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তুমি শোন নি?"

"বাই জোভ, বল কি! না, কিছু শুনি নি তো। আমি অনেক দিন এ দেশে ছিলাম না।"

ভাস্কর বসু সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারের উপর। ডানা চুপ ক'রে রইল।

তারপর সব বলতে লাগল। তার নূতন জীবনের মাঝখানে পুরাতন জীবনটা হঠাৎ এসে হাজির হ'ল যেন খানিকক্ষণের জন্য।

৯৬

দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদে সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চরের উপর। জ্যোৎস্নার মত রোদটাকেও তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। দৈহিক কষ্টটাকে আমলই দিচ্ছিলেন না; যে বোধ-শক্তি আরাম বা কষ্টের কারণ সেই শক্তিটাকেই তিনি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছিলেন, যাতে সে কষ্টটাকেও সুখ ব'লে গণ্য করে। তাঁর মনে হচ্ছিল, যে মুহূর্তে তিনি সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা

উপলব্ধি করতে পারবেন সেই মুহূর্তে সত্যকেও উপলব্ধি করবেন। সুদূর আকাশে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে একটা শকুনি উড়ছিল। তারই দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ হাত তুলে তাকে নমস্কার করলেন। মনে মনে বললেন, সুদূর আকাশে উঠেছ তুমি। অনেক জিনিসই তোমার চোখে পড়ছে। শুভ্রমেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে দিগ্বলয়ের কাছে। কিন্তু আমি জানি, তুমি ওসব কিছুই দেখছ না। তুমি ব্যাকুল হয়ে সন্ধান করছ, মড়া কোথায় আছে। ও ব্যাকুল একাগ্রতা যদি আমারও থাকত। কিছুতেই একাগ্র হতে পারছি না, কিছুতেই নিস্পৃহ হতে পারছি না। মায়া কেটেও যেন কাটছে না। এই স্থানটার মোহ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। আবার পদচারণ শুরু করলেন। গম যব ছোলা মটর সব কাটা হয়ে গেছে। চরের যে সব জায়গায় ফসল ফলেছিল সে সব জায়গা আবার প্রস্তুত হচ্ছে নূতন ফসলের জন্য। সন্ন্যাসী চেয়ে দেখলেন সদ্য-কর্ষিত জমিগুলোর দিকে। যে গম যব ছোলা মটর তাদের অলঙ্কৃত করেছিল একদিন, বুকে ক'রে ধ'রে রেখেছিল যাদের, তাদের সম্বন্ধে সামান্যতম শোক বা মোহের চিহ্ন তো নেই। তুমি নির্বিকার। তার কাছে ভাল গাছ খারাপ গাছ দুইই সমান; ফুল, শস্য, খাদ্য, বিষ সমস্তই সে উৎপাদন করে, কিন্তু কাউকে আঁকড়ে থাকতে চায় না। তারা দলে দলে আসে আর চ'লে যায়। সে নির্বিকার। নির্বিকার ব'লেই এত অসংখ্য সম্ভাবনার জননী সে সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুয়ে পড়লেন ভূমির উপর। উত্তপ্ত চরের নিদারুণ উষ্ণতা প্রবেশ করতে লাগল তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর মনে হতে লাগল, বীর্যবতী জননীর আশ্বাসবাণী যেন সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গে। তিনি যেন বলছেন—ভয় নেই, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে; থেমো না, এগিয়ে চল। সন্ন্যাসী আবার উঠে বসলেন। স্থির হয়ে ব'সে রইলেন চোখ বুজে। তাঁর খুব কাছে একটি বকও ধ্যানমগ্ন হয়ে ব'সে ছিল অনেক আগেই থেকেই

সন্ন্যাসীকে দেখে সে স'রে গেল না। সন্ন্যাসীকে চিনত সে। নিঃসংশয়ে জানত, এঁর দ্বারা কোনও অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই তার। অনেক দিন এসেছেন, বসেছেন, বেড়িয়েছেন, স্নান করেছেন, কোনদিন তাকে মারতে বা ধরতে যান নি। অনড় হয়ে ব'সে রইল বক। সন্ন্যাসীও অনড় হয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ—বেশ খানিকক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে নদীর জলে নামলেন। স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। তারপর উঠে ভিজে কাপড় প'রেই নিজেই সেই ভাঙা ঘরটির উদ্দেশে চলতে লাগলেন। স্নান করবার পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আসছিলেন, খাওয়ার মত যদি কিছু জুটে যায় পথে। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। আশা করতে লাগলেন, নদীর ধারে যে বেলগাছটা আছে তাতে একটা বেলও অন্তত পেয়ে যাবেন। ঘরে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, ডানার চাকর এক ঝুড়ি ফল নিয়ে ব'সে আছে। ঠিক এই রকম ব্যাপার আর একদিনও হয়েছিল।

চাকর বললে, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাইজীকে অনেক ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি আপনাকে কিছু পাঠিয়ে দিলেন।"

সন্ন্যাসী একটি মাত্র ল্যাংড়া আম তুলে নিয়ে বললেন, "আর আমার লাগবে না। ওগুলো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"আরও কিছু রাখুন।"

"না। আর দরকার নেই।"

সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকে গেলেন। চাকরটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চ'লে গেল।

৯৭

প্রথম কয়েকদিন ডানার সঙ্গে ভাস্কর বসুর যে পরিচয়টা হ'ল তা ঠিক পুরনো পরিচয় ঝালানো নয়, তা সম্পূর্ণ নূতন পরিচয়।

ভাস্কর বসু যে-ডানাকে দেখলেন, সে ডানা ঠিক তাঁর পূর্বপরিচিত তন্বী রূপসীটি মাত্র নয়। বর্মায় জাপানী বোমা না পড়লে যাকে তিনি বিয়ে ক'রে এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশ থেকে আর এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশে অনায়াসে স্থানান্তরিত করতে পারতেন, এ ডানা সে ডানা নয়। এর দেহ মন আরও পরিপুষ্ট হয়ে অনেক বদলে গেছে। এখন মুখের দিকে চাইলে এ আগেকার মত চোখ নীচু করে না, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে না, বেশ সপ্রতিভ ভাবে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে যায় না, বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়, অনেক সময় পালটা প্রশ্নও করে। অবশ্য সে জন্য আগের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর, ঢের বেশী লোভনীয়ও হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব ওকে আরও মোহিনী করেছে, মনে হ'ল, সেই ব্যক্তিত্বের বেড়াটা পেরিয়ে তার কাছে যাওয়া শক্ত, ঘনিষ্ঠ হওয়া আরও শক্ত।

ডানাও দেখলে, যে ভাস্কর বসুকে সে চিনত, যাকে নিয়ে তার মন স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল একদিন, এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি ঠিক সে লোক নন। তরুণ তেজস্বী রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার দীপ্তি নিবে গেছে। তার সঙ্গে এ লোকটির কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য নেই। একটা বহুমূল্য আসবাব অযত্নে বাইরে প'ড়ে থাকলে যেমন হয়, অনেকটা যেন তেমনি। রঙ চ'টে গেছে, জৌলুস নেই। ডানা একে দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু দু-চার দিন দেখবার পর সে ভাবটাও কেটে গেল। কৌতূহল হ'ল বরং। বাইরেটা বদলেছে। ভিতরটাও বদলেছে কি? দুজনেই পরস্পরের অন্তরের খবর নেবার চেষ্টা করছিল সোজাসুজি কোন প্রশ্ন না ক'রে। কথায় কথায় যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুই বেরুচ্ছিল না। দুজনেই সাবধানী। এই ভাবেই চলছিল।

...অসহ্য গরম ছিল সেদিন। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল

না। ডানা নিজের ঘরের জানলা কপাট বন্ধ ক'রে ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুয়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ভাস্কর বসুর কথাই ভাবছিল। রোজই প্রায় ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কিন্তু ও বিয়ে করেছে কি না তা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। সে নিজেও বলে নি, ডানা লজ্জায় ও-প্রসঙ্গ তোলেই নি। কিন্তু কথাটা জানবার জন্যে তার মন ছটফট করছে। মনে হচ্ছে যদি··· কিন্তু না, কথাটা মনে করতেও লজ্জা হচ্ছে। সে নিজের মুখে কিছুতেই বলতে পারবে না। নিজের মনের এই হ্যাংলাপনাতেই সে মরমে ম'রে যাচ্ছে। কিন্তু একটা সত্য সে কিছুতেই এড়াতে পাচ্ছে না, বরং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সেটা। ভাস্করের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়ে যায়, তা হ'লে অচিরাৎ তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আপাতত। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধটা করবে কে? যে সমাজে সে মানুষ হয়েছে, তা যদিও ঠিক গোঁড়া বাঙালী সমাজ নয়; কিন্তু সে সমাজেও পিতামাতারাই বিবাহ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী। তার তো কেউ নেই, তা হ'লে কি নিজেই তাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে? ভাস্কর বসুকে ছলা-কলায় ভুলিয়ে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধতে হবে অবশেষে? মৎস্যশিকারীরা টোপের লোভ দেখিয়ে মাছ ধরে যেমন ক'রে? কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল তার। কিন্তু··· চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বন্ধ দ্বারে টোকা পড়ল। মনে হ'ল, টোকা নয়, ঘুষি। কপাট খুলে দেখলে, বকুলবালা দাঁড়িয়ে আছেন। রোদের ঝাঁজে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। পিছনে চণ্ডীও রয়েছে।

"আসুন, আসুন—"

বকুলবালা বললেন, "একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন?"

ডানা কুঁজোতে হাত দিতেই বললেন, "খাব না, পা ধোব। পা দুটো ঝলসে গেছে আমার। রাস্তার ধুলো যেন তপ্ত খোলার বালি।"

"তা হ'লে চানের ঘরে চলুন—"

চানের ঘরে ঢুকে উপর্যুপরি কয়েক ঘটি জল ঢেলে বকুলবালা পা ধুলেন। তারপর নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়েই মুছলেন পা দুটি। ডানা একটা তোয়ালে এগিয়ে দিচ্ছিল, তিনি নিলেন না।

বললেন, "কি হবে তোমার ফরসা তোয়ালেটা ময়লা ক'রে? আমাকে তো একটু পরে কাপড় ছাড়তেই হবে। তখন ভাল ক'রে ধুপে কেচে নেব। এখন যে জন্য এসেছি তা বলি। চমৎকার পাখীটি পাঠিয়েছ ভাই। আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু ফাঁকই পাই নি। উনি কদিন ছুটি নিয়েছিলেন, বাড়িতে ব'সেই আপিসের কাজকর্ম করছিলেন। আমরা এখান থেকে বদলি হয়ে গেছি, মাসখানেক পরেই বোধ হয় চ'লে যেতে হবে। আজ উনি আপিসে গেছেন, তাই চ'লে এসেছি আমি। পাখী নিয়ে কিন্তু অনেক কাণ্ড হয়েছে ভাই। উনি পাখী দেখে ভয়ানক চ'টে গেছেন। বলছেন, অমরবাবুর স্ত্রীই মিথ্যে ক'রে ওঁর নামে লাগিয়ে ওঁকে এখান থেকে বদলি করিয়েছেন, তাঁর উপহার ফেরত দাও। আমি কিছুতেই রাজী হই নি। বাড়িতে সে কি ধুম কাণ্ড ওই পাখী নিয়ে, চণ্ডীকে জিগ্যেস কর না। বল্ না রে—"

চণ্ডী কিছু বলল না, মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু।

বকুলবালা বলতে লাগলেন, "আমি শেষে বলেছি, আমি নিজে কিছুতেই পাখী ফেরাতে পারব না। একজন ভদ্দরলোকের মেয়ে একটা উপহার পাঠিয়েছেন, তা আমি কোন্ মুখে ফিরিয়ে দিতে যাব? তোমার যদি চোখের চামড়া না থাকে তা হ'লে তুমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

এই ব'লে বকুলবালা এমন ভাবে ডানার দিকে চাইলেন যেন ডানাই রূপচাঁদবাবু। ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল, কি আর বলবে?

বকুলবালা তখন আসল প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"উনি যে রকম জেদী লোক, ঠিক পাখীটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আসবেন। তখন তুমি যেন ঘুণাক্ষরেও ব'লো না যে, আমি অমরবাবুর স্ত্রীর কাছে পাখী চেয়েছিলাম; তা হ'লে কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন বাড়ি গিয়ে। উনি পাখী যদি ফেরাতে আসেন, তা হ'লে তুমি টুঁ শব্দটি না ক'রে পাখীটি নিয়ে নিও। চণ্ডে তার পরদিন এসে পাখীটি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়ে আসবে, বলবে—ও আর একটা পাখী, ও এক পাখীওলার কাছ থেকে জোগাড় করেছে। কি রে চণ্ডী, যা বলছি তা করবি তো? নিজে যেন গাপ ক'রো না পাখীটি। তোমার এয়ার গান্ আমি দেব—যখন বলেছি ঠিক দেব। সেই পাখীওলাটার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে ব'লে রাখিস, উনি যদি জিজ্ঞেস করেন তা হ'লে যেন বলে সে-ই পাখী দিয়েছে। কিছু পয়সা দেব বললেই রাজী হয়ে যাবে। ভাল বুদ্ধি করি নি ভাই, পাখীর গায়ে তো আর নাম লেখা নেই। চমৎকার পাখীটি। এর মধ্যেই এমন মায়া ব'সে গেছে। কি সুন্দর ক'রে আজ সকালে ডাকল—ইষ্টিকুটুম। না রে চণ্ডে?"

চণ্ডী বললে, "একবার 'খোকা হোক'ও বলেছিল। তুমি তখন চানের ঘরে ছিলে।"

"মিথ্যুক কোথাকার। চানের ঘরে থাকলে আমি শুনতে পাব না? কানের মাথা খেয়েছি না কি?"

"আমার কিন্তু মনে হ'ল—"

"ভুল শুনেছ তুমি। ইষ্টিকুটুম ছাড়া আর কিছু বলে নি। বলবে অবশ্য ক্রমশ। আর একটু পোষ মানুক।"

একটা গাড়ি হর্ন দিয়ে এসে থামল বাড়ির সামনে।

"কেউ এল বোধ হয় ভাই। আমি পালাই, লুকিয়ে এসেছি তো। উনি হয়তো আজ সকাল সকালই আপিস থেকে এসে

পড়বেন। যাবার আগে আর একদিন আসবার চেষ্টা করব ভাই। যা যা বললুম সব মনে থাকবে তো ?”

ডানা মৃদু হেসে বললে, “থাকবে।”

“পালাই তা হ’লে। পিছনের দরজা আছে ? তা হ’লে ওই দিক দিয়েই যাই।”

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা খিড়কি-দরজা দিয়ে চ’লে গেলেন।

পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

“আমার গাড়িটা আজ কোলকাতা থেকে এল। বাইরে বেরুচ্ছি একটু। তোমার হাতে যদি তেমন বিশেষ কাজ না থাকে, চল না, ঘুরে আসবে আমার সঙ্গে।”

“কতদূর যাবে ?”

“বেশী নয়, মাইল ষোল। ঘণ্টা দুই লাগবে।”

“এই গরমে বেরুবে ?”

“মোটর চললে বেশী গরম লাগে না। হাওয়া লেগে আরামই লাগে বরং। আমাকে যেতেই হবে—একটা এন্‌কোয়্যারি আছে। তুমি যদি না যেতে চাও, থাক্ তা হ’লে।”

ডানা দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তকাল। এই সফরের সম্ভাব্য ফলাফলের ভাল-মন্দ দুটো দিকই মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল তার মনে। তারপর যেন মরীয়া হয়ে বললে, “বেশ, চল।”

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

ভাস্কর নিজেই ড্রাইভ করছিল। পিছনে ব’সে ছিল চাপরাসী। পোস্ট-অফিসের কাছে এসেই ডানার একটা কথা মনে প’ড়ে গেল। সন্ন্যাসীর কথা। তিনি বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে তাঁর নামে খাতা আছে। সেই খাতা থেকে ভদ্রলোকের আসল পরিচয়টা জেনে নেবে ভেবেছিল সে।

“পোস্ট-অফিসের কাছে একটু থামো তো। একটু দরকার আছে।”

ব্রেক ক'ষে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলেন, "কি দরকার ?"

"নদীর ধারে এক প'ড়ো বাড়িতে একটি সন্ন্যাসী থাকেন। শুনেছি এই পোস্ট-অফিসে তাঁর সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে। ভদ্রলোকের আসল নামটা সম্ভবত সেই খাতা থেকে পাওয়া যাবে। আমাকে বলবে কি ?"

"তোমাকে না বলতে পারে, আমাকে বলবে।"

ভাস্কর চাপরাসীকে আদেশ দিলেন পোস্টমাস্টারবাবুকে সেলাম দিতে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি।

"এখানে নদীর ধারে অমরবাবুদের একটা প'ড়ো বাড়িতে এক সন্ন্যাসী আছেন শুনলাম। তাঁর এখানে নাকি একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে। সেই অ্যাকাউণ্টে তাঁর কি নাম আছে একটু দেখে বলুন তো।"

পোস্টমাস্টার বললেন, "কয়েক দিন আগেই তিনি টাকা বার করেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে—বিশ্বপতি ভট্টাচার্য। আমিও তাঁকে চিনতাম না, তাঁকে আইডেণ্টিফাই করলেন আপনারই আপিসের একজন ক্লার্ক বিনয়বাবু। তিনি ওঁর খবর বলতে পারবেন।"

"কত টাকা আছে ওঁর অ্যাকাউণ্টে ?"

"সাত হাজার টাকা। অনেক দিন ধ'রে প'ড়ে আছে।"

"ও। আচ্ছা।"

আবার মোটর চলতে শুরু করল।

ডানার বিস্ময় সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে যার সাত হাজার টাকা, সে উঞ্ছবৃত্তিধারী। কেন ?...অন্যমনস্ক হয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল সে।

ভাস্কর বসু উঠলেন এসে একটা ডাক-বাংলোয়। নদীর ধারে বেশ মনোরম বাংলোটি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জন্য দারোগা-জাতীয় কয়েক জন লোক অপেক্ষা করছিলেন। ভাস্কর ডানাকে বললেন,

"আমি যত শিগগির পারি কাজটা সেরে নিচ্ছি। তুমি যদি গাড়িতে বসতে চাও—"

ডানা বললে, "তুমি কাজ সার। আমি নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াই একটু। দু-চারটে পাখীর দেখা নিশ্চয়ই পাব।"

নদীর উপর গোটা দুই কালো-পেট গাংচিল উড়ছিল। তাদের সহজ সুন্দর স্বচ্ছন্দ ওড়ার দিকে চেয়ে ডানা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর দেখতে পেলে, দুটো বাঁশপাতি উঁচু পাড়ের গর্ত থেকে মুখ বাড়াচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখল দুটো নয়, অনেক। গর্তও অনেক। বাঁশপাতিরা পাড়া বসিয়ে ফেলেছে একটা। দুরবীনটা আনে নি ব'লে দুঃখ হতে লাগল। গাংশালিকও আছে মনে হ'ল।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের পর ঝিরঝির ক'রে সুন্দর হাওয়া উঠেছিল। ঝিল্লীর ঝঙ্কারে স্পন্দিত হচ্ছিল অন্ধকার। ডানা চুপ ক'রে ব'সে ছিল একটা ক্যাম্প-চেয়ারে হেলান দিয়ে। ভাস্কর বসুও পাশেই ব'সে ছিলেন। কেউ কোনও কথা বলছিল না। না-বলা কথার ভারে পরিবেশটা যেন আরও নিবিড় আরও ঘন হয়ে উঠেছিল। ভাস্কর হঠাৎ দেশলাই জ্বেলে পাইপটা ধরালেন, নিবিড় ভাবটা কেটে গেল।

"চা দিতে তো বড্ড দেরি করছে। দুধ যোগাড় করতে পারে নি বোধ হয়। আমি টাটকা দুধ দিয়ে চা তৈরি করতে বলেছি। দেখি।"

ভাস্কর বসু উঠে ডাক-বাংলোর সামনের দিকে গেলেন।

ডানা চুপ ক'রে ব'সে রইল। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক দূর চ'লে গিয়েছিল। কয়েকটা কাদাখোঁচা আকৃষ্ট করেছিল তাকে। গ্রীষ্মকাল প্রায় শেষ হতে চলল, এদের এতদিন

এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়া উচিত ছিল। এরা বোধ হয় এখনও এ দেশের মায়া কাটাতে পারে নি। এরা কোন্ জাতের, গ্রীন স্যাণ্ডপাইপার (Green Sandpiper), না, কমন স্যাণ্ডপাইপার (Common Sandpiper) তা বোঝা যাচ্ছিল না। উড়লে গ্রীন স্যাণ্ডপাইপারের সাদা পিছন দিকটা থেকে বোঝা যায়—অমরবাবুর দেওয়া একটা বইয়ে পড়েছিল সে। তাই দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাখীগুলো এমনভাবে উড়ছিল যে, পিছন দিকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই করতে করতে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল সে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। নদীর তীরে এক জায়গায় ঝোপের মত ছিল একটু, তারই পাশে গিয়ে বসল সে অবশেষে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে তার সমস্ত ক্লান্তি চ'লে গেল। ছোট কবিতাও মনে পড়ল একটা। আনন্দবাবু তার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। কবিতাটা মনে গেঁথে গিয়েছিল তার।

(দূরের আকাশে অনেক সূর্য উঠেছে এবং অস্ত গেছে
কাছের আকাশে এখনও ওঠে নি কেউ
দূরের বাগানে অনেক ফুলেরা ফুটেছে ঝরেছে অতীত কালে
কাছের বাগানে এখনও ফোটে নি কেউ।)

কাছের আকাশে উঠবে সূর্য কাছের বাগানে ফুটবে ফুলেরা জানি
মনের ভিতরে তবুও কিন্তু কাহারা বসিয়া করে যেন কানাকানি
বিরাট সূর্য খুব কাছে এলে সহ্য করতে পারবে কি তাকে হায়
খুব কাছাকাছি ফুটলে ফুলেরা লাগবে কি তব রসবোধ চেতনায়
তাদের সূক্ষ্ম গন্ধ বর্ণ ঢেউ?

কবি [illegible] তার মনের কথাটা লিখেছিলেন ওই

কবিতাটাতে। তাই মনে থেকে গেছে। হঠাৎ সেই কাদাখোঁচা পাখীর দল খুব কাছে এসে বসল এবং উড়ল তখনই। এবার সাদা পিছন দিকটা স্পষ্ট দেখা গেল। ডানা বুঝতে পারল ওরা গ্রীন স্যাণ্ডপাইপারই। ভারি আনন্দ হ'ল বুঝতে পেরে। তারপরই মনে হ'ল, কেন এই আনন্দ? সত্য নির্ণয় ক'রে? না, নিজের অহঙ্কার তৃপ্ত হ'ল ব'লে? আবার পাখীগুলো এসে বসল, আবার উড়ল। এবার উড়ে অনেক দূরে চ'লে গেল। আকাশের ভিতর মিলিয়ে গেল যেন। ডানার মনে পড়ল ওরা দূরের যাত্রী। তারপরই সে সচেতন হ'ল যে, তাকেও ফিরতে হবে। ভাস্করের কাজ হয়তো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। এসে দেখলে, ভাস্কর সত্যিই তার অপেক্ষায় ব'সে ছিল।

"ওদিকের ঘরটায় চা দিয়েছে, চল।"

"চল—"

ডাক-বাংলোয় খাওয়াদাওয়া করবার জন্য যে ঘরটা নির্দিষ্ট থাকে, তাতে বেশ কেতাদুরস্তভাবে চা-পানের আয়োজন করা হয়েছিল। পেট্রোম্যাক্স্ জ্বলছিল একটা ঘরের কোণে। চাপরাসী চা ঢেলে দিতে যাচ্ছিল, ডানা তাকে মানা করলে। নিজেই চা ঢালতে লাগল সে। চাপরাসী বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কর বসু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ডানার আনত মুখের দিকে। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল। একটা সঙ্কটই যেন ঘনিয়ে এসেছে ডানার মনে হচ্ছিল। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা। অনেক ফুল নিয়ে দ্বারপ্রান্তে একটি লোক এসে দাঁড়াল। ভাস্কর ঘাড় ফেরাতেই ঝুঁকে সেলাম করল লোকটি। তারপর ঘরে ঢুকে একটি চিঠি দিল। ভাস্কর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর লোকটিকে বললে, "আচ্ছা, দিয়ে যাও ওগুলো।

বাবুজীকে আমার সেলাম দিও।" লোকটি ফুলগুলো চাপরাসীর হাতে দিয়ে চ'লে গেল।

ভাস্কর মৃদু হেসে চিঠিটা এগিয়ে দিলে ডানার দিকে। ডানা দেখলে লেখা রয়েছে—"মিসেস বসুর জন্যে কিছু ফুল পাঠালাম। আপনারা আমার নমস্কার জানবেন। ইতি কৃষ্ণলাল"

"বেচারা জানেই না যে, আমি বিয়ে করি নি।"

"ও। খবরটা আমিও তো জানতুম না।"

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

ভাস্কর বসু এ সুযোগ ছাড়লেন না।

বললেন, "তোমার জানা উচিত ছিল। সব ভুলে গেছ নাকি? তোমার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার আস্থা ছিল, এখনও আছে।"

ডানা মনে মনে যা প্রত্যাশা করছিল, যা চাইছিল, তাই হ'ল। কিন্তু সে সহসা উত্তর দিতে পারল না কিছু। চোখ নীচু ক'রে চামচেটা চায়ের পেয়ালার ভিতর নাড়তে লাগল আস্তে আস্তে। কি বলবে মাথাতেই এল না।

"ভুলে গেছ সব?"

"না। কিছুই ভুলি নি, তবে—"

আবার থেমে গেল সে।

"তবে কি?"

"কিছুই নয় তেমন। চল, এবার ফেরা যাক।"

ডানা উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর বসু কিন্তু ব'সেই রইলেন।

"কথাটা শেষ ক'রেই দাও না যাবার আগে।"

"শেষ করবার তো কিছুই নেই। ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে। এখন চল।"

"আলোচনা করবার মত কিছু আছে না কি?"

"আছে কি না সেইটেই আলোচ্য।"

"হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে।"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ভাস্করের চোখের নীচেটা ফোলা ফোলা। আগে তো এমন ছিল না। এর আগে তার চোখেও পড়ে নি।

"কি দেখছ অমন ক'রে ?"

"কিছু নয়, চল। আমার কাজ আছে।"

দুজনে বেরিয়ে পড়ল।



কল্পনার নূতন খোরাক পেয়ে কবি মেতে উঠেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল কাব্য-চর্চায়। বিশেষ ক'রে সংস্কৃত কাব্য তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেন। তারপর যখন কলেজে তিনি চাকরি পেলেন, তখন মেতে উঠলেন ছাত্রদের নিয়ে। তাঁর সৃজনীপ্রতিভা লেগে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের সুরুচি-সৃষ্টি করবার কাজে। কলেজের যা পাঠ্য তা তো তাঁদের পড়াতেনই নানা রকম ক'রে, যা পাঠ্য নয় তাও পড়াতেন। কালিদাস যাঁদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, তাঁরা ভবভূতি ভারবী ও মাঘেরও আস্বাদ পেতেন কিছু কিছু। ছাত্রদের নিয়েই মেতে ছিলেন তিনি তাঁর চাকরি-জীবনে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন একটু মুশকিলে পড়েছিলেন। বাল্যবন্ধু রূপচাঁদ ছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা মাতিয়ে দিতে পারে। তাঁর চতুর [illegible] কোনও প্রেরণা পেতেন না তিনি। তবু তাঁকে নিয়েই দিন কাটছিল। তাঁর পাল্লায় প'ড়েই নীট্‌শের দু-একখানা বইও [illegible]ন। খুব ভাল লাগে নি তাঁর। মনে হয়েছিল, তখনকার হেঁইও-মার্কা বীরপুরুষদের মন রাখবার জন্যই ভদ্রলোক বুদ্ধির কসরৎ করেছেন নানারকম। যারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শকে উপলব্ধি করেছে, তাদের কাছে নীট্‌শের 'সুপারম্যান' খুব ফিকে। এ দেশে চার্বাক কল্কে

পায় নি, নীটশেও পাবে না। এ নিয়ে রূপচাঁদের সঙ্গে তর্ক হ'ত মাঝে মাঝে। অর্থাৎ নীটশেকে নিয়েই মেতে থাকবার চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু জমত না। এমন সময় অমরবাবু এলেন তাঁর অপরূপ মানসিক ঐশ্বর্য নিয়ে। যে জগৎ তিনি উদ্‌ঘাটিত করলেন তাঁর চোখের সামনে, তা শুধু পাখীর জগৎ নয়, তা এক অদ্ভুত রহস্যময় অমরাবতী। তার পর এল ডানা। অপরিচিতা, রূপসী, যুবতী। মানবী নয়, যেন স্বপ্ন। নূতন রঙে, নূতন রসে মেতে উঠল তাঁর কল্পনা। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়ে উঠল, যা পাষাণ মনে হচ্ছিল তা ফেটে গেল হঠাৎ, কুলকুল ক'রে বেরিয়ে পড়ল কাব্যনির্ঝরিণী। চলল কিছুদিন। এখন সে ভাবটাও কেটে গেছে। এখন নূতন সুর লেগেছে মনে। অমরবাবুর জমিদারির ম্যানেজার হওয়ার পর থেকে প্রজাদের দিকে তাঁর নজর পড়েছে। কি করলে তারা ভালভাবে থাকতে পারে—এই হয়েছে এখন তাঁর প্রধান চিন্তা। ওই নিয়েই মেতে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। ডানার কাছ থেকে মন স'রে গেছে অনেক দূরে। জোর ক'রে যে সরিয়ে দিয়েছেন তা নয়। নদীর মত আপনিই স'রে গেছে।

…দুপুরের রোদ অগ্রাহ্য ক'রে সেদিন বেরিয়েছিলেন তিনি ইছাপুর গ্রামের উদ্দেশে। হেঁটে নয়, গরুর গাড়ি ক'রে। ইছাপুরের প্রজারা জানিয়েছে যে, এবার তাদের ফসল ভাল হয় নি। তার উপর গ্রামে কলেরার মড়ক লেগেছে। পুকুরে জল নেই, কাদা উঠছে। যে কটি কূপ আছে তাও শুষ্ক হয়ে আসছে। আনন্দবাবু ডাক্তার পাঠিয়ে কলেরার প্রকোপটা আগেই কমিয়েছিলেন। নবাগত ম্যাজিস্ট্রেট ভাস্কর বসুর সহায়তায় কয়েকটা কূপের জীর্ণ-সংস্কারও হয়েছে। দু-একটা টিউবওয়েল করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। কবি যাচ্ছিলেন স্বচক্ষে সব দেখবার জন্যে। একটা

বাগানের কাছাকাছি এসে গাড়োয়ানটা বললে, "হুজুর, গরু দুটোকে একটু জল খাইয়ে আনি। বড্ড হাঁপাচ্ছে। কাছেই নদী, আমি যাব আর আসব। চান করিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। যা রোদ।"

কবি বললেন, "বেশ, যাও। খুব বেশী দেরি ক'রো না। আমার বিছানাটা একটা গাছের তলায় বিছিয়ে দাও তা হ'লে। গাড়িতে ব'সে থাকার চেয়ে ওখানে ব'সে থাকা ভাল—"

ছায়াসুশীতল একটি বড় গাছের নীচে বিছানাটি পেতে দিয়ে গাড়োয়ান চ'লে গেল। কবি উপবেশন করলেন। উপবেশন ক'রেই অনুভব করলেন, এক অদ্ভুত স্বর্গরাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। চতুর্দিক যখন রোদে পুড়ে যাচ্ছে, তখন এই শ্যামাঙ্গিনী কানন-লক্ষ্মী আশ্চর্য কৌশলে অদৃশ্য এক স্নেহ-অঞ্চলের আড়ালে এই স্থানটুকুকে রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে ফেলেছেন। অদ্ভুত পরিবেশ। তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন পরিবেশটা। তার পর গান শুরু করলে একটা দোয়েল পাখী। গ্রাম-সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। কবিতার খাতা বেরুল পকেট থেকে। দেখলেন, পুরনো খাতাটা এনেছেন। মাত্র চার-পাঁচ পাতা সাদা আছে। মাঝে মাঝে যে সব পাখী নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাই পরিষ্কার ক'রে টোকা আছে এতে। বহুবার-পড়া কবিতাগুলোতেই চোখ আটকে গেল আবার। আবার পড়তে লাগলেন।

বক

গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক
কেউ সাদা, কারো গায়ে নানা ছক।
নদী-নালা-পুকুরেতে চুপচাপ
ব'সে ব'সে মাছ খায় ঝুপঝাপ।

এক মনে ব'সে থাকে নড়ে না
চোখে তার আর কিছু পড়ে না।
আকাশেতে ওঠে রবি, তারা, চাঁদ,
বাগানে রূপের বান ভাঙে বাঁধ।
বাতাসেতে কত লীলা সুরভির
কত সাহানার কত পূরবীর।
বকদের প্রাণে নেই কোন শখ
গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক,
দেখে শুধু চুনো-পুঁটি মারে ঘাই
তার চোখে আর কিছু পড়ে নাই।
বক কয়, কবি, মোরা সত্যিই নাজেহাল
তোমাদের মত বল কোথা পাব বেড়াজাল

ময়ূর

নীল-সবুজের সাথে ইন্দ্রধনু করেছে মিতালি
ছন্দ সাথে মহানন্দে মিলিয়াছে মনের আবেগ
উচ্ছ্বসিত পেখমেতে জ্বলিতেছে বর্ণের দীপালি
প্রেয়সী এসেছে কাছে, আকাশেতে উঠিয়াছে মেঘ।

* * *

ভঙ্গী-ভরা দৃপ্ত গ্রীবা অপাঙ্গে কি বহ্নি-বিভা
প্রতি পর্ণে বর্ণময় সুর,
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।
নাচিছে কবির চিত্ত বনভূমি হ'ল তীর্থ
স্থূল রূপ হ'ল সূক্ষ্ম, দুঃখ হ'ল দূর
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।

নাচে পক্ষী-নটরাজ পরিয়া অপূর্ব সাজ
গ্রীষ্মও যে হ'ল স্বপ্নাতুর,
শাল তাল কর্ণিকার ভাষা নাহি বাণবার
সর্ব অঙ্গে তাহাদের রোমাঞ্চ মধুর
প্রিয়া-পাশে নাচিছে ময়ুর।

শকুনি

কলির জটায়ু তুমি জয়, জয়, জয়
ক্ষুধারূপী রাবণেরে করেছ দমন
জীবন্ত কোন সেনা নাহি করি ক্ষয়।
মরিয়া পড়িয়া থাকে ভাগাড়ে যারা
অভিনব তব রণে যোদ্ধা তারা
শবের বাহিনী ল'য়ে হে শিব-দোসর,
ক্ষুধাসুরে কর পরাজয়।

নহ তুমি মনোহর, বিলাসী নহ,
দুঃখের রুক্ষতা অঙ্গে বহ
মৃত্যুর সাথে তব কি দুঃসহ
ঘনিষ্ঠ ঘোর পরিচয়।
জয়, জয়, জয়।

বাবুই

চোখ দিয়ে যা দেখছ তুমি
আসল সেটা দেখাই নয়,
আসল দেখা হয় যে অনেক পুণ্যে।
বাবুইটাকে ভাবছ পাখী?
কিন্তু ওরা পাখীই নয়

ব্যাবিলনের শিল্পী ওরা
শহর বানায় শূন্যে।

* * *

খড়ের বোতল বানিয়ে ওরা
ঝুলিয়ে দিল তালগাছে,
না, না ভায়া, তাড়ির নেশায় নয় গো।
ঘোরঘাজ আর কোটর ছেড়ে
নূতন কিছু করল ওরা
শিল্পী-মনের সেই তো পরিচয় গো।

* * *

নাইক তাঁত, নাইক হাত
নাইকো কোন যন্তর
তালগাছেতে বুনল শহর
এ কোন্ যাদু মন্তর।

* * *

আছে কেবল ছোট্ট মুখ
হলদে মাথা, হলদে বুক,
এবং আছে কল্পনা
নেহাত সেটা অল্প না।

* * *

তাই কি বুড়ো তালগাছটা সসম্ভ্রমে যেন
পাতার ছাতা ধরছে মাথায় ওদের ?
কিন্তু ওরা মশগুল যে, তোয়াক্কা নেই রোদের।
শূন্যে শহর দুলছে
এই [illegible] রোদ বৃষ্টি ভুলছে।

আরও অনেক পাখীর বিষয়ে অনেক কবিতা লেখা আছে। কিন্তু কোয়েল পাখীটার অশ্রান্ত গানের তাগিদে পড়া বন্ধ করতে

হ'ল তাঁকে। দোয়েল যেন ভর্ৎসনার সুরে তাঁকে বলতে লাগল—কি কাণ্ড তোমার! আমি এসেছি দেখছ না? এখন অন্য কিছু করা সম্ভব কি। মনে পড়ল, অমরবাবু অনেকদিন আগে একটা চিঠিতে একটা দোয়েলের গানকে আমাদের অক্ষরে লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। কবিতায় সে চেষ্টা করলে কেমন হয়? কান পেতে শুনতে লাগলেন মন দিয়ে। তারপর ভেবে ভেবে লিখলেন—ওরই গানের যথাসম্ভব অনুকরণ ক'রে লিখলেন—

চিচাকি—চিচাকি—চিচিরুর্‌র্‌
কিনি কিনি কিনি কিনি কুংকিনি কোনিয়া
টুক্‌চি কুটুর কিম কোনিয়া
কুরুরু কিচির চং
কুরুরু কিচির চং
জুচ্‌কি জুচ্‌কি কি রে কিচ্‌কিচ্‌ কোনিয়া।

মানুষের কাছে এর কোন অর্থ নেই। কিন্তু দোয়েলের কাছে আছে। দোয়েলটা উড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে বসল একটা ল্যাজ-ঝোলা পাখী। এ পাখীটি তাঁর প্রিয় পাখী। লম্বাটে ধরনের বাদামী রঙের পাখী, ল্যাজটি লম্বা, মাথাটি কালো; কিন্তু ওর রূপের জন্য নয়, ওর সাবলীল বেপরোয়া ভাব-ভঙ্গীর জন্য ওকে কবির ভারি ভাল লাগে। বুলিও ছাড়ে নানারকম। চ্যা—চ্যা—চ্যা ডাকের জন্য বেরসিক লোকেরা ওর নাম দিয়েছে হাঁড়ি-চাঁচা। কিন্তু তারা বোধ হয় ওর ক-অকুল্লিং ডাকটা শোনে নি। ওই ডাকটাই মাঝে মাঝে মাঝে শোনায় 'খুকু নেই' 'খুকু নেই'। এ ছাড়াও কখনও কখনও গঁয়-গঁয়-গঁয়-গঁয় ধরনের শব্দ করে পাখীটা। অদ্ভুত শোনায়। মনে হয় কোনও ছোট ছেলে যেন

গন্‌গন্‌ ক'রে বায়না করছে। ল্যাজ-ঝোলা যেন কবির মনের কথা টের পেয়ে তার সেরা বুলিটা শুনিয়ে দিল।

"ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং।"

বেশ ছুলে ছুলে ডাকতে লাগল। যাকে উদ্দেশ ক'রে এই সুরেলা সম্ভাষণ সেই পক্ষী-প্রিয়াকেও দেখতে পেলেন কবি। আর একটা গাছে বেশ সপ্রতিভভাবে সে ব'সে আছে, যেন কেউ তাকে ডাকছে না। কবি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। শুরু করলেন কবিতা আবার। এবার পাখীর ভাষায় নয়, বাংলা ভাষায়।

যদিও পুরুষ পাখী তবু যেন কিশোরী
বাদামী গায়ের রঙ, কালো মাথাটি
পুচ্ছের পাখীটি জাপানী, না, মিশরী
(তোমরা তা ঠিক কর আমি জানি না)
আমি জানি চুরি ক'রে খাবে আতাটি।

চুরি ক'রে ফল খায়, চুরি ক'রে ডিম খায়,
প্রেয়সীর কাছেতেই শুধু হিমসিম খায়,
খোশামোদী সুর জাগে গলাতে
মনে হয় যেন আমতলাতে
বৃন্দাবনের সুর বাজল
বাঁশরীর সুরে বুঝি শ্রীরাধিকা সাজল।

ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং—
ল্যাজ-ঝোলা পাখীটাই ছুলে ছুলে ডাকছে
মাঝে মাঝে চুপ ক'রে থাকছে।
ভাবছে, প্রিয়ার কথা ভোল্‌ না
আবার ছুলিয়ে দেহ দোল্‌ না

পুনরায় ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং,
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

উঁচু ডাল থেকে পাখী নিচু ডালে নামছে
মাঝে মাঝে ডাকছে ও থামছে।
গাছের সবুজে রোদ জ্বলছে
মদন-দহনে পাখী বলছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

সহসা বেসুরা ডাক—চ্যা চ্যা চ্যা—
বিবেকই বলছে বুঝি ছ্যা ছ্যা ছ্যা
আর কত খোশামোদ করবি
আর কত ডেকে ডেকে মরবি
বাড়িয়ে সুরের হাত আর কত পায়ে তার ধরবি।
একটুও নেই তোর লাজ হায়।
ল্যাজের বাহার দিয়ে উড়ে গিয়ে বসল
ফল-ভারে নত আমগাছটায়।

ক্ষণ পরে দেখি পুন ডাকছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

কবিতাটা শেষ ক'রে কবি অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। মানুষ ছাড়া আর কেউ বুড়ো হয় না। গাছেরা পাখীরা প্রতি বছর বার্ধক্যের খোলস ফেলে দিয়ে যৌবনের সাজে সজ্জিত করে নিজেদের। নবমুকুলে সজ্জিত বৃদ্ধ আমগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি মুগ্ধ নেত্রে। ল্যাজ-ঝোলা পাখীটা সমানে ডেকে চলেছে। ওর বয়স কত সে প্রশ্নই মনে

জাগছে না, যৌবনসুলভ আনন্দে ও মেতে উঠেছে—এইটেই এই মুহূর্তে ওর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ডানার কথা মনে হ'ল। ডানাও ফুরিয়ে যাচ্ছে, তার আবির্ভাব তাঁর কল্পলোকে যে উৎসবের সাড়া তুলেছিল তা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে তুবড়ির মত। ডানা আর তাঁর কবিতার খোরাক যোগাতে পারবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল।

"এবার চলুন হুজুর—"

গাড়োয়ানের আগমনে সহসা নূতন জগতে নীত হলেন তিনি।

১৯

সেদিন মোটরে ভাস্করের সঙ্গে ডানার আর কোনও কথা হয় নি। দুজনেরই মন নানা কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু দুজনেই ইতস্তত করছিল। শীতকালে জলের ঘটিটা মাথায় ঢালার আগে অনেকে যেমন ইতস্তত করে, অনেকটা তেমনি। দুজনেই বুঝতে পেরেছিল, কথাটা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন শেষ করতেই হবে। কোথায় শেষ হবে এই অনিশ্চয়তাটাই দুজনকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দোলাচ্ছিল। দুজনেরই মনে হচ্ছিল, অসাবধানে বেফাঁস কিছু ব'লে ফেললে সুরটা কেটে যাবে হয়তো। তাই কেউ কিছু বলছিল না। তা ছাড়া, চাপরাসীটা পিছনে ব'সে ছিল।

নিজের বাংলোর কাছাকাছি এসে ভাস্কর বললেন, "এখানেই নাববে, না, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

"পৌঁছেই দাও। আমার কাজ আছে একটু।"

"এত রাত্রে আবার কি কাজ?"

"পাখীগুলোর খবর নিতে হবে একটু। আজকের ডাকটাও দেখা হয় নি। অমরেশবাবুর বা রত্নাদির চিঠি আসতে পারে।"

"চল, তা হ'লে পৌঁছে দিই। আলোচ্য বিষয়টার আলোচনা কখন করবে ?"

"করলেই হবে একদিন। ব্যস্ত কি ?"

"আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।"

"কিসের তাড়া ?"

"এক মিনিটের জন্য নেবে এস, দেখাচ্ছি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

বাংলোর ভিতর ঢুকেই ডানা বুঝতে পারল, বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই কেউ। জিনিসপত্র সবই আছে, কিন্তু সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা নেই। ড্রয়িং-রূমের মাঝখানে একটা বিশ্রী কালো টেবিলের উপর আধ-খোলা সুটকেস একটা। ভাস্কর সেইটেই হাঁটকাতে লাগলেন এসে। কাগজপত্র, রুমাল, টাই ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। সুটকেস থেকে একগোছা খাম বার করলেন ভাস্কর বসু।

"এই দেখ। একটা খুলে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

খুলতেই একটি সুশ্রী মেয়ের ফোটো বেরিয়ে পড়ল।

"প্রত্যেক খামেই একটা ক'রে ফোটো আছে। আরও আসবার সম্ভাবনা আছে। কোথাও কোনও জবাব দিই নি। কিন্তু কত দিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে ?"

"আচ্ছা, পরে কথা হবে এ বিষয়ে। আজ আর নয়।"

মুচকি হেসে ডানা বেরিয়ে গেল। বাইরে সে যতটা সপ্রতিভতা দেখাল, মনে মনে কিন্তু ঠিক ততটা সপ্রতিভ সে থাকতে পারল না। হঠাৎ কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ল, আর সেজন্য লজ্জিতও হ'ল মনে মনে।

ভাস্কর তাকে বাড়িতে নামিয়ে রেখে চ'লে গেলেন। ডানা চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কেউ নেই। চাকরটাও

নেই। মনে হ'ল, যেন অসীম নির্জনতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাকে আবার। আবার নূতন ক'রে নবলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে বুঝি। পুরাতন পরিবেশেই কিন্তু ফিরে আসতে হ'ল পর-মুহূর্তে। চাকরটা এল। কেরোসিন তেল আনতে গিয়েছিল।

"মুন্সী এসেছিল কি ?"

"এসেছিল।"

"কিছু ব'লে গেছে ?"

"আরও দু-একটা পাখী ম'রে গেছে বললে।"

চুপ ক'রে রইল ডানা। সে যদি ভাস্করের সঙ্গে না গিয়ে পক্ষী-নিবাস পরিদর্শন করতে যেত তা হ'লে যে ওরা বাঁচত তা নয়, কিন্তু তবু ডানা নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গেছে যার উপর তার কোনও হাত নেই। বন্দী পাখীদের স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য তার নেই, অথচ ওই তার চাকরি।

"চা খাবেন মা ?"

"কর একটু। পিওন এসেছিল ?"

"এসেছিল। একটা চিঠি আছে।"

ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে অনেকটা যেন আরাম বোধ করল। এতক্ষণ যেন সে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চিঠি লিখেছিলেন অমরেশবাবু। ডানা খামখানা উলটে-পালটে দেখলে। মনে হ'ল, কাশ্মীর থেকে লিখেছেন। ভাবলে, স্নান সেরে ভাল ক'রে পড়া যাবে।

স্নান শেষ ক'রে চা খেতে খেতে সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যে, অমরেশবাবুর চিঠিখানার কথা মনেই রইল না তার আর। কেন সে অন্যমনস্ক হয়েছে তা নিজেও সে বলতে পারত না। সজ্ঞানে

সে কিছুই ভাবছিল না, ভাস্করের কথাও নয়। তার মনটা যেন অন্ধকার ঘরের মত হয়ে ছিল, সচেতন ভাবে কিছুই যেন পরিস্ফুট হয়ে ছিল না সেখানে। অন্যমনস্ক হয়ে সে কেবল চায়ের পেয়ালায় ছোট ছোট চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে আলো জ্ব'লে উঠল, সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। ভাস্কর আসার পর থেকে কয়েকদিন তাঁর খোঁজ নেওয়া হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিস্ময়কর খবর সে সংগ্রহ করেছে, তা মনে পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা কর্তব্য যেন অসমাপ্ত রয়েছে। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের তলায় যে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য আত্মগোপন ক'রে আছেন, তার রহস্যটা আবিষ্কার করতেই হবে। প্রাক্তন জমিদার সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেটা জানাও যেন দরকারী মনে হ'ল তার। টর্চ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। চাকরটাকে ব'লে গেল, সে একটু বেড়াতে বেরুচ্ছে, খুব জরুরী দরকারে কেউ যদি আসে, সে যেন অপেক্ষা করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

সন্ন্যাসীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে ডাকলে, "বিশ্বনাথবাবু বাড়ি আছেন?" কোনও উত্তর এল না। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল ভানার। চ'লে গেছেন না কি ভদ্রলোক! আর একবার ডাকলে, কোনও সাড়া নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, ঘরের ভিতর কেউ নেই। টর্চের আলোয় শাবলের ডগাটা চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল। সেটা একটা কোণে ঠেসানো ছিল। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর মনে হ'ল, হয়তো চরে কোথাও গেছেন। তিনি সাধারণত কোথায় গিয়ে বসেন তা ভানার জানা ছিল। চরের উপর পায়ে-চলা পথও হয়েছে আজকাল। একটু খুঁজে দেখলে ক্ষতি কি! চরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

চরে ভীষণ অন্ধকার। নিঃশব্দ নয়, বাঙ্ময়। অসংখ্য ঝিল্লী ডাকছে। ঝিল্লীও বোধ হয় এক রকম নয়, নানা রকম শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে মিশছে ভেকের ডাক, পেচকের কর্কশ চীৎকার, টিট্টিভ পাখীদের 'ডিড্-হি-ডু-ইট্' (Did-he-do-it)। 'চোখ গেল' পাখীও ডাকছে একটা। গাংচিলদের কলরব শোনা যাচ্ছে। আর একটা কি পাখী মাঝে মাঝে ডাকছে আর থামছে। মনে হচ্ছে সাপে বুঝি ব্যাঙ ধরেছে—কুঁক্ কুঁক্ কুঁক্, তিন-চারবার ডেকেই থেমে যাচ্ছে। কোন রকম প্যাঁচা কি? ডানার মনে হচ্ছিল, বিরাট অন্ধকারই যেন নানা ভাবে কথা কইছে। দিনে আলোর নানা লীলায় প্রকৃতি যে বার্তা আমাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায়, অন্ধকারে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শ্রুতিপথে কি সেই বার্তাই পাঠাচ্ছে প্রকৃতি? না, এ অন্য কিছু? অন্ধকারকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে চমকে দেবার চেষ্টা করছিল ডানা। অন্ধকার কিন্তু চমকাচ্ছিল না। তার বিরাট অতিকায় রূপের নিকষে এতটুকু দাগ পড়ছিল না। ক্ষুদ্র আলোর রেখাটাই যেন অপ্রতিভ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল তার সীমাহীন বিশালতার কাছে। হঠাৎ ডানার মনে হ'ল, যা আমরা অসীম বা অনন্ত ব'লে কল্পনা করি তা কি আলোহীন? আলোয় আমাদের বুদ্ধি দৃষ্টিসীমায় আটকে যায়, আদি এবং অন্ত আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্ধকারে তা পাই না, অন্ধকারই আমাদের মনে অসীমের আভাস জাগিয়ে তোলে। টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে নানা রকম এলোমেলো ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্যমনস্ক হয়ে ডানা এগিয়ে চলেছিল অন্ধকারে। তার ভয় করছিল না, সে জানতে পারছিল না যে, তার মনের নেপথ্যে এক শক্তিমান পুরুষ অমোঘ আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করবার শক্তি তার ছিল না। চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল। গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল, নদীর মৃদু কলধ্বনি শোনা গেল। সে বুঝতে পারল যে, চরের শেষ

প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে, সামনেই নদী। নদীর জলে টর্চ ফেলতেই একদল হাঁস কলরব ক'রে উড়ে গেল। ডানার মনে হ'ল, হাঁসেরা এখনও ফেরে নি নাকি নিজেদের দেশে? ডাক শুনে মনে হ'ল চখা। মনে পড়ল, চখারা অনেক দিন পর্যন্ত এ দেশে থাকে। তারপর মনে হ'ল, হাঁসেদের স্বদেশ ব'লে কিছু আছে কি! সমস্ত পৃথিবীটাই তো তাদের দেশ, যখন যেখানে ভাল লাগে তখন সেখানে থাকে। হিমালয়, রাশিয়া, উত্তরমেরু, ভারতবর্ষ, ইয়োরোপ, আমেরিকা ওদের কাছে যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। আমরাই কেবল একটা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বাস ক'রে এটা স্বদেশ ওটা বিদেশ, এ আত্মীয় ও পর—এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করি। টর্চের আলোটা এদিকে ওদিকে ফেলে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে যেতে লাগল সে। ছোট-বড় বালির ঢিপি, ঝাউগাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যাচ্ছে। একটা শেয়াল তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চ'লে গেল। সন্ন্যাসী যেখানটায় সাধারণত বসেন সেখানে উপস্থিত হ'ল সে অবশেষে। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। মনে হ'ল, দূরে—অনেক দূরে কে যেন গান গাইছে। সন্ন্যাসী কি? উনি একা ব'সে অনেক সময় গান করেন। এগিয়ে চলল ডানা সেই দিকে। বালি ভেঙে ভেঙে অনেক দূর যেতে হ'ল। গিয়েও কিন্তু সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া গেল না। ডানা টর্চ ফেলে ফেলে নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগল, গানটা গাইছে কে, আর কোথায় ব'সেই বা গাইছে। হঠাৎ দেখতে পেল, নদীতে একটা নৌকো ভেসে চলেছে। নৌকো থেকেই গানটা ভেসে আসছে। গানের লাইনগুলো সুন্দর। এ গান আর কোথাও শুনেছে ব'লে মনে পড়ল না।

স্রোতে তরী ভাসিয়েছি ভাই
নাইক আমার পথের চিনা রে,

ভরসা আছে স্রোতই আমায়
নিয়ে যাবে সাগর-কিনারে।

সন্ন্যাসী আছেন নাকি ওই নৌকোতে? চ'লে যাচ্ছেন এখান থেকে?—এই প্রশ্ন মনে জাগবামাত্র একটা অপ্রত্যাশিত সত্যের সম্মুখীন হ'ল সে। সন্ন্যাসী যে তার মনে কতখানি স্থান জুড়ে ব'সে আছেন তা সে বুঝতে পারল।

"বিশ্বনাথবাবু—ও সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

চীৎকার ক'রে ডাকল সে একবার। কিন্তু সেই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই হাস্যকর শোনাল। নদীর বাঁকে নৌকো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, টর্চ ফেলে ফেলে এইটেই দেখতে লাগল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গান ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, তারপর আর শোনা গেল না। নৌকোও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ডানার পা দুটো ব্যথা করছিল, সে ব'সে পড়ল বালির ওপর। অনেকক্ষণ ব'সে রইল চুপ ক'রে। (অসীম অন্ধকারের মধ্যে ব'সে ব'সে তার মনে হতে লাগল, নবজন্মের প্রতীক্ষায় সে যেন ব'সে আছে, মাতৃজঠরের অন্ধকারে ভ্রূণ যেমন থাকে।) লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীর কণ্ঠে অন্ধকারের ভাষা শুনতে লাগল। মনে পড়ল, সন্ন্যাসী অনেক দিন আগে বলেছিলেন—তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে-কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ডানার মনে হ'ল, অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা হয়তো আছে, কিন্তু সেই অর্থটাই যে ঠিক অর্থ তা কে ব'লে দেবে। তা নির্ণয় করবার মানদণ্ড কি? হঠাৎ একটা শব্দ হ'ল—বুম্‌-ও-বুম্‌। চমকে উঠল ডানা। মনে হ'ল, কে যেন কথা কইল। টর্চ ফেলেই কিন্তু দেখতে পেলে হুতোম প্যাঁচাটাকে। নদীর উপর ঝুঁকে-পড়া একটা গাছের ডালে ব'সে ছিল, টর্চের আলো পড়তেই উড়ে গেল। নদীর উপর দিয়ে, প্রায় নদীর জল

ছুঁয়ে ছুঁয়ে, গাংচিলের মত উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্যাঁচাটাকে দেখে হঠাৎ অমরেশবাবুর কথা মনে প'ড়ে গেল। তাঁর কাঁধে উঠে সে একবার একটা প্যাঁচার বাসা দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, অমরেশবাবুর যে চিঠিটা এসেছে সেটা খোলা হয় নি এখনও। আর ব'সে থাকতে পারল না, উঠে বাসার দিকে ফিরতে লাগল। ফিরতে ফিরতে একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, সে সন্ন্যাসীর খোঁজে এসেছিল কেন? শুধু কি নিছক কৌতূহল? নিছক কৌতূহল কি তাকে এই অন্ধকারের চরের মধ্যে ঘোরাতে পারত? কেন এই আকর্ষণ?

ডানা যখন ফিরল, তখন প্রায় এগারোটা বাজে। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে উঠিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে অমরেশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে বসল সে। চাকরটা বললে, খানিকক্ষণ আগে রূপচাঁদবাবুর ঠাকুর এসেছিল, পাখীর খাঁচাটা রেখে গেছে।

"খালি খাঁচা?"

"না, পাখীটাও আছে।"

"কোথায় রেখেছ?"

"আপনার শোবার ঘরে।"

ডানা অমরেশবাবুর চিঠিটা পড়তে শুরু করল এবার—

কল্যাণীয়া ডানা,

এখন ভূস্বর্গে এসেছি, সুতরাং লৌকিকতার ছদ্মবেশ খুলে ফেললাম। তোমাকে আর 'আপনি' বলব না, 'তুমি' বলব। এ ব্যাপারে রমা অনেক আগেই সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ থেকে আমিও হলাম। কাশ্মীরকে যে কেন ভূস্বর্গ বলে তা ব'লে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। আনন্দবাবু একটা কবিতাতেই

যা পারতেন, পাতার পর পাতা লিখে গেলেও আমি তা পারব না। সুতরাং সে চেষ্টাও করব না। ছোট্ট একটি ইংরেজী কথায় কেবল বলব, ল্যাভ্‌লি! আমাদের এ কাশ্মীর ভ্রমণে মহত্ত্ব বা রোমাঞ্চকর কিছু নেই। সার্ ফ্রান্‌সিস্ ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ডের মত দুর্গম গিরি-কান্তার পার হয়েও আমরা কাশ্মীরে প্রবেশ করি নি। সার্ ফ্রান্‌সিস্ পিকিং থেকে হাঁটাপথে উনিশ হাজার ফুট উচ্চ তুষারাচ্ছন্ন 'মুস্তাঘ্ পাস' অতিক্রম ক'রে বাল্‌টিস্তানে এসে পৌঁছেছিলেন। পথ চলতে চলতে তাঁকে বিছানা কেতলি প্রভৃতি সব ফেলে দিতে হয়েছিল। তাঁর তাঁবু ছিল না। আকাশের নীচে মাটির উপর শুয়ে থাকতেন তিনি হিমালয়ের বুকের উপর। নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, জুতো পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার মালমসলা ভাগ্যবানদের ভাগ্যেই জোটে। আমার সে রকম ভাগ্য নয়। আমি রেল গাড়ি, মোটর গাড়ি, টোঙ্গা এবং হাউসবোটের সহায়তায় আরামেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি এবং আনন্দবাবু যদি সঙ্গে থাকতে তা হ'লে ভ্রমণটা আরও মনোরম হ'ত। রত্না বড় বেশী গম্ভীর লোক তো, খুব কম কথা বলে। মনে যখন খুব বেশী কথা জ'মে ওঠে, তখন চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা উপচে পড়ে। ভ্রমণকালে ওর চেয়ে আর একটু কম নীরস সঙ্গী থাকলে বেশী জমত। রত্নাও সে কথা কাল বলছিল। রত্নার মুখে তোমার বিপদের কথা শুনে কৌতুক অনুভব করলাম। আশা করি, বিপদ এতদিনে কেটে গেছে। এখন আমরা শ্রীনগরে একটা বোটহাউসে আছি। যখন সিমলায় ছিলাম তখন সেখানকার দু-চারটে পাখীর খবর আনন্দবাবু[illegible]। এখানেও সে সব পাখী আছে। তবে কাল সন্ধ্যার দিকে 'চাক্‌-চাক্ চাক্ চাওয়াক্' এই শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। ঠিক এ ধরনের পাখীর ডাক আগে শুনেছি ব'লে মনে পড়ল না। বেরিয়ে এলাম। দেখি খাঁচা নিয়ে একটা লোক ব'সে আছে। কি পাখী আছে খাঁচায় জিজ্ঞাসা করাতে সে

বললে—'চুকর'। দেখলাম, পাখীটি এক রকম পাহাড়ী তিতির। চমৎকার দেখতে। সালেম আলির বইয়ে ছবি আছে দেখো। ও-দেশে অনেকে যেমন শখ ক'রে তিতির পোষে, ও-দেশে যেমন তিতিরের লড়াই হয়, এ-দেশেও শুনলাম চুকরকে নিয়ে ঠিক একই কাণ্ড। চুকরকে কেন্দ্র ক'রে অনেকে টাকা হাত বদল করে এখানে। আমি ভাবছি, এই চুকর আমাদের কাব্যের চকোর নয় তো। চাঁদ বা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ আছে কি না জানি না। খোঁজ করব। তুমি আনন্দবাবুকেও জিজ্ঞাসা ক'রো, কাব্যের চকোরের কোনও বর্ণনা কোথাও তিনি পেয়েছেন কি না। আমার লাইব্রেরিতে গিয়ে অভিধানখানা একবার উলটে দেখো। যদি কোন খবর পাও জানিও। এখানে আর এক রকম পাখী দেখছি। লালমাথা লাফিং থ্রাশ। সিমলায় যে লাফিং থ্রাশ দেখেছি তা অন্যরকম। তার নাম স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ। এখানকার পাখীদের পুরো পরিচয় এখনও পাই নি তেমন। এই গরমের সময়টা হিমালয়ভ্রমণের পক্ষে অনুকূল নয়, তবু যখন এসে পড়েছি যতটা পারি দেখে যাব। তবে এখানে কতদিন থাকব তার স্থিরতা নেই। কিছু টাকার যোগাড় হ'লে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। রত্নার মুখে শুনলাম, তুমি আর আনন্দবাবু খুব মন দিয়ে কাজ করছ। আমারও তোমাদের মত কাজ করতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু এক জায়গায় বেশীদিন ভাল লাগে না। মনটা ছটফট করে অন্য কোথাও যাবার জন্যে। হয়তো সব জায়গা দেখা হয়ে গেলে কোথাও মন স্থির ক'রে বসতে পারব। কিন্তু পারব কি? অত টাকা আর সময় কোথা পাব? ডাকের সময় বেশী নেই। সুতরাং এইখানেই শেষ করি। তুমি আর আনন্দবাবু আমার প্রীতি ও নমস্কার নিও। ইতি

তোমাদের অমরেশ

চিঠিটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুয়ারে টোকা দিয়ে কপাটটা ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন। মুখে মৃহু হাসি, হাতে জলন্ত সিগারেট।

"সিগারেটটা ফেলেই দিয়ে আসি—"

বেরিয়ে গিয়েই ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"কপাটটা বন্ধ ক'রে দেব ?"

"কেন, খোলাই থাক্ না।"

"ভেজানো থাক্ তা হ'লে। চাকরটা বাইরে নেই। তাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি।"

ডানা উঠে দাঁড়াল।

"এত রাত্রে কি দরকার আপনার ?"

তার কণ্ঠস্বরে যেন ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিত হ'ল। রূপচাঁদ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, "বলছি। ভয় পাবার মত কিছু নয়। হু-চার দিনের মধ্যেই চ'লে যাব, তাই বিদায় নিতে এসেছি। তোমার কাছে এটা হয়তো সামান্য ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে এটা অসামান্য। তুমি আমার জীবনের কতখানি—না, থাক্, সস্তা কবিত্ব করব না। তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে দশজনের সামনে মেকি হাসি হেসে ছোট্ট নমস্কার ক'রে তোমার কাছে বিদায় নেওয়া চলে না। এর জন্যে খানিকটা নির্জন নিবিড় সময় চাই। সেই জন্যেই এখন এসেছি। একটু আগেও এসেছিলাম। তুমি তখন ছিলে না। ভয় পেয়ো না, ব'স।"

এর পর না-বসাটা একটু অশোভন। ডানাকে বসতে হ'ল।

"আপনি যে এখন এখানে আসবেন—এ কথা আপনার স্ত্রী জানেন ?"

"না। সে জানে আমি এখানে নেই, আপিসের কাজে বাইরে গেছি। তাকে ব'লে গিয়েছিলাম, হলদে পাখীটা আজ সন্ধ্যেবেলা যেন ফেরত পাঠানো হয়। পাঠিয়েছে কি ?"

"পাঠিয়েছে। রত্নাদি আপনার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন পাখীটা। ওটা ফেরত দিচ্ছেন কেন?"

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার রত্নাদির চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই। তিনি হঠাৎ উপহার দিতে গেলেন কেন, তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এই হ'ল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাঁরই ষড়যন্ত্রের ফলে আমাকে এখান থেকে বদলি হতে হ'ল। তিনি গুপ্ত সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে কি যেন ব'লে গেছেন। বদলির অবশ্য সময় হয়েছে আমার, কিন্তু গুপ্ত সাহেব ইচ্ছে করলে আমাকে এখানে আরও কিছুদিন রাখতে পারতেন। কিন্তু তোমার রত্নাদির জন্যে সেটা আর হ'ল না। আই হেট দ্যাট ওম্যান। উপহার দেওয়ার ছলে অপমান করেছেন আমাকে তিনি। এসব টাকার গরম, আর কিছু নয়।..."

সত্য কথাটা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না ডানার। বকুলবালা মানা ক'রে গিয়েছিলেন, তাই চুপ ক'রে থাকতে হ'ল। রূপচাঁদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, চোখ দিয়ে আগুনের ঝলক বেরুচ্ছিল।

"এর সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত একটা। খাঁচাটা কোথায়?"

"ওই খাটের নীচে আছে।"

রূপচাঁদ খাঁচাটা বার করলেন।

"কি করবেন ওটা নিয়ে এখন? পাখীটা পাঠিয়েই দেব তাঁকে।"

"পাখীর গলাটা মুচড়ে দেব। রক্তাক্ত মরা পাখীটা পাঠিয়ে দিও। ব'লে দিও, আমি স্বহস্তে ওর গলা মুচড়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আই উইশ আই কুড রিং হার নেক টু।"

রূপচাঁদ সত্যিই খাঁচাটা খুলে খাঁচার ভেতর হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন। ডানা বাধা দিল, তাঁর হাতটা ধ'রে বললে, "ছি ছি, কি করছেন আপনি। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আপনার?"

ডানার হাতের স্পর্শে সহসা অভিভূত হয়ে পড়লেন রূপচাঁদ। খাঁচার ভিতর থেকে হাতটা বার ক'রে খাঁচাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

"মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আমার। তুমিই আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছ।"

ডানা একটু সঙ্কুচিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলে। তারপর নিজের অজ্ঞাতসারে চোখ নীচু ক'রে কোলের উপর হাত দুটি রেখে এমন একটা মোহিনী ভঙ্গীতে ব'সে রইল যে, রূপচাঁদ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবার তার হাত দুটো ধরতে গেলেন। ধ'রেই ফেললেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আমার উপর রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি। জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তোমার সঙ্গে। আমার বিদায়-মুহূর্তটা অন্তত মধুর ক'রে দাও, সেইটুকুই অন্তত যথেষ্ট মনে করব আমি। তারই স্মৃতি শাশ্বত অমৃতের উৎস হয়ে থাকবে আমার জীবনে। রাগ ক'রো না, স'রে এস।"

ডানা হাতটা ছাড়িয়ে নিল বটে, কিন্তু আর কিছু করল না। উঠে দাঁড়াল না, বাইরে চ'লে গেল না, চাকরটাকেও ডাকল না। সেও কেমন যেন একটু সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। একটা সমর্থ পুরুষের এই আত্মনিবেদন সে যেন উপভোগই করছিল। সে আনতচক্ষে ব'সেই রইল।

রূপচাঁদ বলতে লাগলেন, "তুমি যখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পথের ধারে ব'সে ছিলে, তখন আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। কিন্তু আমার দিকে তুমি একবারও ফিরে চাও নি। তুমি আনন্দমোহনের কবিতার খোরাক জুগিয়েছ, অমরেশবাবুর চাকরি করেছ, ওই জোকার সন্ন্যাসীটাকে পর্যন্ত আমল দিয়েছ,—বঞ্চিত করেছ কেবল আমাকে। বঞ্চিত হয়েই কি চ'লে যেতে হবে? একটুও দয়া করবে না? লোকে ভিক্ষুককেও একটা পয়সা দেয়। আমাকে কিছুই করতে দেবে না তুমি?"

ডানা এইবার যেন হঠাৎ সচেতন হ'ল। বিপদ আসন্ন বুঝে দাঁড়িয়ে উঠল সে।

"আপনাকে তো অনেকবার বলেছি, আপনি যা চাইছেন তা দিতে পারব না। আমি ভদ্রবংশের মেয়ে, ওসব নোংরামির মধ্যে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আপনি বাড়ি যান।"

"অনেকবার হতাশ হয়ে ফিরেছি, আজ আর ফিরব না। তুমি স্বেচ্ছায় যদি না দাও, জোর ক'রে কেড়ে নেবার শক্তি আমার আছে।"

পর-মুহূর্তেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে ডানাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন তিনি। কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বল্লমহস্তে বকুলবালা প্রবেশ করলেন।

ডানা চীৎকার করছিল—"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন—"

রূপচাঁদ ছাড়তে চাইছিলেন না, কিন্তু মাথায় দারুণ আঘাত পেয়ে ছাড়তে হ'ল; শুধু তাই নয়, প'ড়ে গেলেন তিনি। বল্লমের ক্ষত থেকে রক্ত প'ড়ে জামাকাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর।

বকুলবালার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ ওই হলদে পাখীটি। তিনি জানতেন, রূপচাঁদ বাইরে গেছেন, রাত্রে ফিরবেন না। রূপচাঁদের হুকুম অনুসারে পাখীটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাখীটার জন্যে এত মন-কেমন করতে লাগল যে, বল্লম আর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। বল্লমটা এনে-ছিলেন আত্মরক্ষার্থে, কিন্তু সেটা আর্তরক্ষার্থে কাজে লাগল। রূপচাঁদকে দেখে ক্ষেপে গেলেন বকুলবালা। ঈর্ষায় যে নারী একদিন বঁটি দিয়ে এক ছাগশিশুকে হত্যা করেছিল, সে-ই যেন বহুদিন পরে আবার আবির্ভূত হ'ল তাঁর মধ্যে।

"তুমি! তুমি এখানে কেন? তুমি সদরে গিয়েছিলে না?"

রূপচাঁদ নিরুত্তর। বকুলবালা ডানার দিকে সপ্রশ্ন অলস্ত নিক্ষেপ ক'রে বললেন, "ব্যাপার কি ?"

"ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। রাত-দুপুরে হঠাৎ এসে উনি যে এ কাণ্ড করবেন, তা আমি ভাবতেই পারি নি। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান, ছি-ছি-ছি-ছি!"

ডানা আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বেরিয়ে গেল। চাকরটাকে ডাকল একবার, কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত রূপচাঁদ কোনও কৌশল ক'রে আগে থাকতেই সরিয়ে দিয়েছিল তাকে। ডানা বাইরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গেল খানিকটা, ঘরের ভিতর আর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। ঘরের ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। দ্রুতপদে ফিরে এসে আবার ঘরে ঢুকল সে। যা দেখল, তা ভয়াবহ। বকুলবালা স্বামীর বুকের উপর ব'সে বাঁ হাতে তাঁর চুলের মুঠি ধ'রে ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত ঘুষি মেরে চলেছেন, আর্তনাদ করছেন রূপচাঁদ, প্রতিরোধ বা প্রতিকার করবার শক্তি নেই।

"উঠুন, উঠুন—ওঁকে নিয়ে বাড়ি যান আপনি। ছি-ছি, কি করছেন ?"

বকুলবালা কর্ণপাত করলেন না তার কথায়।

"আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি তা হ'লে।"

টর্চ এবং হাত-ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল ডানা। আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সত্যি সত্যি থানায় খবর দেবার জন্যে সে বেরোয় নি, থানা যে কোথায় তাই সে জানত না, সে ভয় দেখিয়ে বকুলবালাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। হয়তো এতেই বকুলবালা নিরস্ত হবেন। কিন্তু হলেন কি-না তা দেখবার ধৈর্য তার আর ছিল না, সে কোথাও ছুটে পালাতে

চাইছিল, কিন্তু কোথায় যাবে? সন্ন্যাসী কি ফিরেছেন? টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে সে সন্ন্যাসীর ঘরের দিকেই চলতে লাগল। গিয়ে দেখল, সন্ন্যাসী নেই। ঘরের দ্বার খোলা। হু-হু ক'রে হাওয়া একটা বইছে চর থেকে। ডানা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মনে পড়ল ভাস্করের কথা। রাত একটার পর সদরে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে, সে শুনেছিল। স্টেশনের দিকেই চ'লে গেল সে। মিনিট কুড়ি পরে গাড়িও পেয়ে গেল। গাড়ি যখন ছাড়ছে তখন হঠাৎ নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী একটা তোরঙ্গ ঘাড়ে ক'রে ওভারব্রিজে উঠছেন। এখনই সদরের দিক থেকে যে গাড়িটা এল, তাতেই এলেন না কি? সদরে কি জন্যে গিয়েছিলেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। ডানার একবার ইচ্ছে হ'ল, নেমে পড়ে। কিন্তু তারও উপায় ছিল না। ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। যে কোনও অবস্থাতেই মানুষের মন ক্রমশ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। বর্মার জঙ্গলে ডাকাতের হাতে প'ড়েও নিতে হয়েছিল। আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটার সঙ্গেও তার মন আপোস ক'রে ফেললে। ট্রেনের কামরায় এক কোণে ব'সে ব'সে ক্রমশ বরং তার মনে হ'ল যে, ঘটনাটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। রূপচাঁদবাবুর কাছ থেকে অন্য রকম আচরণই বরং অপ্রত্যাশিত হ'ত। তাঁর রক্তাক্ত বিধ্বস্ত চেহারাটা চোখের উপর ভেসে উঠল। একটু দুঃখই হ'ল ভদ্রলোকের জন্যে। বকুলবালার কাণ্ড দেখে সে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোন নারীর মধ্যে এ রকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সে আর দেখে নি। হঠাৎ মনে হ'ল, জোয়ান অব আর্ক হয়তো অনেকটা এই রকম ছিল। আর একটা কথা হঠাৎ মনে হ'ল তার। এই ঘটনাটা যদি না ঘটত, তা হ'লে এত শীঘ্র সে কি ভাস্করের কাছে যেত? যেত না। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে সে মনে মনে উদ্‌গ্রীব, তার শোভনতা বজায় রাখবার জন্যেই তাকে আরও কিছুদিন দেরি করতে হ'ত।

অশোভন আগ্রহ দেখিয়ে এর শালীনতা ক্ষুণ্ণ করবার প্রবৃত্তি তার হ'ত না। সে প্রবৃত্তি থাকলে ওই ডাকবাংলোয় ব'সেই তো সে কথা শেষ ক'রে দিতে পারত। তার নিজের কোনও অভিভাবক নেই, ভাস্করেরও নেই, ভাস্করের আগ্রহ যে অটুট আছে তা-ও সে বুঝতে পেরেছিল ; কিন্তু তবু সে শেষ কথা দেয় নি হয়তো শালীনতার জন্যে কিংবা হয়তো ভাস্করকে আর একটু ভাল ক'রে চেনবার জন্যে, কিংবা—(এ কথাটা মনে হওয়াতে নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে)—কিংবা হয়তো তার গোপন নারী-সত্তা কামনা করছিল, ও আর একটু খোশামোদ করুক, অত সহজে ধরা দেব কেন। কিন্তু আজকের এই ঘটনাটা ঘটাতে ব্যবধানের প্রাচীরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, শালীনতার সূক্ষ্ম ওড়নাটা উড়ে গেল, তার নিরাশ্রয় মন যে আশ্রয় পাবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল সেইদিকেই অতি দ্রুতবেগে ছুটতে হ'ল তাকে। সন্ন্যাসী যদি বাসায় থাকতেন তা হ'লে হয়তো আজই এমন ভাবে ছুটতে হ'ত না, কিন্তু তিনিও বাসায় ছিলেন না। এটা বিধাতার ইঙ্গিত, না, আকস্মিক যোগাযোগ একটা। তোরঙ্গ-কাঁধে সন্ন্যাসীর ছবিটা ভেসে উঠল মনে। সদরে কেন গিয়েছিলেন উনি ? তোরঙ্গ এনেছেন কেন ? উঞ্ছবৃত্তিধারীর তোরঙ্গের দরকার কি ? ফিরে এসে খোঁজ করতে হবে। চ'লে যাওয়ার আয়োজন করছেন না কি ? সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক আছে কি না সেটাও জানতে হবে।...ট্রেন হু-হু ক'রে চলেছে, গাড়ির কামরায় কেউ নেই, হু-হু ক'রে হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে, বাইরে গাঢ় অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য তারা, নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে ব'সে রইল ডানা...হঠাৎ আর একটা কথা মনে হ'ল তার। বিপদে প'ড়ে কবির কাছে তো সে যেতে পারত। গেল না কেন ? যাবার কথা মনেই হয় নি। এর কারণ সম্ভবত মন্দাকিনী। এই রাত্রে সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলা যেত না, বললে কেলেঙ্কারির ভয় ছিল। রূপচাঁদ আনন্দমোহনের বন্ধু একজন।

আর একটা কারণও ছিল বোধ হয়। কবি বলেছিলেন, যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে। যে কবিতাটা দিয়েছিলেন তাতেও ওই ধরনের কথা ছিল। তাঁর কাছে সে এখন অলীক স্বপ্নমাত্র। এ লোকের কাছে বাস্তবের সমস্যা নিয়ে যাওয়া অর্থহীন; নানা রকম ভাবতে ভাবতে চলেছিল ডানা। মনে হচ্ছিল সে যেন নূতন কোনও দেশে চলেছে, পুরাতন বন্ধু ভাস্করের কাছে নয়।

২০

ডানা একটা রিক্‌শায় চেপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে যখন এসে পৌঁছল, তখনও ফরসা হয় নি। রিক্‌শাওলা তাকে নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। ডানা দেখল, গেট ভিতর থেকে বন্ধ করা রয়েছে, বাড়িটাও গেট থেকে বেশ একটু দূরে। গেটে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে কেউ যে শুনতে পাবে তা মনে হয় না। কাছেপিঠে কোনও লোক বা চাকরও দেখা গেল না। ডানা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল, ভিতরে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেল না। বাংলোটা দেখা যাচ্ছে, লোকজন কেউ নেই। এভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ডানা তখন কাছে-পিঠে অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধান করবার জন্যে এগিয়ে গেল। কাছেই আর একটা বাড়ি ছিল রাস্তার ধারে। সেইটেরই বারান্দার উপর গিয়ে বসল সে। এ বাড়িতেও লোকজনের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যদি কেউ থাকে, ঘুমুচ্ছে তারা নিশ্চয়। ডানা খানিকক্ষণ ব'সেই বুঝতে পারল, এখানে ব'সে থাকা যাবে না। ভয়ঙ্কর মশা। উঠে দাঁড়াল এবং পথে পথেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাস্তার দু ধারে বড় বড় গাছ, দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ধীরে ধীরে

মাথা দোলাচ্ছে, কেউ আবার কথাও কইছে পেচকের ভাষায়। মাঝে মাঝে দুই-একটা গাছের উপর থেকে ফিঙেরও মিষ্টি গান শোনা যাচ্ছে। একটা গাছের উপর খুব আস্তে একটা কোকিল 'কু-উ' ক'রে একবার ডেকেই থেমে গেল। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার লাইন মনে প'ড়ে গেল ডানার—'দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান কুহরে'। এর পরই কিন্তু কাব্যলোক থেকে সহসা তার পতন হ'ল। সামনেই একদল মহিষ! ধীর মন্থর গতিতে চলেছে—একটির পর আর একটি। প্রায় নিঃশব্দেই, পায়ের খুরের শব্দ হচ্ছে শুধু। সর্বশেষ মহিষটির পিঠের উপর ব'সে আছে রাখালটি, হাতে তার প্রকাণ্ড একটা লাঠি। ডানা পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিষের দল যখন চ'লে গেল, তখন আবার সে পথ চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর—এক মুরগীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল রাস্তার ধারের একটা ঘর থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডানা। মনে হ'ল মুরগীটা যেন তাকে আর অগ্রসর হতে মানা করছে, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে কোথাও। মনে পড়ল, অনেক দিন আগে রাত্রি দশটার পর সে একবার পথ ভুলে একটা ব্যাঙ্কের সামনে এসে পড়েছিল। ব্যাঙ্কের প্রহরী চীৎকার ক'রে উঠেছিল—হুকুম দার। (Who comes there)? এই মুরগীও যেন বলছে—হুকুম দার। ডানা সত্যিই ইতস্তত করতে লাগল, আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না। পর-মুহূর্তেই একযোগে অনেকগুলো পাখী একসঙ্গে ডেকে উঠল, তার এই ইতস্তত ভাব দেখে একযোগে হেসে উঠল যেন একদল তরুণী অন্ধকার যবনিকার আড়াল থেকে। ডানার চোখে পড়ল পূর্বাকাশে উষার অরুণিমা আভাসিত হয়েছে। আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে হ'ল না তার। সে ফিরতে লাগল। আবার যখন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর কাছে ফিরে এল, তখন বেশ আলো হয়েছে। গেট কিন্তু তখনও খোলে নি। যে বারান্দার উপর প্রথমে ব'সে

ছিল, সেখানে গিয়েই বসল আবার। অনেকক্ষণ ব'সেই রইল। মনে হতে লাগল, এভাবে কোনও খবর না দিয়ে চ'লে আসাটা ঠিক হয় নি। এও হতে পারে যে, ভাস্কর এখানে নেই, কোনও জরুরী দরকারে আবার বেরুতে হয়েছে তাকে রাত্রে। এই সব ভাবছে, এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। একটি অল্পবয়সী কালো মেয়ে ভাস্করের গেট খুলে বেরিয়ে এল। মেয়েটি কালো, কিন্তু সুশ্রী। পিঠের উপর লম্বা বেণী দুলছে। ডানার হঠাৎ একটা উপমা মনে হ'ল—'কালভুজঙ্গিনী'। মেয়েটি তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। পরনে একটা ছাপা শাড়ি, গায়ের জামাও ছাপা সিল্কের। খুব ডগ্‌মগে রঙ। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ, যেন সমস্ত রাত ঘুমোয় নি। আরও যখন কাছে এল, তখন ডানাকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। ওর বাড়ির বারান্দাতেই সে ব'সে আছে না কি? দেখা গেল, সত্যিই তাই। মেয়েটি কাছে এসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডানার দিকে চাইতেই ডানা হেসে হাত তুলে নমস্কার করলে।

মেয়েটি উত্তর দিলে ইংরেজীতে। ইংরেজীতেই আলাপ হ'ল।

"গুড মর্নিং। কোন দরকার আছে কি?"

"আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, "আমি নার্স। এইখানেই থাকি।"

"এ বাড়ি আপনার?"

"হ্যাঁ। ভাড়া। আমি বিদেশিনী, এখানে প্র্যাকটিস করবার জন্যে এসেছি।"

"ও! আপনাকে ওই বাড়ির গেট থেকে বেরুতে দেখলাম। মিস্টার বসু কি অসুস্থ না কি?"

আবার মুচকি হাসল মেয়েটি।

"অসুস্থ হয়েই কাল রাত্রে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, বিশেষ কিছু নয়। একটু বেশী 'ড্রিংক' করে-

ছিলেন। কথাটা বলা হয়তো উচিত হ'ল না। কথাটা অনুগ্রহ ক'রে গোপন রাখবেন। আপনি কেন এসেছেন জানতে পারি কি?"

"আমি ওঁর পুরাতন বান্ধবী। দেখা করতে এসেছি।"

"আই সি। উনি ঘুমুচ্ছেন এখন। আপনি ভিতরে গিয়ে ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করতে পারেন। এর আগে এসেছিলেন কখনও?"

"একবার এসেছিলাম।"

"আচ্ছা, এক্স্‌কিউজ মি।"

আর কোন কথা না ব'লে মেয়েটি ভিতরে চ'লে গেল। মনে হ'ল, কথার ধরনে এবার যেন একটু উষ্ণতা প্রকাশ পেল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। যে ভেলাটি অবলম্বন ক'রে সে ভাসছিল, সেটাও ডুবে গেল নাকি?

ড্রইং-রুমে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি ডানাকে। চাপরাসীর মারফৎ নামটা পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর বসু বেরিয়ে এলেন।

"এ কি। ডানা। এ যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। এখন কি ক'রে এলে?"

"ট্রেনে।"

এর পর কি বলবে ডানা ভেবে পেল না, চুপ ক'রে গেল। এমন অসময়ে কোনও খবর না দিয়ে চ'লে আসার সত্য হেতুটা অকপটে বিবৃত করা সমীচীন হবে ব'লে তার মনে হ'ল না। কিন্তু কি বলবে তাও সে ভেবে আসে নি। চুপ ক'রেই রইল তাই।

"ট্রেনে? তার মানে রাত আড়াইটের সময় এখানে পৌঁছেছ। ব্যাপার কি?"

"কিছুই নয়, এমনি। ইচ্ছে হ'ল, চ'লে এলাম।"

"বেশ করেছ। চল, চা খাওয়া যাক। আমাকে আবার এখুনি বেরুতে হবে। একটা গ্রামে দাঙ্গা হয়ে গেছে।"

এবার ডানা যেন একটু আত্মসচেতন হ'ল। কেতা-দুরস্ত ভাষায়

বললে, "আমি আসাতে তোমার কর্তব্যে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না আশা করি।"

"বাধা হবে কেন? তুমিও সঙ্গে থাকবে আমার। আমার নীরস কর্তব্য সরস হয়ে উঠবে তা হ'লে। আর কালকের যে আলোচনাটা মুলতুবি আছে, সেটাও হয়তো সেরে ফেলা যাবে। আমার কাজ খুব বেশী নেই, শুধু একবার যাওয়া দরকার। পুলিস যা করবার ক'রে ফেলেছে এতক্ষণ। এস, চা-পর্বটা সেরে ফেলা যাক। চান করবে না কি?"

"কাপড়চোপড় তো আনি নি। হাত মুখ ধুয়ে নিলেই চলবে।"

"এস তা হ'লে। আমিও কামিয়ে নিই।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে ডাকবাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় একটা ক্যাম্প-চেয়ারে আনত নয়নে ব'সে ছিল ডানা। ভাস্কর বসু পাশেই আর একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে কথা ব'লে চলেছিলেন। তাঁর কথার ধরনে যে সরল আন্তরিকতা ফুটে উঠছিল, তা ডানার হৃদয়কে স্পর্শ করছিল কি না তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। ডানা নির্বাক হয়ে আনত নয়নে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বুঝতে পারছিলেন না ব'লে ভাস্করের বক্তব্য যেন আরও আবেগময় হয়ে উঠছিল।

ভাস্কর বলছিলেন, "তোমাকে বিয়ে করব ব'লেই আমি এতকাল প্রতীক্ষা ক'রে আছি। কেন জানি না, আমার বিশ্বাস ছিল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। বিয়ে করবার অনেক সুযোগ পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব—এ কল্পনা কখনও করি নি। তুমি কোনও কথা বলছ না যে? যদি কিছু জানতে চাও আমার বিষয়ে, বল সেটা।"

ডানা হেসে বললে, "যা জানতে ইচ্ছে করছে তা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচও হচ্ছে যে। যাদের বিয়ে করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ বা পাচ্ছ, তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি রকম?"

ভাস্করের চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের ছটা লাগল।

"তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। বার্মা থেকে চ'লে আসার পর অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে আমাকে। বার্মা থেকে পালিয়ে এসে আমি মিলিটারিতে যোগ দিয়ে নানা দেশে ঘুরেছি। তারপর বিলেতে পড়াশোনা করেছি। তারপর এই চাকরি। আমি সমর্থ যুবক, দৈহিক ক্ষুধার দাবি আছে, সে দাবি মেটাতে আমি ইতস্ততও করি নি কখনও—হাটে বাজারে হোটেলে রেস্তোরাঁয় যখন যেখানে যেমন জুটেছে। তবে ওগুলো নিতান্ত দৈহিক, সাময়িক ব্যাপার, মনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও অসুখও আমার হয় নি।"

ডানার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল সে।

ভাস্কর আবার বললেন, "ওসব বিষয়ে আমার কুসংস্কারও নেই। মানে, তোমারও জীবনে যদি ওসব ঘ'টে থাকে সেটাকে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা ব'লেই আমি মেনে নেব। শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক আমি নই।"

ডানা তবু নীরবে ব'সে রইল। একটা কথাই তার মনে হতে লাগল, রূপচাঁদই নবরূপে দেখা দিয়েছে আবার।

"একেবারে চুপ ক'রে গেলে যে? কোনও কথাই বলছ না?"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "বলবার আর কি আছে! চল, এবার ওঠা যাক।"

"আমার প্রস্তাবটা তা হ'লে—"

"পরে জানাব। এখন চল। এখনি ট্রেন আছে একটা, আমি চ'লে যাই। তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও।"

ডানার মুখের দিকে চেয়ে ভাস্কর আর কিছু বলতে সাহস করলেন না।

২৯

ডানা একা একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ব'সে ছিল। ভাবছিল, যা সে এতদিন কামনা করছিল তার সবই হ'ল, রূপচাঁদ শাস্তি পেয়ে তার জীবন থেকে স'রে যাচ্ছেন, কবির কল্পনা-স্রোত অন্য খাতে বইছে—তাকে নিয়ে তিনি আর কবিতা লিখবেন না, তার কলেজের বন্ধু ভাস্কর ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবার জন্যে সাধাসাধি করছে; কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনি র'য়ে গেল, তার জীবনের সমস্যার সমাধান হ'ল কই? কিছুই তো হ'ল না। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত নিঃস্ব মনে হতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল, আর কেউ না থাক্, সন্ন্যাসী ঠাকুর আছেন। সন্ন্যাসীর নানা কথাই ঘুরে ফিরে জাগতে লাগল ,মনের ভিতর। মেঘের মত প্রসারিত হতে লাগল নানা আকারে।

বাড়ি এসে যখন পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় তিনটে। দেখল, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ডাকে উঠে বসল সে।

"রূপচাঁদবাবু আর তাঁর স্ত্রী কতক্ষণ ছিলেন কাল?"

"তা তো জানি না মা। আমি এসে দেখলাম, কেউ নেই। পাখীটাও নিয়ে গেছেন।"

"আজ কেউ এসেছিল?"

"একটু আগে ওই গঙ্গার ধারের বাবাজী এসেছিলেন। তিনি একটা বাক্স আর চিঠি রেখে গেছেন।"

"কি বাক্স?"

"ঘরে রেখে দিয়েছি। খুব ভারী। নতুন তোরঙ্গ একটা।"

একটি খামের চিঠি সে ডানার হাতে দিল। চিঠিটা হাতে ক'রে ডানা ঘরের ভিতর ঢুকেই দেখতে পেল তোরঙ্গটি। এইটেই তো কাঁধে ক'রে কাল আসছিলেন তিনি। চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল সে।

শ্রীমতী ডানা,

আমি এবার চললাম। আর সম্ভবত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার কিছু সম্পত্তি এখানে ছিল, তারই ব্যবস্থা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ হয়ে গেল সব। তুমি বিপন্ন মুখে বার বার আমার কাছে আসতে সাহায্যের জন্য, উপদেশের জন্য। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, নিজেই অসহায়, তোমাকে কি সাহায্য করব তা ভেবেই পেতাম না। অথচ কিছু করবার জন্যও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। তুমি একদিন বলেছিলে যে, কিছু টাকা পেলে নাকি তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই দিনই আমি ভেবেছিলাম যে, এখানে আমার যা কিছু আছে তা তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু দেব বললেই চট ক'রে দেওয়া যায় না। অনেক দিন ধ'রে এর জন্যে আয়োজন করতে হয়েছে। একটা সামান্য শাবল যোগাড় করতেই বেশ কয়েক দিন লেগে গেল। যে ঘরটায় তুমি আছ, আর এই ভাঙা ঘরটা যেখানে আমি আছি—এ দুটোই আমার সম্পত্তি। এর সংলগ্ন কিছু জমিও। ঠিক কত জমি আমার জানা নেই, তুমি পুরাতন দলিল খোঁজ করলেই জানতে পারবে। আমি সদরে গিয়ে আমার এখানকার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে এলাম। পোস্ট-আপিসের টাকাগুলোও তুমি পাবে। এই তোরঙ্গের ভিতর সমস্ত দলিল আছে। আমি সদরের উকিল হরনাথ মল্লিককে আমার 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' দিয়ে এসেছি। তিনি রেজেষ্টি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার ক'রে দেবেন। এ ছাড়াও আরও কিছু টাকা তোমাকে দিয়ে গেলাম। মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম তাতে লেখা ছিল যে, গঙ্গার ধারের এই প'ড়ো বাড়িটার মেঝেতে এক ঘড়া মোহর আছে। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ নাকি এটা সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন। মোহর আছে কি না দেখবার জন্যেই শাবল সংগ্রহ করতে হ'ল আমাকে। চিঠির

নির্দেশ অনুসারে খুঁড়ে দেখলাম, সত্যিই আছে। একটা প্রকাণ্ড তামার ঘড়ায় দু হাজার মোহর। মোহরগুলো তোমাকে দেবার জন্যে একটা মজবুত তোরঙ্গ কিনতে হ'ল। ওর ভিতর সমস্ত মোহরগুলো, আমার পোস্ট-আপিসের পাস-বই এবং প্রয়োজনীয় দলিল ও চিঠিপত্র সব রইল। এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সমস্ত মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বান্তঃকরণে তোমার মঙ্গল কামনা ক'রে আমি বিদায় নিলাম। ভগবান তোমাকে সুখী করুন। ইতি

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

ডানা স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল।

২২

তিন মাস কেটে গেছে। ঘনঘোর হয়ে নেমেছে বর্ষা। শ্রাবণের নিবিড় সমারোহে আকাশ-বাতাস থমথম করছে। নদী কূলে-কূলে ভরা। সবুজের বান ডেকেছে বনে বনে। চাতক পাখী ডাকছে একটা। সমস্ত সকাল ধ'রে ঘুরে ফিরে ডাকছে, কখনও এ-গাছে কখনও ও-গাছে, কখনও কাছে কখনও দূরে। বিদেশী পাখী, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। কবি পাখীটাকে নিয়েই মেতে আছেন সারা সকাল। দূরবীন দিয়ে দেখে দেখে তাঁর সাধ যেন আর মিটছে না। কালো পাখী, মাথায় ঝুঁটি, ল্যাজটি লম্বা, ল্যাজের ডগায় সাদা সাদা বিন্দু, বুকটি সাদা—এক কথায় অপরূপ। পাখীটা যখন দূরবীনের সীমা ছাড়িয়ে চ'লে গেল তখন কবি কবিতা লিখতে বসলেন। অনেক ভেবে ভেবে আরম্ভ করলেন—

নব জলধর হতে আসিলে কি নামিয়া
ওগো ও চাতক পাখী, ওগো মেঘবরণী,
ছায়া-মেঘনার স্রোতে ভাসাইয়া তরণী

একটু না থামিয়া
গাঢ় সবুজের স্রোতে খুঁজিতেছ সরণী
কিছুই না মানিয়া
গাছে গাছে দূরে কাছে কার অভিসারে গো
বল না বাখানিয়া
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো
ডাকিছ কাহারে বারে বারে গো।

বাধা পড়ল। পিওন এসে দেখা দিল। একটা খামের উপর অমরেশবাবুর হস্তাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন কবি। তিনি কাশ্মীর থেকে ইয়োরোপ চ'লে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কোনও চিঠিই লেখেন নি ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুললেন। ছোট চিঠি।

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক কিছু দেখে দেশে ফিরেছি। এখন আছি লছমনঝোলার একটা ধরমশালায়। বর্ষার সময় এ জায়গা মনোরম নয়। আমি এখানে এসেছি ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের (Verditer Fly-catcher) বাসার সন্ধানে। আর একটু আগে এসে পৌঁছতে পারলে ভাল হ'ত। মে-জুনেই ওদের বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। লণ্ডনে একজন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। পাহাড়ী পাখীর বিষয়ে সে গবেষণা করছে। তারই অনুরোধে ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের বাসা আর ডিমের সন্ধান করছি এখানে। যদি পাঠাতে পারি খুব খুশী হবেন তিনি। আমাদের সঙ্গে তিনি যে রকম ভদ্র ব্যবহার করেছেন তা অবর্ণনীয়। তিনি সাহায্য না করলে আমরা সমুদ্রের নানা রকম পাখী দেখতেই পেতাম না। অনেক নোট্স্ আর ফোটো এনেছি। সব দেখাব। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে কাল। পাহাড়ে কিছু দূর উঠে একটা ঝরনার ধারে

ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ডানাকে দেখতে পেলাম। ময়লা একটা গেরুয়া রঙের কাপড় প'রে ঝরনা থেকে জল তুলছে। আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারি নি আমি প্রথমে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, ডানাই। জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি, তুমি এখানে? সে মৃদু হেসে বললে, আমি আর চাকরি করতে পারলাম না। আনন্দবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি করছ? বললে, এমনই আছি। বেশ আনন্দেই আছি। নমস্কার। আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে জলের ছোট কলসীটি তুলে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে এসে খবরটা রত্নাকে বললাম। লোকজন পাঠিয়ে খোঁজও করলাম কিন্তু আর তাকে ধরতে পারি নি। আমরা দুজনেই খুব বিস্মিত হয়েছি। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানাবেন। আমরা বোধ হয় মাসখানেক পরে ফিরব।' নমস্কার জানবেন। ঠিকানা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম। পত্রপাঠমাত্র উত্তর দেবেন। ইতি

আপনাদের
অমরেশ

কবি পত্রপাঠমাত্রই উত্তর লিখতে ব'সে গেলেন।—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। আপনাদের কোনও খবর না পেয়ে খুব ভাবছিলাম। শ্রীমতী ডানার আচরণ সত্যই খুব বিস্ময়কর। সে কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে আপনার পক্ষী-নিবাসের সমস্ত পাখীগুলোকেও ছেড়ে দিয়ে গেছে। সে চ'লে যাওয়ার পরদিন তার চাকরটা এসে খবর দিলে যে, মাইজী কাল রাত্রে ফেরেন নি, এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই। রাত্রে তাঁর জন্যে রান্না ক'রে রেখেছিলাম, সে খাবারটা নষ্ট হয়েছে। আবার রাঁধব কি? আমি

গিয়ে টেবিলের উপর ছোট একটা চিঠি পেলাম। সেটা হুবহু নকল ক'রে দিচ্ছি।—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, এখানে প'ড়ো বাড়িতে যে সন্ন্যাসী থাকতেন, তাঁর চিঠিটা প'ড়ে দেখলে তোরঙ্গ-রহস্য বুঝতে পারবেন। আমি আর চাকরি করব না, আমিও চললুম এখান থেকে। যাওয়ার আগে পক্ষী-নিবাসের পাখীগুলোকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি, এ অধিকার রত্নাদি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী যে অর্থ আমাকে দিয়ে গেছেন, তা আমি নিলাম না। আমার অনুরোধ—আপনি, অমরেশ-বাবু আর রূপচাঁদবাবু টাকাটা ভাগ ক'রে নিয়ে নেবেন। (আপনাদের তিনজনেরই মুখে একাধিক বার শুনেছি যে, টাকা পেলে আপনারা প্রত্যেকেই নিজেদের আকাশে নাকি আরও ভালভাবে ডানা মেলতে পারবেন। আমারও আগে তাই ধারণা ছিল, এখন আর নেই।) তাই টাকাগুলো আপনাদের তিনজনকেই দিয়ে গেলাম। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য যে সহায়রাম ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর বাড়ি আর জমির যে কোনও সুব্যবস্থা করবার অধিকার আমি অমরেশবাবুকে দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন তার স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার মনে। আপনি ও বউদিদি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। একটি অনুরোধ, আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না, কিংবা পুলিসে খবর দেবেন না। ঘরের চাবি চাকরটার কাছেই রইল। টাকাকড়ির ব্যাপার তার কাছে থেকে গোপন রেখেছি। আবার প্রণাম জানাচ্ছি। ইতি আপনাদের ডানা।"

ডানার চিঠির সঙ্গে সন্ন্যাসীর চিঠিও ছিল। সেটা না টুকে অমনিই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ ডাকের বেশী সময় নেই। টুকতে গেলে ডাক পাব না। ওটা হারাবেন না যেন। তোরঙ্গটা তুলে নিজের কাছে এনেছি। মোহরগুলো বড় আয়রন সেফে রেখেছি।

আপনি এলে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আপনারা তাড়াতাড়ি চ'লে আসুন। এখানকার অন্যান্য খবর সব ভাল। খাজনা ভালই আদায় হয়েছে। গ্রামসংস্কারের কাজে লেগেছি। সেটাও ভাল চলেছে। আপনারা উভয়ে আমার নমস্কার জানবেন। ইতি

শ্রী তিবন্ধ
শ্রীআনন্দমোহন

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর কবিতা লিখলেন—

কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায়
বহ্নিনিশান উড়িয়েছিল যে
আজকে দেখি শ্রাবণ-মেঘে
বৃষ্টি ঝরায় সে।

বৈশাখেতে দোয়েল শ্যামা
বনে বনে যে সুর সেধেছিল
টুনটুনি আর বুলবুলিরা
যে নীড় বেঁধেছিল
চাতক পাখীর কণ্ঠে ওগো
তাই কি আজি জল-তরঙ্গে বাজে
ছায়ায় ঢাকা মেঘলা দিনের
নিবিড়তার মাঝে।

একই বাণী, ওগো রসিক,
বলছ তুমি নানান সুরে সুরে,
সামনে যখন বৃষ্টি ঝরে, দেখি
রোদ উঠেছে দূরে।

॥ সমাপ্ত ॥

